PART- 16

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রহ.

৫৩

নামকরণ

সূরার একেবারে প্রথম শব্দ وَالنَّجْم থেকে গৃহীত। বিষয়বস্তুর দিক থেকে এটিও সূরার শিরোনাম নয়। শুধুমাত্র পরিচয় চিহ্ন স্বরূপ এ শব্দটিকে সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ ও নাসায়ীতে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, أَوَّلُ سُورَةٍ أُنْزِلَتْ فِيْهَا سَجْدَةُ النَّجْمُ (সর্ব প্রথম যে সূরাটিতে সিজদার আয়াত নাযিল হয়েছে, সেটি হচ্ছে আন–নাজ্‌ম)। এ হাদীসের যে অংশসমূহ আসওয়াদ ইবনে ইয়াযীদ, আবু ইসহাক এবং যুহায়ের ইবনে মুয়াবিয়া কর্তৃক ইবনে মাসউদের রেওয়ায়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, এটি কুরআন মজীদের প্রথম সূরা যা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের এক সমাবেশে (ইবনে মারদুইয়ার বর্ণনা অনুসারে হারাম শরীফের মধ্যে) শুনিয়েছিলেন। সমাবেশে কাফের ও ঈমানদার সব শ্রেণীর লোক উপস্থিত ছিল। অবশেষে তিনি সিজদার আয়াত পড়ে সিজদা করলে উপস্থিত সবাই তাঁর সাথে সিজদা করে। এমনকি মুশরিকদের বড় বড় নেতা যারা তাঁর বিরোধিতার অগ্রভাগে ছিল তারাও সিজদা না করে থাকতে পারেনি। ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন; আমি কাফেরদের মধ্যে মাত্র এক ব্যক্তি অর্থাৎ উমাইয়া ইবনে খালফকে দেখলাম, সে সিজদা করার পরিবর্তে কিছু মাটি উঠিয়ে কপালে লাগিয়ে বললো ঃ আমার জন্য এটাই যথেষ্ট। পরবর্তী সময়ে আমি নিজ চোখে তাকে কাফের অবস্থায় নিহত হতে দেখেছি।

এ ঘটনার অপর একজন চাক্ষুষদর্শী হলেন হযরত মুত্তালিব ইবনে আবী ওয়াদা'আ। তিনি তখনও মুসলমান হননি। নাসায়ী ও মুসনাদে আহমদে তাঁর নিজের বক্তব্য এভাবে উদ্ধৃত হয়েছে যে, নবী (সা) সূরা নাজ্‌ম পড়ে সিজদা করলেন এবং উপস্থিত সবাই তাঁর সাথে সিজদা করলো। কিন্তু আমি সিজদা করিনি। বর্তমানে আমি তার ক্ষতিপূরণ করি এভাবে যে, এ সূরা তিলাওয়াতকালে কখনো সিজদা না করে ছাড়ি না।

ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন, ইতিপূর্বে নবুওয়াতের ৫ম বছরের রজব মাসে সাহাবা কিরামের একটি ছোট্ট দল হাবশায় হিজরত করেছিলেন। পরে ঐ বছর রমযান মাসেই এ ঘটনা ঘটে অর্থাৎ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরাইশদের জনসমাবেশে

সূরা নাজ্‌ম পাঠ করে শোনান এবং এতে কাফের ও ঈমানদার সবাই তাঁর সাথে সিজদায় পড়ে যায়। হাবশায় মুহাজিরদের কাছে এ কাহিনী এভাবে পৌঁছে যে, মক্কার কাফেররা মুসলমান হয়ে গিয়েছে। এ খবর শুনে তাদের মধ্যকার কিছু লোক নবুওয়াতের ৫ম বছরের শাওয়াল মাসে মক্কায় ফিরে আসেন। কিন্তু এখানে আসার পর জানতে পারেন যে, জুলুম–নির্যাতন আগের মতই চলছে। অবশেষে হাবশায় দ্বিতীয়বার হিজরত করার ঘটনা সংঘটিত হয়। এতে প্রথমবারের হিজরতের তুলনায় অনেক বেশী লোক মক্কা ছেড়ে চলে যায়।

এভাবে প্রায় নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে, সূরাটি নবুওয়াতের ৫ম বছরের রমযান মাসে নাযিল হয়েছিলো।

ঐতিহাসিক পটভূমি

নাযিল হওয়ার সময়–কাল সম্পর্কে এ বিস্তারিত আলোচনা থেকে কিরূপ পরিস্থিতিতে এ সূরাটি নাযিল হয়েছিল তা জানা যায়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নবুওয়াতলাভের শুরু থেকে পাঁচ বছর পর্যন্ত শুধু ব্যক্তিগত যোগাযোগ এবং বিশেষ বিশেষ বৈঠকেই আল্লাহর বাণী শুনিয়ে মানুষকে আল্লাহর দীনের দিকে আহবান জানিয়ে আসছিলেন। এ সুদীর্ঘ সময়ে তিনি কখনো কোন জনসমাবেশে কুরআন শোনানোর সুযোগ পাননি। কাফেরদের চরম বিরোধীতাই ছিল এর প্রধান অন্তরায়। তাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রচারণামূলক তৎপরতায় কিরূপ প্রচণ্ড আকর্ষণ এবং কুরআন মজীদের আয়াতসমূহে কি সাংঘাতিক প্রভাব আছে তারা তা খুব ভাল করেই জানতো। তাই তাদের চেষ্টা ছিল তারা নিজেরাও এ বাণী শুনবে না অন্য কাউকেও শুনতে দিবে না এবং তাঁর বিরুদ্ধে নানা রকমের ভুল বুঝাবুঝি সৃষ্টি করে শুধু নিজেদের মিথ্যা প্রচার প্রোপাগাণ্ডার জোরে তাঁর এ আন্দোলনকে দমিয়ে দেবে। এ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য একদিকে তারা বিভিন্ন স্থানে একথা ছড়িয়ে বেড়াচ্ছিলো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভ্রান্ত ও বিপথগামী হয়েছেন এবং লোকদেরকে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা চালাচ্ছেন। অপরদিকে তাদের স্থায়ী কর্মপন্থা ছিল এই যে, নবী *(সা)* যেখানেই কুরআন শোনানোর চেষ্টা করতেন সেখানেই হট্টগোল, চিৎকার হৈ হল্লা শুরু করিয়ে দিতে হবে যাতে যে কারণে তাঁকে পথভ্রষ্ট ও বিভ্রান্ত লোক বলে আখ্যায়িত করা হচ্ছে জানতে তা যেন লোকে আদৌ জানতে না পারে। এ পরিস্থিতিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন পবিত্র হারাম শরীফের মধ্যে কুরাইশদের একটি বড় সমাবেশে হঠাৎ বক্তৃতা করতে দাঁড়ালেন। সূরা নাজম আকারে এখন যে সূরাটি আমাদের সামনে বর্তমান, আল্লাহর পক্ষ থেকে রসূলের (সা) মুখে তা বক্তৃতা আকারে পরিবেশিত হলো। এ বাণীর প্রচণ্ড প্রভাবে অবস্থা দাঁড়ালো এই যে, তিনি তা শুনাতে আরম্ভ করলে এর বিরুদ্ধে বিরোধীদের হট্টগোল ও হৈ–হল্লা করার খেয়ালই হলো না। আর শেষের দিকে তিনি যখন সিজদা করলেন তখন তারাও সিজদা করলো। পরে তারা এই ভেবে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করলো যে, আমরা একি দুর্বলতা দেখিয়ে ফেললাম। এজন্য লোকজনও তাদেরকে এ বলে তিরস্কার করলো যে, এরা অন্যদের এ বাণী শুনতে নিষেধ করে ঠিকই কিন্তু আজ তারা কান পেতে তা শুধু শুনলো না, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সিজদাও করে বসলো। অবশেষে

তারা এ মর্মে মিথ্যা অপবাদ রটায় যে, আরে মিয়া, আমরা তো أَفَرَأَيْتُمُ اللَّٰتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَوٰةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ কথাটির পর মুহাম্মাদের (সা) মুখ থেকে تلك الغرانقة العلى وان شفاعتهن لترجى (এরা সব উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন দেবী। তাদের শাফায়াতের আশা অবশ্যই করা যায়) কথাটি শুনেছিলাম। তাই আমরা মনে করেছিলাম যে, মুহাম্মাদ (সা) আমাদের পথে ফিরে এসেছে। অথচ তারা যে কথাটি শুনতে পেয়েছে বলে দাবী করেছিলো, এ সমগ্র সূরাটির পূর্বাপর প্রেক্ষিতের মধ্যে তা কোথাও খাটে না। এ ধরনের একটি উদ্ভট বাক্যের সাথে এ সূরার মিল খুঁজে পাওয়া একমাত্র কোন পাগলের পক্ষেই সম্ভব। (বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, আল–হাজ্জ, টীকা–৯৬ থেকে ১০১)

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

মক্কার কাফেররা কুরআন ও হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি যে আচরণ ও নীতি অবলম্বন করে চলছিলো তাদের ঐ নীতি ও আচরণের ভ্রান্তি সম্পর্কে সাবধান করে দেয়াই এ সূরার মূল বিষয়বস্তু।

বক্তব্য শুরু করা হয়েছে এভাবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভ্রান্ত বা পথভ্রষ্ট ব্যক্তি নন যেমনটি তোমরা রটনা করে বেড়াচ্ছো। আর ইসলামের এ শিক্ষা ও আন্দোলন তিনি নিজে মনগড়া ভাবে প্রচার করছেন না যেমনটা তোমরা মনে করে বসে আছ। বরং তিনি যা কিছু পেশ করছেন তা নির্ভেজাল অহী ছাড়া আর কিছুই নয়। এ অহী তাঁর ওপর নাযিল করা হয়। তিনি তোমাদের সামনে যে সব সত্য বর্ণনা করেন তা তাঁর অনুমান ও ধারণা নির্ভর নয়, বরং নিজ চোখে দেখা অকাট্য সত্য। যে ফেরেশতার মাধ্যমে তাঁকে এ জ্ঞান দেয়া হয় তাকে তিনি নিজ চোখে দেখেছেন। তাঁকে সরাসরি তাঁর রবের বড় বড় নিদর্শনসমূহ পরিদর্শন করানো হয়েছে। তিনি যা কিছু বলছেন চিন্তা–ভাবনা করে বলছেন না, দেখে বলছেন। যে জিনিস একজন অন্ধ দেখতে পায় না অথচ একজন চক্ষুষ্মান ব্যক্তি দেখতে পায়, সে জিনিস নিয়ে চক্ষুষ্মানের সাথে অন্ধের বিতর্কে লিপ্ত হওয়া যেমন, মুহাম্মাদ (সা) এর সাথে তাওহীদ আখেরাত প্রভৃতি বিষয় নিয়ে তোমাদের তর্ক করা ঠিক তেমনি।

এরপর ক্রমান্বয়ে তিনটি বিষয়ে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে ঃ

প্রথমত শ্রোতাদের বুঝানো হয়েছে তোমরা যে ধর্মের অনুসরণ করছো তা কতকগুলো ধারণা ও মনগড়া জিনিসের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তোমরা লাত, মানাত ও উয্‌যার মত কয়েকটি দেব–দেবীকে উপাস্য বানিয়ে রেখেছো অথচ প্রকৃত খোদায়ীর ক্ষেত্রে তাদের নাম মাত্রও অংশ নেই। তোমরা ফেরেশতাদেরকে আল্লাহর কন্যা ধরে নিয়ে বসে আছ। কিন্তু নিজেদের কন্যা সন্তান থাকাকে তোমরা লজ্জা ও অপমানের বিষয় বলে মনে কর। তোমরা নিজের পক্ষ থেকে ধরে নিয়েছো যে, তোমাদের এ উপাস্যরা আল্লাহ তা'আলার কাছে তোমাদের কাজ আদায় করে দিতে পারে। অথচ আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী সমস্ত ফেরেশতা সম্মিলিতভাবেও আল্লাহকে তাদের কোন কথা মানতে বাধ্য বা উদ্বুদ্ধ করতে পারে না। তোমাদের অনুসৃত এ ধরনের আকীদা–বিশ্বাসের কোনটিই কোন জ্ঞান বা দলীল

প্রমাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়। এগুলো নিছক তোমাদের প্রবৃত্তির কিছু কামনা-বাসনা যার কারণে তোমরা কিছু ভিত্তিহীন ধারণাকে বাস্তব ও সত্য মনে করে বসে আছ। এটা একটা মস্ত বড় ভুল। এ ভুলের মধ্যেই তোমরা নিমজ্জিত আছ। সত্যের সাথে যার পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে সেটিই প্রকৃত আদর্শ। সত্য মানুষের প্রবৃত্তি ও আকাংখার তাবেদার হয় না যে, সে যাকে সত্য মনে করে বসবে সেটিই সত্য হবে। প্রকৃত সত্যের সাথে সংগতির জন্য অনুমান ও ধারণা কোন কাজে আসে না। এজন্য দরকার জ্ঞানের। সে জ্ঞানই তোমাদের সামনে পেশ করা হলে তোমরা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে এবং উল্টা সে ব্যক্তিকেই পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করো যে তোমাদের সত্য কথা বলছেন। তোমাদের এ ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হওয়ার মূল কারণ হলো, আখেরাতের কোন চিন্তাই তোমাদের নেই। কেবল দুনিয়াই তোমাদের উদ্দেশ্য হয়ে আছে। তাই সত্যের জ্ঞান অর্জনের আকাংখা যেমন তোমাদের নেই, তেমনি তোমরা যে আকীদা-বিশ্বাসের অনুসরণ করছো তা সত্যের সাথে সংগতিপূর্ণ হোক বা না হোক তারও কোন পরোয়া তোমাদের নেই।

দ্বিতীয়ত, লোকদের বলা হয়েছে যে, আল্লাহই সমগ্র বিশ্ব-জাহানের একচ্ছত্র মালিক মোক্তার। যে তাঁর পথ অনুসরণ করছে সে সত্য পথ প্রাপ্ত আর যে তার পথ থেকে বিচ্যুত সে পথ ভ্রষ্ট। পথভ্রষ্ট ব্যক্তির পথভ্রষ্টতা এবং সত্য-পন্থীর সত্য পথ অনুসরণ তাঁর অজানা নয়। তিনি প্রত্যেকের কাজ কর্মকে জানেন। তাঁর কাছে অন্যায়ের প্রতিফলন অকল্যাণ এবং সুকৃতির প্রতিদান কল্যাণ লাভ অনিবার্য ।

তুমি নিজে নিজেকে যা-ই মনে করে থাকো এবং নিজের মুখে নিজের পবিত্রতার যত লম্বা চওড়া দাবিই করো না কেন তা দিয়ে তোমার বিচার করা হবে না। বরং আল্লাহর বিচারে তুমি মুত্তাকী কিনা তা দিয়ে তোমার বিচার করা হবে। তুমি যদি বড় বড় গোনাহ থেকে দূরে অবস্থান করো তাহলে তাঁর রহমত এত ব্যাপক যে, তিনি ছোট ছোট গোনাহ ক্ষমা করে দেবেন।

তৃতীয়ত, কুরআন মজীদ নাযিল হওয়ার শত শত বছর পূর্বে দীনে হকের যে কয়টি মৌলিক বিষয় হযরত ইবরাহীম ও মূসার সহীফাসমূহে বর্ণনা করা হয়েছিলো তা মানুষের সামনে এজন্য পেশ করা হয়েছে যে, মানুষ যেন এরূপ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ না করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি সম্পূর্ণ নতুন দীন নিয়ে এসেছেন, বরং মানুষ যাতে জানতে পারে যে, এগুলো মৌলিক সত্য এবং আল্লাহর নবীগণ সব সময় এ সত্যই প্রচার করেছেন। সাথে সাথে ঐসব সহীফা থেকে একথাও উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, আদ, সামূদ, নূহ ও লূতের কওমের ধ্বংস হয়ে যাওয়া কোন আকস্মিক দুর্ঘটনার ফল ছিল না। আজ মক্কার কাফেররা যে জুলুম ও সীমালংঘন থেকে বিরত থাকতে কোন অবস্থাতেই রাজি হচ্ছে না, সে একই জুলুম ও সীমালংঘনের অপরাধেই আল্লাহ তা'আলা তাদের ধ্বংস করেছিলেন।

এসব বিষয় তুলে ধরার পর বক্তৃতার সমাপ্তি টানা হয়েছে এ কথা বলে যে, চূড়ান্ত ফায়সালার সময় অতি নিকটবর্তী হয়েছে। তা প্রতিরোধ করার মত কেউ নেই। চূড়ান্ত সে মুহূর্তটি আসার পূর্বে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআনের মাধ্যমে তোমাদেরকেও ঠিক তেমনিভাবে সাবধান করে দেয়া হচ্ছে যেভাবে পূর্ববর্তী লোকদের সাবধান করা হয়েছিল। এখনি এ কথাগুলোই কি তোমাদের কাছে অভিনব মনে হয়?

এজন্যই কি তা নিয়ে তোমরা ঠাট্টা তামাসা করছো? একারণেই কি তোমরা তা শুনতে চাও না, শোরগোল ও হৈ চৈ করতে থাকো। যাতে অন্য কেউও তা শুনতে না পায়? নিজেদের এ নির্বুদ্ধিতার জন্য তোমাদের কান্না আসে না? নিজেদের এ আচরণ থেকে বিরত হও, আল্লাহর সামনে নত হও এবং তাঁরই বন্দেগী করো।

এটা ছিল বক্তব্যের অত্যন্ত মর্মস্পর্শী উপসংহার যা শুনে কট্টর বিরোধীরাও নিজেদের সংবরণ করতে পারেনি। তাই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বাণীর এ অংশ পড়ে সিজদা করলে তারাও স্বতস্ফূর্তভাবে সিজদায় পড়ে যায়।

পরম করুণাময় মেহেরবান আল্লাহর নামে

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوٰى ﴿١﴾ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى ﴿٢﴾ وَمَا يَنْطِقُ
عَنِ الْهَوٰى ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحٰى ﴿٤﴾ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوٰى ﴿٥﴾
ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوٰى ﴿٦﴾ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلٰى ﴿٧﴾ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلّٰى ﴿٨﴾
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنٰى ﴿٩﴾ فَأَوْحٰى إِلٰى عَبْدِهِ مَا أَوْحٰى ﴿١٠﴾
مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأٰى ﴿١١﴾ أَفَتُمٰرُونَهُ عَلٰى مَا يَرٰى ﴿١٢﴾ وَلَقَدْ رَاٰهُ
نَزْلَةً أُخْرٰى ﴿١٣﴾ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهٰى ﴿١٤﴾

তারকারাজির শপথ[১] যখন তা অস্তমিত হলো। তোমাদের বন্ধু[২] পথভ্রষ্ট হয়নি বা বিপথগামীও হয়নি।[৩] সে নিজের খেয়াল খুশীমত কথা বলে না। যা তার কাছে নাযিল করা হয় তা অহী ছাড়া আর কিছুই নয়।[৪] তাকে মহাশক্তির অধিকারী একজন শিক্ষা দিয়েছে[৫], যে অত্যন্ত জ্ঞানী।[৬] সে সামনে এসে দাঁড়ালো। তখন সে উঁচু দিগন্তে ছিল।[৭] তারপর কাছে এগিয়ে এলো এবং ওপরে শূন্যে ঝুলে রইলো। অতপর তাদের মাঝে মুখোমুখি দু'টি ধনুকের জ্যা–এর মত কিংবা তার চেয়ে কিছু কম ব্যবধান রইলো।[৮] তখন আল্লাহর বান্দাকে যে অহী পৌঁছানোর ছিল তা সে পৌঁছিয়ে দিল।[৯] দৃষ্টি যা দেখলো মন তার মধ্যে মিথ্যা সংমিশ্রিত করলো না।[১০] যা সে নিজের চোখে দেখেছে তা নিয়ে কি তোমরা তার সাথে ঝগড়া করো?

পুনরায় আর একবার সে তাকে সিদরাতুল মুনতাহার কাছে দেখেছে।

১. মূল আয়াতে النجم শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ইবনে আব্বাস, মুজাহিদ এবং সুফিয়ান সাওরী বলেন এর অর্থ সপ্তর্ষিমণ্ডল (Pleiades) । ইবনে জারীর ও যামাখশারী এ মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। কারণ, আরবী ভাষায় শুধু النجم শব্দ বলা হলে তা দ্বারা সাধারণত সপ্তর্ষিমণ্ডলকেই বুঝানো হয়ে থাকে। সুদ্দী বলেন, এর অর্থ শুক্রগ্রহ (Venus) ।

আবু উবায়দা নাহবীর বক্তব্য হলো, এখানে النجم বলে সমস্ত তারকাকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ বলতে চাওয়া হয়েছে যখন সকাল হলো এবং সমস্ত তারকা অস্তমিত হলো। পরিবেশ ও স্থান–কাল–পাত্রের বিচারে আমাদের কাছে এ শেষ মতটিই অধিক অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

২. রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়েছে এবং কুরাইশদের সম্বোধন করা হয়েছে। মূল শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে صَاحِبُكُمْ (তোমাদের বন্ধু)। আরবী ভাষায় صاحب বলতে বন্ধু, সাথী, নিকটে অবস্থানকারী এবং সাথে উঠা–বসা করে এমন লোককে বুঝায়। এখানে নবীর (সা) নাম উল্লেখ করা বা "আমার রসূল" বলার পরিবর্তে "তোমাদের বন্ধু" বলে তাঁর কথা উল্লেখ করার মধ্যে অত্যন্ত গভীর তাৎপর্য আছে। এভাবে কুরাইশদের একথা বুঝানো হয়েছে যে, তোমাদের কাছে যে ব্যক্তির কথা বলা হচ্ছে তিনি তোমাদের এখানে বাইরে থেকে আসা কোন অপরিচিত ব্যক্তি নন যে, আগে থেকে তোমাদের সাথে তাঁর কোন জানা শোনাই নেই। তিনি তোমাদের নিজ কওমের লোক। তোমাদের মধ্যেই তিনি থাকেন ও বসবাস করেন। তিনি কে, কি তাঁর পরিচয়, তিনি কেমন চরিত্র ও কর্মের অধিকারী মানুষ, কেমন তাঁর আচার–আচরণ, কেমন তাঁর অভ্যাস ও স্বভাব চরিত্র এবং আজ পর্যন্ত তোমাদের মাঝে তাঁর জীবন কেমন কেটেছে তা তোমাদের প্রতিটি শিশু পর্যন্ত জানে। তাঁর সম্পর্কে কেউ যদি নির্লজ্জের মত কিছু বলে তাহলে তাঁকে জানে তোমাদের মধ্যে এমন বহু মানুষ বর্তমান যারা নিজেরাই বিচার করে দেখতে পারে, একথা তাঁর ব্যাপারে প্রযোজ্য হয় কিনা।

৩. এটিই মূল কথা যার জন্য অস্তমিত তারকা বা তারকারাজির শপথ করা হয়েছে। পথভ্রষ্ট হওয়ার অর্থ পথ না চেনার কারণে কারো ভুল পথে চলা এবং বিপথগামী হওয়ার অর্থ জেনে শুনে কারো ভুল পথ অবলম্বন করা। আল্লাহর এ বাণীর তাৎপর্য হলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের একান্ত পরিচিত ব্যক্তি। তিনি পথভ্রষ্ট বা বিপথগামী হয়েছেন তাঁর বিরুদ্ধে তোমাদের এ অভিযোগ সম্পূর্ণরূপে ভুল। প্রকৃতপক্ষে তিনি পথভ্রষ্ট বা বিপথগামী কিছুই হননি। একথা বলতে যে কারণে তারকারাজির অস্তমিত হওয়ার শপথ করা হয়েছে তা হলো, রাতের অন্ধকারে যখন তারকা জ্বল জ্বল করে তখন কোন ব্যক্তি তার চারপাশের বস্তুকে স্পষ্ট দেখতে পায় না এবং বিভিন্ন বস্তুকে অস্পষ্টভাবে দেখতে পেয়ে সেগুলো সম্পর্কে ভুল অনুমান করতে পারে। যেমন অন্ধকারে দূরে থেকে কোন গাছ দেখে তাকে ভূত মনে করতে পারে। রশি পড়ে থাকতে দেখে তাকে সাপ মনে করতে পারে। বালুকাস্তূপের কোন পাথর উঁচু হয়ে থাকতে দেখে কোন হিংস্র জন্তু বসে আছে বলে মনে করতে পারে। কিন্তু যে সময় তারকাসমূহ অদৃশ্য হয়ে যায় এবং সকালের আলো উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তখন প্রতিটি বস্তু তার মূল আকার–আকৃতিতে মানুষের সামনে প্রকাশ পায়। সে সময় কোন বস্তুর মূল রূপ ও আকার আকৃতির ব্যাপারে কোন সন্দেহের সৃষ্টি হয় না। তোমাদের মধ্যে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারটাও তাই। তাঁর জীবন ও ব্যক্তিত্ব অন্ধকারে ঢাকা নয়, বরং আলোক উদ্ভাসিত ভোরের মত স্পষ্ট। তোমরা জান, তোমাদের এ "বন্ধু" একজন অতি নম্র স্বভাব, জ্ঞানী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। তাঁর সম্পর্কে কুরাইশদের কোন ব্যক্তির এ ভুল ধারণা কি করে হতে পারে যে, তিনি পথভ্রষ্ট হয়েছেন। তোমরা এও জান যে, তিনি অত্যন্ত সদিচ্ছা পরায়ণ এবং

সত্যবাদী মানুষ। তোমাদের কেউ তাঁর সম্পর্কে কি করে এ মত পোষণ করতে পারে যে, তিনি জেনে শুনে শুধু যে নিজে বাঁকা পথ অবলম্বন করে বসে আছেন তাই নয়, অন্যদেরও সে বাঁকা পথের দিকে আহবান জানাতে উঠে পড়ে লেগেছেন।

৪. অর্থাৎ যেসব কথার কারণে তোমরা তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করছো যে, তিনি পথভ্রষ্ট বা বিপথগামী হয়েছেন সেসব কথা তাঁর মনগড়া নয় কিংবা তাঁর প্রবৃত্তির কামনা–বাসনা ঐ সবের উৎস নয়। তা আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীর মাধ্যমে তাঁর ওপর নাযিল করা হয়েছে এবং হচ্ছে তিনি নিজে নবী হওয়ার আকাংখা করেননি। তাই নিজের আকাংখা পূরণের জন্য নবুওয়াতের দাবী করে বসেছেন এমন নয়। বরং আল্লাহ তা'আলা অহীর মাধ্যমে যখন তাঁকে এ পদে অভিষিক্ত হতে আদেশ দিলেন তখনই তিনি তোমাদের মাঝে রিসালাতের তাবলীগ তথা প্রচারের জন্য তৎপরতা শুরু করলেন এবং বললেন, আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর নবী। একইভাবে ইসলামের এ আন্দোলন, তাওহীদের এ শিক্ষা, আখেরাত, হাশর–নাশর এবং কাজকর্মের প্রতিদানের এ খবর মহাবিশ্ব ও মানুষ সম্পর্কে এসব সত্য ও তথ্য এবং পবিত্র জীবন যাপন করার জন্য যেসব নীতিমালা তিনি পেশ করছেন এসবও তাঁর নিজের রচিত দর্শন নয়। আল্লাহ তা'আলা অহীর মাধ্যমে তাঁকে এসব বিষয়ের জ্ঞান দান করেছেন। অনুরূপভাবে তিনি তোমাদেরকে যে কুরআন শুনিয়ে থাকেন তাও তাঁর নিজের রচিত নয়। এসব আল্লাহর বাণী। এসব বাণী অহীর মাধ্যমে তাঁর ওপর নাযিল হয়।

এখানে একটি প্রশ্ন আসে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার এ উক্তি যে, "তিনি নিজের খেয়াল খুশীমত কথা বলেন না, যা বলেন তা তাঁর কাছে নাযিলকৃত অহী ছাড়া আর কিছুই নয়।" তাঁর পবিত্র মুখ থেকে উচ্চারিত কোন্ কোন্ কথার সাথে সম্পর্কিত? তিনি যত কথা বলতেন এ উক্তি কি তার সবটার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য? নাকি কিছু কিছু কথার ওপর প্রযোজ্য আর কিছু কথার জন্য প্রযোজ্য নয়? এর জবাব হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার এ উক্তি কুরআন মজীদের ক্ষেত্রে তো প্রযোজ্য হবেই। কুরআন মজীদ ছাড়া আরো যেসব কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে উচ্চারিত হতো তাও অনিবার্যরূপে তিন ভাগে বিভক্ত হতে পারে।

দীনের প্রচার ও আল্লাহর পথে মানুষকে আহবানের জন্য তিনি যেসব কথাবার্তা বলতেন অথবা কুরআন মজীদের বিষয়বস্তু, তার শিক্ষা এবং আদেশ–নিষেধ ও হিদায়াতসমূহের ব্যাখ্যা–বিশ্লেষণ হিসেবে যা কিছু বলতেন অথবা কুরআনেরই উদ্দেশ্য ও দাবী পূরণ করার জন্য যেসব বক্তৃতা করতেন বা লোকদের উপদেশ ও শিক্ষা দিতেন এগুলো এক শ্রেণীর কথা। এসব কথা সম্পর্কে এরূপ সন্দেহ করার আদৌ কোন অবকাশ নেই যে, তা তিনি (নাউযুবিল্লাহ) মনগড়া ভাবে বলতেন। এ ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে তাঁর মর্যাদা ছিল কুরআনের সরকারী ভাষ্যকার বা মুখপাত্র এবং আল্লাহ তা'আলার মনোনীত প্রতিনিধি হিসেবে। কুরআনের প্রতিটি শব্দ যেমন নবীর (সা) ওপরে নাযিল করা হতো অনুরূপ এসব কথার প্রতিটি শব্দ যদিও তাঁর ওপর নাযিল করা হতো না কিন্তু তা অবশ্যই তাঁর ওপর নাযিলকৃত ওহীর জ্ঞান ভিত্তিক ছিল। এসব কথা ও কুরআনের মধ্যে শুধু এতটুকু পার্থক্য ছিল যে, কুরআনের ভাষা ও ভাব সব কিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে ছিল। এসব কথার অর্থ ও ভাব আল্লাহ তাঁকে শিখিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিজের ভাষায় ও শব্দে

তা প্রকাশ করতেন। এ পার্থক্যের কারণে কুরআনকে "অহীয়ে জলী" (প্রকাশ্য অহী) এবং নবীর (সা) অবশিষ্ট এসব কথাবার্তাকে "অহীয়ে খফী" (অপ্রকাশ্য অহী) বলা হয়।

নবীর (সা) দ্বিতীয় আরেক প্রকারের কথাবার্তা ছিল যা তিনি আল্লাহর বিধানের তাবলীগ ও প্রচারণার চেষ্টা সাধনায় এবং দীন প্রতিষ্ঠার তৎপরতার ক্ষেত্রে বলতেন। এ কাজে তাঁকে মুসলমানদের জামায়াতের নেতা ও পথ প্রদর্শক হিসেবে বিভিন্ন রকমের অসংখ্য দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে হতো। এসব ব্যাপারে অনেক সময় তিনি তাঁর সংগী সাথীদের পরামর্শও গ্রহণ করেছেন, নিজের মত বাদ দিয়ে তাদের মতও গ্রহণ করেছেন। তাদের জানতে চাওয়ার প্রেক্ষিতে কোন কোন সময় স্পষ্টভাবে বলেছেনও যে, একথা আমি আল্লাহর আদেশে নয়, নিজের মত হিসেবেই বলছি। তাছাড়া অনেকবার এ রকমও হয়েছে যে, তিনি নিজের ইজতিহাদের ভিত্তিতে কোন কথা বলেছেন কিন্তু পরে আল্লাহর পক্ষ থেকে তার পরিপন্থী নির্দেশনা এসেছে। এ ধরনের যত কথা তিনি বলেছেন তার কোন কথাই আদৌ এমন ছিল না এবং থাকতে পারে না যা তাঁর প্রবৃত্তির খেয়ালখুশী ও কামনা–বাসনার ফল। এখন প্রশ্ন হলো, তাঁর এ ধরনের সব কথা কি অহী ভিত্তিক ছিল? এ প্রশ্নের জবাব হলো, যেসব কথা সম্পর্কে তিনি নিজে স্পষ্ট করে বলেছেন যে, একথা আল্লাহর নির্দেশ ভিত্তিক নয়, কিংবা যে ক্ষেত্রে তিনি সাহাবীদের (রা) পরামর্শ চেয়েছেন এবং তাদের মতামত গ্রহণ করেছেন অথবা যেসব ক্ষেত্রে কোন কথা বা কাজ হয়ে যাওয়ার পর আল্লাহ তা'আলা তার পরিপন্থী হিদায়াত নাযিল করেছেন সে কথা ছাড়া তাঁর আর সব কথাই পূর্বোক্ত ধরনের কথাসমূহের মত 'অহীয়ে খফী'র অন্তরভুক্ত। তাই ইসলামী আন্দোলনের নেতা ও পথ প্রদর্শক, মু'মিনদের দলের সরদার এবং ইসলামী রাষ্ট্রের শাসকের যে পদ মর্যাদায় তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন তা তাঁর নিজের রচিত বা মানুষের প্রদত্ত ছিল না। তিনি আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এ কাজ করার জন্য আদিষ্ট ও নিযুক্ত হয়েছিলেন। এ পদমর্যাদার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে গিয়ে তিনি যা কিছু বলতেন এবং করতেন তা আল্লাহর ইচ্ছার প্রতিনিধিত্বের মর্যাদা নিয়ে করতেন। এ ক্ষেত্রে যেসব কথা তিনি তাঁর ইজতিহাদের ভিত্তিতে বলতেন, তাঁর ঐসব ইজতিহাদের অনেকগুলো আল্লাহর কাছে অত্যন্ত পছন্দনীয় ছিল। আল্লাহ তাঁকে জ্ঞানের যে আলো দিয়েছিলেন ওগুলো তা থেকে উৎসারিত ছিল। এ কারণে তাঁর ইজতিহাদ যেখানেই আল্লাহর পছন্দের বাইরে চলে গিয়েছে সেখানে তৎক্ষণাৎ "অহীয়ে জলী"র মাধ্যমে তা সংশোধন করে দেয়া হয়েছে। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর কোন কোন ইজতিহাদের এ সংশোধনই এ কথা প্রমাণ করে যে, তাঁর অবশিষ্ট সমস্ত ইজতিহাদ হুবহু আল্লাহর মর্জির সাথে সংগতিপূর্ণ ছিল।

তৃতীয় আরেক রকমের কথা ছিল যা মানুষ হিসেবে নবী (সা) সাধারণ কাজকর্মে বলতেন। নবুওয়াতের দায়–দায়িত্ব পালনের সাথে এসব কথার কোন সম্পর্ক ছিল না। এ ধরনের কথা তিনি নবী হওয়ার পূর্বেও বলতেন এবং নবী হওয়ার পরেও বলতেন। এ ধরনের কথা সম্পর্কে সর্ব প্রথমে বুঝে নিতে হবে যে, ঐ গুলো নিয়ে কাফেরদের সাথে কোন ঝগড়া বিবাদ ছিল না। এসব কথার কারণে কাফেররা তাঁকে পথভ্রষ্ট ও বিপথগামী বলেনি।

তারা এ অভিযোগ আরোপ করতো প্রথম দুই শ্রেণীর কথার ক্ষেত্রে। তাই এ তৃতীয় প্রকারের কথা আদৌ আলোচ্য বিষয় ছিল না। অতএব আল্লাহ তা'আলার এ বাণী এ

প্রকারের কথার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কিন্তু ঐ প্রকারের কথা এখানে আলোচনা বহির্ভূত হওয়া সত্ত্বেও এটা বাস্তব যে, জীবনের একান্ত ব্যক্তিগত ক্ষেত্রেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে কখনো সত্যের পরিপন্থী কোন কথা বের হতো না। নবী ও মুত্তাকী সুলভ জীবন যাপনের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁর জন্য কথা ও কাজের যে সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন তাঁর কথা ও কাজ সদা সর্বদা সে গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতো। তাই প্রকৃত পক্ষে ঐ সব কথার মধ্যেও অহীর নূর প্রতিফলিত হতো। কোন কোন সহীহ হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একথাটিই বর্ণিত হয়েছে। মুসনাদে আহমদে হযরত আবু হুরাইরা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, এক সময় নবী (সা) বলেছিলেন, لَا اَقُولُ الا حَقًا "আমি কখনো সত্য কথা ছাড়া বলি না।" এক সাহাবী বললেন ঃ فانك تداعبنا يا رسول الله "হে আল্লাহর রসূল, অনেক সময় তো আপনি আমাদের সাথে হাসি-ঠাট্টাও করেন।" জবাবে নবী (সা) বললেন ঃ انى لا اقول الا حقا "প্রকৃতপক্ষে তখনো আমি সত্য ছাড়া কিছু বলি না।" মুসনাদে আহমদ ও আবু দাউদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আ'স থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেনঃ আমি (রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র মুখ থেকে যা-ই শুনতাম তা সংরক্ষিত করার উদ্দেশ্যে লিখে রাখতাম। কুরাইশরা আমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করলো তারা বলতে শুরু করলো, তুমিতো সব কথাই লিপিবদ্ধ করে যাচ্ছো। অথচ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো মানুষ। অনেক সময় রাগান্বিত হয়েও কোন কথা বলেন। এতে আমি লেখা ছেড়ে দিলাম। পরবর্তী সময়ে আমি এ বিষয়টি নবীর (সা) কাছে বললে তিনি বললেন ঃ

اكتب فوالذى نفسى بيده ما خرج منى الا الحق

"তুমি লিখতে থাকো, যাঁর মুঠিতে আমার প্রাণ সে মহান সত্তার শপথ, আমার মুখ থেকে সত্য ছাড়া কখনো কোন কথা উচ্চারিত হয়নি।"

এ বিষয়ে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আমার গ্রন্থ তাফহীমাত, ১ম খণ্ড, শিরোনাম "রিসালাত আওর উসকে আহকাম"। (নির্বাচিত রচনাবলী, ১ম খণ্ড)

৫. অর্থাৎ তাঁকে শিক্ষাদানকারী কোন মানুষ নয়, যা তোমরা মনে করে থাকো। মানব সত্তার উর্ধের একটি মাধ্যম থেকে তিনি এ জ্ঞান লাভ করছেন। "মহাশক্তির অধিকারী" অর্থ কারো কারো মতে আল্লাহর পবিত্র সত্তা। কিন্তু তাফসীরকারদের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এ ব্যাপারে একমত যে, এর অর্থ জিবরাঈল আলাইহিস সালাম। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত আয়েশা (রা), হযরত আবু হুরায়রা (রা), কাতাদা, মুজাহিদ এবং রাবী' ইবনে আনাস থেকে এ মতটিই বর্ণিত হয়েছে। ইবনে জারীর, ইবনে কাসীর, রাযী, আলূসী প্রমুখ তাফসীরকারগণও এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেব এবং মাওলানা আশরাফ আলী সাহেবও তাঁদের অনুবাদে এটিই অনুসরণ করেছেন। সত্য বলতে কি, কুরআন মজীদের অন্যান্য বর্ণনা থেকেও এটি প্রমাণিত হয়েছে। সূরা তাকভীরে আল্লাহ তা'আলা বলেছেনঃ

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُوْلٍ كَرِيْمٍ ذِىْ قُوَّةٍ عِنْدَذِى الْعَرْشِ مَكِيْنٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِيْنٍ وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُوْنٍ وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ -

(ايـات : ١٩-٢٣)

"প্রকৃতপক্ষে এ এক মহাশক্তিধর সম্মানিত ফেরেশতার বর্ণনা, আরশের অধিপতির কাছে অত্যন্ত মর্যাদাবান। তাঁর আদেশ পালিত হয় এবং সেখানে অত্যন্ত বিশ্বাসী। তোমাদের বন্ধু মোটেই পাগল নন। তিনি সে ফেরেশতাকে আসমানের পরিষ্কার দিগন্তে দেখেছেন।"

যে ফেরেশতার মাধ্যমে নবীর (সা) হৃদয়-মনে এ শিক্ষা নাযিল করা হয়েছিল সূরা বাকারার ৯৭ আয়াতে সে ফেরেশতার নামও বলে দেয়া হয়েছে ঃ

قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّجِبْرِيْلَ فَاِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلٰى قَلْبِكَ بِاِذْنِ اللّٰهِ

যদি এসব আয়াত সূরা 'নাজ্‌মে'র এ আয়াতের সাথে মিলিয়ে পাঠ করা হয় তাহলে এ ব্যাপারে আদৌ সন্দেহের অবকাশ থাকে না যে, মহাশক্তিধর শিক্ষক বলতে যে, আল্লাহ তা'আলাকে নয়, বরং জিবরাঈলকে বুঝানো হয়েছে সে ব্যাপারে আদৌ কোন সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এ বিষয়ে পরে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

এ ক্ষেত্রে কেউ কউ সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, জিবরাঈলকে কি করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষক বলা যায়। তাহলে তো এর অর্থ দাঁড়াবে তিনি শিক্ষক আর নবী (সা) ছাত্র। এভাবে তো নবীর (সা) তুলনায় জিবরাঈল আলাইহিস সালামের মর্যাদা অধিক বলে স্বীকার করে নেয়া হয়। কিন্তু এরূপ সন্দেহ করা ভুল। কারণ, জিবরাঈল নবীকে (সা) তাঁর নিজের জ্ঞান শিক্ষা দিতেন না যে, তাঁর মর্যাদা অধিক হয়ে যাবে। তাঁকে আল্লাহ তা'আলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত জ্ঞান পৌছিয়ে দেয়ার মাধ্যম বানিয়েছিলেন। শিক্ষার মাধ্যম বা বাহক হওয়ার কারণে তিনি রূপক অর্থে নবীর (সা) শিক্ষক ছিলেন। এতে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কোন ব্যাপার নেই। পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার পর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামাযের সঠিক সময় জানানোর জন্য তাঁকে দু'দিন পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে তাঁর কাছে পাঠিয়েছিলেন। বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, এবং মুয়াত্তা প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে সহীহ সনদে এ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এসব হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই বলেছেন যে, তিনি মুক্তাদী হয়েছিলেন এবং জিবরাঈল আলাইহিস সালাম ইমাম হয়ে নামায পড়িয়েছিলেন। এভাবে শুধু শিক্ষার জন্য তাঁকে ইমাম বানানোর অর্থ এ নয় যে, জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবীর (সা) চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। এটাও ঠিক অনুরূপ ব্যাপার।

৬. মূল আয়াতে ذُوْمِرَّةٍ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ইবনে আব্বাস ও কাতাদা একে সুন্দর ও জাঁকজমকপূর্ণ অর্থে গ্রহণ করেছেন। মুজাহিদ, হাসান বাসরী, ইবনে যায়েদ এবং সুফিয়ান সাওরী বলেন ঃ এর অর্থ শক্তিশালী। সাঈদ ইবনে মুসাইয়েবের মতে এর অর্থ

জ্ঞানের অধিকারী। হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى এ হাদীসে مرة শব্দকে তিনি সুস্থ ও সবল অর্থে ব্যবহার করেছেন। আরবী বাক রীতিতে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম, বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী অর্থেও এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এখানে জিবরাঈল আলাইহিস সালামের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা এ ব্যাপক অর্থব্যঞ্জক শব্দটি ব্যবহার করেছেন এই জন্য যে, তাঁর মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিক ও শারীরিক উভয় প্রকার শক্তি পূর্ণ মাত্রায় বিদ্যমান। এর সবগুলো অর্থ এক সাথে বুঝানোর মত কোন শব্দ বাংলা ভাষায় নেই। তাই অনুবাদে আমরা এর মধ্য থেকে একটি অর্থকে গ্রহণ করেছি। কারণ, পূর্বের আয়াতাংশেই দৈহিক শক্তির পূর্ণতার উল্লেখ করা হয়েছে।

৭. দিগন্ত অর্থ আসমানের পূর্ব প্রান্ত যেখানে সূর্য উদিত হয় এবং দিনের আলো ছড়িয়ে পড়ে। সূরা তাকভীরের ২৩ আয়াতে একেই পরিষ্কার দিগন্ত বলা হয়েছে। দু'টি আয়াত থেকেই পরিষ্কার বুঝা যায় যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথমবার যখন জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে দেখেন তখন তিনি আসমানের পূর্ব প্রান্ত থেকে আত্ম প্রকাশ করেছিলেন। নির্ভরযোগ্য কিছুসংখ্যক রেওয়ায়াত থেকে জানা যায় আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মূল যে আকৃতিতে সৃষ্টি করেছিলেন সে সময় তিনি সে মূল আকৃতিতে ছিলেন। যে সব রেওয়ায়াতে এ বিষয়ে বর্ণনা করা হয়েছে পরে আমরা তার সবগুলোই উদ্ধৃত করবো।

৮. অর্থাৎ আসমানের পূর্ব দিগন্তের উপরের দিকে আবির্ভূত হওয়ার পর জিবরাঈল আলাইহিস সালাম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে অগ্রসর হতে থাকলেন এবং অগ্রসর হতে হতে তাঁর কাছে এসে উপর দিকে শূন্যে ঝুলে থাকলেন। এরপর তিনি তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন এবং এতটা নিকটবর্তী হলেন যে, তাঁর এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে কেবল মুখোমুখি দু'টি ধনুকের জ্যা পরিমাণ কিংবা তার চেয়েও কিছু কম ব্যবধান রইলো। সাধারণভাবে মুফাসসিরগণ قاب قوسين অর্থ দুই ধনুক পরিমাণই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) قوس শব্দের অর্থ করেছেন হাত এবং كَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ অর্থ করেছেন এই যে, উভয়ের মাঝে তখন দুই হাত পরিমাণ ব্যবধাণ ছিল। মুখোমুখি লাগানো দু'টি ধনুকের মধ্যবর্তী ব্যবধানের সমান কিংবা তার চেয়ে কিছু কম ব্যবধান ছিল বলার অর্থ এ নয় যে, দূরত্বের পরিমাণ নির্ণয়ের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কোন সন্দেহ হয়েছে, (নাউযুবিল্লাহ)। এ ধরনের বাচনভঙ্গি গ্রহণের কারণ হলো সব ধনুক একই পরিমাপের হয় না। সুতরাং ঐ হিসেব অনুসারে যদি কোন দূরত্ব বর্ণনা করা হয় তাহলে দূরত্বের পরিমাণে অবশ্যই কম বেশী হবে।

৯. মূল আয়াত হচ্ছে, فَاَوْحَى اِلَى عَبْدِهِ مَا اَوْحَى । এ আয়াতাংশটির দু'টি অনুবাদ সম্ভব। একটি হচ্ছে, তিনি আল্লাহর বান্দার প্রতি যা কিছু অহী নাযিল করার ছিল, তা করলেন। দ্বিতীয়টি হচ্ছে, তিনি অহী করলেন নিজের বান্দার ওপর যা কিছু অহী করার ছিল। প্রথম অনুবাদ করা হলে তার অর্থ হবে জিবরাঈল আল্লাহর বান্দাকে অর্থাৎ রসূল (সা)-কে অহী দিলেন যা তাঁকে অহী দেয়ার ছিল। দ্বিতীয় অনুবাদটি করলে তার অর্থ হবে, আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈলের মাধ্যমে তাঁর বান্দাহকে অহী দিলেন যা অহী দেয়ার ছিল। তাফসীরকারগণ এ দু'টি অর্থই বর্ণনা করেছেন। কিন্তু প্রথম অর্থটাই পূর্বাপর বিষয়ের

সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল। হযরত হাসান বাসরী এবং ইবনে যায়েদ থেকে এ অর্থটাই বর্ণিত হয়েছে। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উত্থাপিত হতে পারে যে, عبده শব্দের ه সর্বনাম اوحى ক্রিয়ার কর্তার প্রতি ইংগিত করার পরিবর্তে আল্লাহর প্রতি কিভাবে ইংগিত করবে? কারণ সূরার শুরু থেকে এ পর্যন্ত কোথাও আদৌ আল্লাহর নাম উল্লেখিত হয়নি। এর জবাব হলো, যেখানে বক্তব্যের পূর্ব প্রসংগ দ্বারা সর্বনামের উদ্দিষ্ট বিশেষ ব্যক্তির প্রতি সুস্পষ্ট ইংগিত পাওয়া যায় সেখানে পূর্বে উল্লেখ করা হোক বা না হোক সর্বনাম দ্বারা আপনা থেকেই সে ব্যক্তিকে বুঝাবে। কুরআন মজীদে এর অনেকগুলো দৃষ্টান্ত আছে। যেমন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ "আমি কদরের রাতে তা নাযিল করেছি।" এখানে কোথাও কুরআনের উল্লেখ মোটেই করা হয়নি। কিন্তু বক্তব্য থেকে ইংগিত পাওয়া যাচ্ছে যে, ه সর্বনাম দ্বারা কুরআনকেই বুঝানো হয়েছে। অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوْا مَا تَرَكَ عَلٰى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ

"আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করতে শুরু করেন তাহলে তার পৃষ্ঠে জীবন্ত কিছুই রাখবেন না"

এখানে আগে বা পরে পৃথিবীর কোন উল্লেখ করা হয়নি। কিন্তু কথার ধরন থেকে আপনিই প্রকাশ পায় যে, তার পৃষ্ঠ অর্থ ভূ-পৃষ্ঠ। সূরা ইয়াসীনে বলা হয়েছে وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِىْ لَهٗ "আমি তাঁকে কবিতা শিক্ষা দেইনি। আর কবিতা তার জন্য শোভাও পায় না। এখানে পূর্বে বা পরে কোথাও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু কথার ধরন থেকে প্রকাশ পায় যে, সর্বনামগুলো তাঁর প্রতি ইংগিত করেছে। সূরা আর-রাহমানে বলা হয়েছে ঃ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ "তার ওপরে যা আছে সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।" এখানে আগে ও পরে পৃথিবী পৃষ্ঠের কোন উল্লেখ নেই। কিন্তু বাচনভঙ্গি দ্বারা বুঝা যায় عَلَيْهَا এর সর্বনাম ها দ্বারা সেদিনকেই ইংগিত করা হয়েছে।

সূরা ওয়াকিয়ায় বলা হয়েছে ঃ اِنَّا اَنْشَاْنٰهُنَّ اِنْشَاۤءً "আমি তাদেরকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করবো। আশে পাশে এমন কোন বস্তু নেই যার প্রতি هُنَّ শব্দটি দ্বারা ইংগিত করা হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। কথার ভঙ্গি থেকে প্রকাশ পায় যে, এর দ্বারা জান্নাতের নারীদের বুঝানো হয়েছে। জিবরাঈল নিজের বান্দাকে অহী দিলেন اَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ আয়াতাংশের অর্থ যেহেতু এরকম হতে পারে না। তাই "জিবরাঈল (আ) আল্লাহর বান্দাকে অহী দিলেন কিংবা আল্লাহ জিবরাঈলের মাধ্যমে তাঁর বান্দাকে অহী দিলেন" অনিবার্যরূপে এ অর্থই গ্রহণ করতে হবে।

১০. অর্থাৎ দিনের আলোতে, পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় এবং খোলা চোখে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা কিছু দেখলেন সে সম্পর্কে তাঁর মন বলেনি যে, এসব দৃষ্টিভ্রম কিংবা আমি কোন জিন বা শয়তান দেখছি কিংবা আমার সামনে কোন কাল্পনিক ছবি ভেসে উঠেছে এবং জেগে জেগেই কোন স্বপ্ন দেখছি। বরং তাঁর চোখ যা দেখছিলো মন হবহু তাই বিশ্বাস করেছে। তিনি যে সত্যিই সত্যিই জিবরাঈল এবং যে বাণী তিনি পৌঁছিয়ে দিচ্ছিলেন তাও বাস্তবে আল্লাহর অহী সে ব্যাপারে তার মনে কোন সন্দেহই জাগেনি।

এখানে প্রশ্ন জাগে যে, কি কারণে এ বিস্ময়কর ও অস্বাভাবিক ব্যাপার দেখা সত্ত্বেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মনে আদৌ কোন সন্দেহ সৃষ্টি হলো না এবং তিনি পূর্ণ নিশ্চয়তা সহ জানতে পারলেন যে, তাঁর চোখ যা দেখছে তা প্রকৃতপক্ষেই সত্য ও বাস্তব, কোন কাল্পনিক বস্তু বা কোন জিন কিংবা শয়তান নয়? এ প্রশ্ন নিয়ে আমরা যখন গভীরভাবে চিন্তা করি তখন পাঁচটি কারণ আমাদের বোধগম্য হয়।

প্রথম কারণ, যে পারিপার্শিক অবস্থা ও পরিবেশে দেখার কাজটি সংঘটিত হয়েছিল সেটাই তার সত্যতা সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করে দেয়। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্ধকারে মুরাকাবারত অবস্থায় স্বপ্নে কিংবা অর্ধ জাগ্রত অবস্থায় এ দর্শন লাভ করেছিলেন না, বরং তখন সকালের পরিষ্কার আলোয় চারদিক উদ্ভাসিত ছিল, তিনি পুরোপুরি জাগ্রত ছিলেন, খোলা আকাশে এবং দিনের পূর্ণ আলোতে তিনি নিজ চোখে ঠিক তেমনিভাবে এ দৃশ্য দেখতে পাচ্ছিলেন যেমন কোন ব্যক্তি পৃথিবীর অন্যান্য জিনিস দেখে থাকে। এতে যদি সন্দেহের অবকাশ থাকে তাহলে আমরা দিনের বেলা নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত, মানুষ, ঘরবাড়ী, মোট কথা যা কিছু দেখে থাকি তা সবই সন্দেহ যুক্ত এবং শুধু দৃষ্টিভ্রম ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না।

দ্বিতীয় কারণ, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মানসিক অবস্থাও এর সত্যতার স্বপক্ষে দৃঢ় প্রত্যয় সৃষ্টি করছিলো। তিনি পূর্ণরূপে স্বজ্ঞান ও সুস্থ ছিলেন। তাঁর ইন্দ্রিয়সমূহ সুস্থ ও সচল ছিল। তাঁর মন-মগজে পূর্ব থেকে এরূপ কোন খেয়াল চেপে ছিল না যে, এ ধরনের কোন দর্শন লাভ হওয়া উচিত বা হতে যাচ্ছে। এরূপ চিন্তা এবং তা অর্জন করার চেষ্টা থেকে মন-মগজ সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিল। এ পরিস্থিতিতে তিনি আকস্মিকভাবে এ ঘটনার মুখোমুখি হলেন। তাই সন্দেহ করার আদৌ কোন অবকাশ ছিল না যে, চোখ কোন বাস্তব দৃশ্য দেখছে না, বরং সামনে এসে দাঁড়ানো একটি কাল্পনিক বস্তু দেখছে।

তৃতীয় কারণ, এ পরিস্থিতিতে তাঁর সামনে যে সত্তা আবির্ভূত হয়েছিল তা এত বিরাট, এত জাঁকালো, এত সুন্দর এবং এতই আলোকোদ্ভাসিত ছিল যে, ইতিপূর্বে নবীর (সা) চিন্তায় ও ধ্যান-ধারণায় এরূপ সত্তার কল্পিত রূপও আসেনি। সুতরাং তা তাঁর কল্পনা প্রসূতও ছিল না। কোন জিন বা শয়তান এমন জাঁকালো হতে পারে না। তাই তিনি তাকে ফেরেশতা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেননি। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ থেকে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : সে সময় আমি জিবরাঈলকে দেখেছি, তাঁর তখন ছয়শত ডানা ছিল (মুসনাদে আহমদ)। অপর একটি বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) আরো ব্যাখ্যা করেছেন যে, জিবরাঈল আলাইহিস সালামের এক একটি ডানা এমন বিশাল ছিল যে, গোটা দিগন্ত জুড়ে আছে বলে মনে হচ্ছিল (মুসনাদে আহমদ)। আল্লাহ তা'আলা নিজে তাঁর অবস্থাকে شَدِيْدُ الْقُوٰى এবং ذُوْمِرَّةٍ শব্দ দিয়ে বর্ণনা করছেন।

চতুর্থ কারণ, সে সত্তা যেসব শিক্ষা দান করছিলেন তাও এ সাক্ষাতের সত্যতা সম্পর্কে প্রশান্তিদায়ক ছিল। তাঁর মাধ্যমে তিনি হঠাৎ যেসব জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং গোটা মহাবিশ্বের প্রকৃত সত্য ও তাৎপর্যের ধারক যেসব জ্ঞান লাভ করলেন তাঁর মন-মগজে সে সম্পর্কে কোন ধারণাও ছিল না। তাই তিনি সন্দেহ করেননি যে, আমারই ধ্যান-ধারণা ও কল্পনা সুবিন্যস্ত হয়ে আমার সামনে এসে হাজির হয়েছে। অনুরূপভাবে ঐ জ্ঞান সম্পর্কে

عِندَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَىٰ ﴿١٥﴾ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَىٰ ﴿١٦﴾ مَا زَاغَ الْبَصَرُ
وَمَا طَغَىٰ ﴿١٧﴾ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ﴿١٨﴾ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ
وَالْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿٢٠﴾ أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ﴿٢١﴾
تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ﴿٢٢﴾ إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ
وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى
الْأَنفُسُ ۖ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ ﴿٢٣﴾ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّىٰ ﴿٢٤﴾
فَلِلَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَىٰ ﴿٢٥﴾

যার সন্নিকটেই জান্নাতুল মা'ওয়া অবস্থিত।[১১] সে সময় সিদরাকে আচ্ছাদিত করছিলো এক আচ্ছাদনকারী জিনিস।[১২] দৃষ্টি ঝলসেও যায়নি কিংবা সীমা অতিক্রমও করেনি।[১৩] সে তার রবের বড় বড় নিদর্শনসমূহ দেখেছে।[১৪]

এখন একটু বলতো, তোমরা কি কখনো এ লাত, এ উয্‌যা এবং তৃতীয় আরো একজন দেবতা মানাতের প্রকৃত অবস্থা সম্পর্কে গভীর ভাবে চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছো?[১৫] তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান আর কন্যা সন্তান কি আল্লাহর জন্য?[১৬] তাহলে এটা অত্যন্ত প্রতারণামূলক বন্টন। প্রকৃতপক্ষে এসব তোমাদের বাপ দাদাদের রাখা নাম ছাড়া আর কিছুই না। এজন্য আল্লাহ কোন সনদপত্র নাযিল করেন নি।[১৭] প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে মানুষ শুধু ধারণা ও প্রবৃত্তির বাসনার দাস হয়ে আছে।[১৮] অথচ তাদের রবের পক্ষ থেকে তাদের কাছে হিদায়াত এসেছে।[১৯] মানুষ যা চায় তাই কি তার জন্য ঠিক?[২০] দুনিয়া ও আখেরাতের মালিক তো একমাত্র আল্লাহ।

এমন সন্দেহ পোষণেরও কোন অবকাশ ছিল না যে, শয়তান ঐ আকৃতিতে এসে তাঁকে ধোঁকা দিচ্ছে। কারণ, মানুষকে শিরক ও মূর্তিপূজার পরিবর্তে নির্ভেজাল তাওহীদের শিক্ষা দেয়া কি কখনো শয়তানের কাজ হতে পারে, না শয়তান কোনদিন এমন কাজ করেছে? আখেরাতের জবাবদিহি সম্পর্কে কি শয়তান কখনো মানুষকে সাবধান করেছে? জাহেলিয়াত ও তার রীতিনীতির বিরুদ্ধে কি মানুষকে কখনো ক্ষেপিয়ে তুলেছে? নৈতিক গুণাবলীর প্রতি কি আহবান জানিয়েছে? নাকি কোন ব্যক্তিকে বলেছে, তুমি নিজে শুধু এ

শিক্ষাকে গ্রহণ কর তাই নয়, বরং গোটা বিশ্বের বুক থেকে শিরক, জুলুম এবং পাপ পঙ্কিলতাকে উৎখাত এবং ঐসব দুষ্কৃতির জায়গায় তাওহীদ, ন্যায়বিচার এবং তাকওয়ার সুফলসমূহ প্রতিষ্ঠা করার জন্য উঠে পড়ে লেগে যাও?

পঞ্চম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা যখন কোন ব্যক্তিকে নবুওয়াত দানের জন্য বাছাই করেন তখন তাঁর হৃদয়-মনকে সব রকম সন্দেহ সংশয় ও শয়তানী প্ররোচনা থেকে মুক্ত করে দৃঢ় বিশ্বাস ও প্রত্যয় দ্বারা পূর্ণ করে দেন। এ অবস্থায় তাঁর চোখ যা দেখে এবং কান যা শোনে তার সত্যতা সম্পর্কে তাঁর মন-মগজে সামান্যতম দ্বিধা-দ্বন্দ্বও সৃষ্টি হয় না। তিনি সম্পূর্ণ উদার ও উন্মুক্ত মনে এমন প্রতিটি সত্যকে গ্রহণ করে নেন যা তাঁর রবের পক্ষ থেকে তাঁর কাছে প্রকাশ করা হয়। তা চোখে দেখার মত প্রত্যক্ষ পর্যবেক্ষণ হতে পারে, ইলহামী জ্ঞান হিসেবে তাঁর মনে সৃষ্টি করা হতে পারে কিংবা অহীর পয়গাম হিসেবে আসতে পারে একটি একটি করে যার প্রতিটি শব্দ শুনানো হয়ে থাকে। এর সবক'টি ক্ষেত্রেই নবীর এ উপলব্ধি পুরোপুরিই থাকে যে, তিনি সব রকম শয়তানী হস্তক্ষেপ থেকে চূড়ান্তভাবে সুরক্ষিত। যে আকারেই হোক না কেন যা কিছু তাঁর কাছে পৌঁছছে তা অবিকল তাঁর প্রভুর নিকট থেকে এসেছে। আল্লাহ প্রদত্ত সমস্ত অনুগ্রহ ও নিয়ামতের মত নবীর এ উপলব্ধি ও অনুভূতিও এমন একটি নিশ্চিত জিনিস যার মধ্যে ভুল বুঝাবুঝি বা বিভ্রান্তির কোন সম্ভাবনা নেই। মাছের যেমন তার সাঁতারু হওয়া সম্পর্কে পাখির যেমন তার পাখি হওয়া সম্পর্কে এবং মানুষের যেমন তার মানুষ হওয়া সম্পর্কে অনুভূতি আছে এবং তা আল্লাহ প্রদত্ত। এতে যেমন বিভ্রান্তির লেশমাত্র থাকতে পারে না। অনুরূপ নবীর তাঁর নবী হওয়া সম্পর্কে যে অনুভূতি তাও আল্লাহ প্রদত্ত হয়ে থাকে। কখনো এক মুহূর্তের জন্যও তাঁর মনে এ সন্দেহ জাগে না যে, নবী হওয়ার ব্যাপারে হয়তো সে বিভ্রান্তির শিকার হয়েছে।

১১. এটা জিবরাঈল আলাইহিস সালামের সাথে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্বিতীয়বারের মত সাক্ষাত। এ সাক্ষাতকারের সময় জিবরাঈল আলাইহিস সালাম নবীর (সা) সামনে তাঁর আসল চেহারায় আবির্ভূত হয়েছিলেন। এ সাক্ষাৎকারের স্থান বলা হয়েছে سدرة المنتهى । সাথে সাথে একথাও বলা হয়েছে যে, তার নিকটেই "জান্নাতুল মা'ওয়া" অবস্থিত।

আরবীতে 'সিদরা' বলা হয় বরই গাছকে আর 'মুনতাহা' অর্থ শেষ প্রান্ত সুতরাং سدرة المنتهى -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, শেষ প্রান্তে অবস্থিত বরই-গাছ। আল্লামা আলূসী "রূহুল মাআনী"তে এর ব্যাখ্যা করেছেন : اليها ينتهى علم كل عالم وما وراء ها لا يعلمه الا الله "এ পর্যন্ত গিয়ে সব জ্ঞানীর জ্ঞান শেষ হয়ে যায়। এর পরে যা আছে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না।" ইবনে জারীর তাঁর তাফসীরে এবং ইবনে আসীর" النهاية فى غريب الحديث والاثر এও প্রায় অনুরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। বস্তু জগতের শেষ প্রান্তে অবস্থিত সে কুল বৃক্ষ কেমন এবং তার প্রকৃতি ও পরিচয় কি তা জানা আমাদের জন্য কঠিন। এটা আল্লাহ তা'আলার সৃষ্ট মহাবিশ্বের এমন রহস্যাবৃত বিষয় যেখানে আমাদের বোধ ও উপলব্ধি পৌঁছতে অক্ষম। যাই হোক, সেটা হয়তো এমন কোন জিনিস যা বুঝানোর মানুষের ভাষায় سدرة শব্দের চেয়ে অধিক উপযুক্ত শব্দ আল্লাহ তা'আলা আর কোন কিছুকে মনে করেননি।

"জান্নাতুল মা'ওয়া"র আভিধানিক অর্থ এমন জান্নাত যা অবস্থান স্থল হতে পারে। হযরত হাসান বাসরী বলেন : এটা সেই জান্নাত যা আখেরাতে ঈমানদার ও তাকওয়ার অধিকারী লোকেরা লাভ করবে। এ আয়াত দ্বারাই তিনি প্রমাণ করেছেন যে, এ জান্নাত আসমানে অবস্থিত। কাতাদা (রা) বলেন : এটাই সে জান্নাত যেখানে শহীদদের রূহসমূহ রাখা হয়। আখেরাতে যে জান্নাত পাওয়া যাবে এটা সে জান্নাত নয়। ইবনে আব্বাসও (রা) একথাই বলেন। তিনি অধিক এতটুকু বলেছেন যে, আখেরাতে ঈমানদারগণ যে জান্নাত লাভ করবেন এটা সে জান্নাত নয়। সে জান্নাতের স্থান এ পৃথিবীতেই।

১২. অর্থাৎ তার অবস্থাও প্রকৃত বর্ণনার অতীত। সেটা ছিল এমন আলোকোচ্ছটা মানুষ যার কল্পনাও করতো না এবং মানুষের কোন ভাষা তার বর্ণনা দিতেও সক্ষম নয়।

১৩. অর্থাৎ একদিকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরম সহ্য ও গ্রহণ ক্ষমতার অবস্থা ছিল এই যে, এ ধরনের সাংঘাতিক আলোকোচ্ছটার সামনেও তাঁর দৃষ্টি কোন রকম ঝলসে যায়নি। তিনি পূর্ণ প্রশান্তিসহ ঐ সব দেখেছেন। অপরদিকে তাঁর সংযম ও একাগ্রতার পরাকাষ্ঠা ছিল এই যে, যে উদ্দেশ্যে তাঁকে ডেকে নেয়া হয়েছিল সেদিকেই তিনি তাঁর মন-মগজ ও দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন। যেসব বিস্ময়কর দৃশ্যাবলী সেখানে ছিল তা দেখার জন্য তিনি একজন কৌতূহলী ও বিমুগ্ধ দর্শকের মত এদিক সেদিক দৃষ্টি দেননি। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কোন ব্যক্তি কোন পরাক্রমশালী বাদশাহর দরবারে যাওয়ার সুযোগ লাভ করলো এবং সেখানে সে এমন জাঁকজমকপূর্ণ কিছু জিনিস দেখতে পেল যা সে কোন দিন কল্পনার চোখ দিয়েও দেখেনি। লোকটি যদি নীচাশয় হয় তাহলে সেখানে গিয়ে সে বিস্ময় বিমূঢ় হয়ে পড়বে এবং দরবারের আদব কায়দা সম্পর্কে যদি অজ্ঞ হয় তাহলে শাহী মর্যাদা সম্পর্কে অমনযোগী হয়ে দরবারের সাজ সজ্জা দেখার জন্য সবদিকে ঘুরে ঘুরে তাকাতে থাকবে। কিন্তু একজন উঁচুমনা ও বুদ্ধিমান, রীতিনীতি ও নিয়ম-কানুন সম্পর্কে সচেতন এবং কর্তব্য পরায়ণ কোন ব্যক্তি সেখানে গিয়ে হতভম্ব হবে না এবং দরবারের দৃশ্য দেখার জন্যও ব্যস্ত হয়ে পড়বে না। সে গাম্ভীর্য ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে সেখানে হাজির হবে। যে উদ্দেশ্যে তাকে দরবারে ডাকা হয়েছে সেদিকে মনোনিবেশ করবে। এ আয়াতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ গুণটির প্রশংসা করা হয়েছে।

১৪. এ আয়াত থেকে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলাকে দেখেননি কেবল তার বিশাল ও বিপুল নিদর্শনাদি দেখেছেন। যেহেতু পূর্বাপর প্রসংগের বিচারে দ্বিতীয় বারও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সে সত্তার সাথে সাক্ষাত হয়েছিল যার সাথে প্রথম বার সাক্ষাত ঘটেছিল। তাই অনিবার্যরূপে একথা মানতে হবে যে, প্রথমবার তিনি উঁচু দিগন্তে যাকে দেখেছিলেন তিনিও আল্লাহ ছিলেন না এবং দ্বিতীয়বার سدرة المنتهى'র কাছে যাকে দেখেছিলেন তিনিও আল্লাহ ছিলেন না। এ দু'টি ক্ষেত্রের কোন একটিতেও যদি তিনি আল্লাহকে দেখতেন তাহলে তা হতো এমন একটি অতি গুরুত্ব পূর্ণ ব্যাপার যা অবশ্যই স্পষ্ট করে বলে দেয়া হতো। হযরত মূসা সম্পর্কে কুরআন মজীদে বলা হয়েছে তিনি আল্লাহ তা'আলাকে দেখার প্রার্থনা করেছিলেন। কিন্তু তাঁকে জবাব দেয়া হয়েছিল

لن ترانى "তুমি আমাকে দেখতে পারবে না" (আল–আ'রাফ–১৪৩)। সুতরাং একথা স্পষ্ট যে, হযরত মূসাকে যে মর্যাদা দেয়া হয়নি তা যদি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেয়া হতো তাহলে তা এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে, বিষয়টি স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হতো। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি কুরআন মজীদে কোথাও বলা হয়নি, নবী (সা) তাঁর রবকে দেখেছিলেন। পক্ষান্তরে মি'রাজের ঘটনা বর্ণনা প্রসংগে সূরা বনী ইসরাঈলেও বলা হয়েছে, আমি আমার বান্দাকে নিয়ে গিয়েছিলাম এজন্য যে, তাকে আমার নিদর্শনাদী দেখাবো" (لِنُرِيَهُ مِنْ اٰيٰتِنَا) আর 'সিদরাতুল মুনতাহায়' যাওয়া প্রসঙ্গে এখানে বলা হয়েছে যে, তিনি তাঁর রবের বড় বড় নিদর্শন দেখেছেন,

(لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى)

এসব কারণে বাহ্যত এ বিতর্কের কোন প্রয়োজনই ছিল না যে, এ দু'টি ক্ষেত্রে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছিলেন, না জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে দেখেছিলেন? কিন্তু যে কারণে এ বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে তা হচ্ছে, এ বিষয়ে বর্ণিত হাদীসসমূহে মতানৈক্য দেখা যায়। এ বিষয়ে বিভিন্ন সাহাবা কিরাম কর্তৃক বর্ণিত হাদীসসমূহ আমরা নিচে এক এক করে বর্ণনা করলাম।

এক ঃ হযরত আয়েশার (রা) বর্ণিত হাদীসসমূহ ঃ

হাদীস গ্রন্থ বুখারীর কিতাবুত তাফসীরে হযরত মাসরূক থেকে বর্ণিত হয়েছে, আমি হযরত আয়েশাকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম; "আম্মাজান, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি আল্লাহকে দেখেছিলেন?" তিনি জবাব দিলেন। "তোমার একথা শুনে আমার গায়ের পশম শিউরে উঠেছে। তুমি কি করে ভুলে গেলে যে, তিনটি বিষয় এমন যা কেউ দাবী করলে মিথ্যা দাবী করা হবে।" (তার মধ্যে প্রথম কথাটি হযরত আয়েশা (রা) যা বললেন, তা হচ্ছে) "কেউ যদি তোমাকে বলে যে, হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহকে দেখেছিলেন, তাহলে সে মিথ্যা বলে।" তারপর হযরত আয়েশা (রা) এ আয়াতগুলো পাঠ করলেন। لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ (দৃষ্টিসমূহ তাঁকে দেখতে সক্ষম নয়)

مَا كَانَ لِبَشَرٍ اَنْ يُّكَلِّمَهُ اللّٰهُ اِلَّا وَحْيًا اَوْ مِنْ وَّرَاۤئِ حِجَابٍ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْحِىَ بِاِذْنِهٖ مَا يَشَاۤءُ –

"কোন মানুষেরই এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে সরাসরি কথা বলবেন। তবে হয় অহী হিসেবে বা পর্দার আড়াল থেকে কিংবা তিনি কোন ফেরেশতা পাঠাবেন এবং সে তাঁর ইচ্ছা মাফিক তার প্রতি অহী নাযিল করবে।" এরপর তিনি বললেনঃ "তবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে দু'বার তাঁর আসল আকৃতিতে দেখেছেন।"

এ হাদীসের একটি অংশ বুখারীর কিতাবুত তাওহীদের ৪র্থ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া বাদ্উল খালক্ অধ্যায়ে ইমাম বুখারী মাসরূক বর্ণিত যে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন তাতে মাসরূক (রা) বর্ণনা করেছেন। হযরত আয়েশার একথা শুনে আমি বললাম তাহলে

আল্লাহ তা'আলার একথার কি অর্থ হবে? ثُمَّ دَنَى فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى؟ তিনি বললেন এর দ্বারা জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে বুঝানো হয়েছে। তিনি সব সময় মানুষের রূপ ধরে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসতেন। কিন্তু ঐ সময় তিনি তাঁর আসল আকৃতিতে তাঁর কাছে এসেছিলেন এবং তাঁর শরীরে গোটা দিগন্ত আড়াল হয়ে গিয়েছিল।

মুসলিম কিতাবুল ঈমানের باب فى ذكر سدرة المنتهى এ হযরত আয়েশার (রা) সাথে মাসরূকের এ কথোপকথন অধিক বিস্তারিত রূপে উদ্ধৃত হয়েছে। তার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছেঃ হযরত আয়েশা (রা) বললেন ঃ যে ব্যক্তি দাবী করে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রবকে দেখেছেন সে আল্লাহ তা'আলার প্রতি অতি বড় অপবাদ আরোপ করে। "মাসরূক বলেন ঃ আমি হেলান দিয়ে বসেছিলাম। একথা শুনে আমি উঠে বসলাম এবং বললাম; উম্মুল মু'মিনীন তাড়াহুড়ো করবেন না। আল্লাহ তা'আলা কি বলেন নি وَلَقَدْ رَاٰهُ بِالْاُفُقِ الْمُبِيْنِ এবং وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى ? জবাবে হযরত আয়েশা (রা) বললেন ঃ এ উম্মতের মধ্যে আমিই সর্ব প্রথম এ ব্যাপারে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেছিলেন ঃ

انما هو جبريل عليه السلام ، لم اره على صورته التى خلق عليها غير هاتين المرتين - رايته منهبطا من السماء سادا عظم خلقه ما بين السماء والارض -

তিনি তো ছিলেন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে আকৃতি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন সে আসল আকৃতিতে আমি তাঁকে এ দু'বার ছাড়া আর কখনো দেখিনি। দু'বারই আমি তাঁকে আসমান থেকে নেমে আসতে দেখেছি। সে সময় তাঁর বিশাল সত্তা পৃথিবী ও আসমানের মধ্যবর্তী সমগ্র শূন্যলোক ছেয়ে ফেলেছিলো।"

মাসরূক বর্ণিত এ হাদীস ইবনে মারদুইয়া যে ভাষায় বর্ণনা করেছেন তা হচ্ছে ঃ হযরত আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ আমিই সর্ব প্রথম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ঃ আপনি কি আপনার রবকে দেখেছিলেন? জবাবে নবী (সা) বললেন, না। "আমি তো জিবরাঈলকে আসমান থেকে নেমে আসতে দেখেছিলাম।"

দুই ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণিত হাদীসসমূহ ঃ বুখারী কিতাবুত তাফসীর, মুসলিম কিতাবুল ঈমান এবং তিরমিযী আবওয়াবুত তাফসীরে যির ইবনে হুবাইশ থেকে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى আয়াতটির তাফসীর প্রসঙ্গে বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে এমন আকৃতিতে দেখেছেন যে, তাঁর ছয়শত ডানা ছিল।

মুসলিমের অন্যান্য রেওয়ায়াতে مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَاٰى এবং لَقَدْ رَاٰى مِنْ اٰيٰتِ رَبِّهِ الْكُبْرٰى আয়াতেরও এ একই তাফসীর আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে যির ইবনে হুবাইশ বর্ণনা করেছেন ঃ

মুসনাদে আহমদে আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের এ তাফসীর যির ইবনে হুবাইশ ছাড়া আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ এবং আবু ওয়ায়েলের মাধ্যমেও বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়াও মুসনাদে আহমদে যির ইবনে হুবাইশের আরো দু'টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যাতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) ولقد راه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى আয়াতের তাফসীর বর্ণনা প্রসংগে বলেছেন :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت جبريل عند سدرة المنتهى عليه ستمائة جناح

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "আমি জিবরাঈলকে সিদরাতুল মুনতাহার কাছে দেখেছি। সে সময় তাঁর ছয়শত ডানা ছিল।"

এ একই বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস শাকীক ইবনে সালামা থেকে ইমাম আহমদও বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসে তিনি বলেছেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের (রা) মুখ থেকে শুনেছি যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে বলেছিলেনঃ আমি জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে এ আকৃতিতে "সিদরাতুল মুনতাহায়" দেখেছিলাম।

তিনঃ আতা ইবনে আবী রাবাহ হযরত আবু হুরাইরাকে (রা) لَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى অর্থ জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাব দিয়েছিলেন : راى جبريل عليه السلام নবী (সা) জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে দেখেছিলেন (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান)।

চার : ইমাম মুসলিম কিতাবুল ঈমানে হযরত আবু যার গিফারীর মাধ্যমে আবদুল্লাহ ইবনে শাকীক বর্ণিত দু'টি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। এক রেওয়ায়াতে তিনি বলেছেনঃ আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি আপনার রবকে দেখেছিলেন? জবাবে নবী (সা) বললেন : نُورٌ اَنّٰى اَرَاهُ । অপর রেওয়ায়াতে বলেছেন : তিনি আমার এ প্রশ্নের জবাব দিয়েছিলেন : رَاَيْتُ نُوْرًا । ইবনুল কাইয়েম زاد المعاد গ্রন্থে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রথম উক্তির অর্থ বর্ণনা করে বলেছেন আমার ও আল্লাহকে দেখার মধ্যে প্রতিবন্ধক ছিল নূর। তিনি দ্বিতীয় উক্তির অর্থ বর্ণনা করেছেন এই যে, আমি আমার রবকে দেখিনি, বরং নূর দেখেছি।"

নাসায়ী ও ইবনে আবী হাতেম নিম্নোক্ত ভাষায় হযরত আবু যারের (রা) বক্তব্য উদ্ধৃত করেছেন। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অন্তর দিয়ে তাঁর রবকে দেখেছেন, চোখ দিয়ে দেখেন নি।"

পাঁচ : ইমাম মুসলিম কিতাবুল ঈমানে হযরত আবু মুসা আশ'আরী (রা) থেকে একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। উক্ত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : ما انتهى اليه بصر من خلقه "আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টির মধ্য থেকে কারো চোখই আল্লাহ তা'আলা পর্যন্ত পৌঁছেনি।"

ছয় ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বর্ণিত হাদীসসমূহ ঃ

মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসকে مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى – وَلَقَدْ رَاٰهُ نَزْلَةً اُخْرٰى আয়াত দু'টির অর্থ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রবকে দু'বার অন্তর দিয়ে দেখেছেন। মুসনাদে আহমদেও এ হাদীসটি আছে।

আতা ইবনে আবী রাবাহ্‌র বরাত দিয়ে ইবনে মারদুইয়াহ্ ইবনে আব্বাসের উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলাকে চোখ দিয়ে নয়, অন্তর দিয়ে দেখেছিলেন।

নাসায়ীতে ইকরিমা থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনে আব্বাস বলেছেন ঃ

اتعجبون ان تكون الخلة لابراهيم والكلام لموسى والروية لمحمد؟

"আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন, মূসা আলাইহিস সালামের সাথে কথা বলে তাঁকে সম্মানিত করেছেন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর দর্শনলাভের মর্যাদা দিয়েছেন" এতে কি তোমরা বিস্ময়বোধ করছো ? হাকেমও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং একে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন।

তিরমিযীতে শা'বী থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইবনে আব্বাস এক মজলিসে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর সাক্ষাতলাভ ও কথোপকথনকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও মূসা আলাইহিস সালামের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছিলেন। তিনি মূসা আলাইহিস সালামের সাথে দু'বার কথা বলেছেন এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে দু'বার দেখেছেন।" ইবনে আব্বাসের এ কথা শুনে মাসরূক হযরত আয়েশার (রা) কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করেছিলেন ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি তাঁর রবকে দেখেছিলেন? "তিনি বললেন ঃ তুমি এমন কথা বলেছো যা শুনে আমার পশম শিউরে উঠেছে।" এর পর হযরত আয়েশা ও মাসরূকের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছে আমরা তা উপরে হযরত আয়েশার (রা) বর্ণিত হাদীসসমূহের মধ্যে উদ্ধৃত করেছি।

তিরমিযীতেই অন্য যেসব হাদীস ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে তার একটিতে তিনি বলেছেন, নবী (সা) আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছিলেন। দ্বিতীয় একটি হাদীসে বলেছেন; দু'বার দেখেছিলেন এবং তৃতীয় আরেকটি হাদীসে বলেছেন, তিনি অন্তর দিয়ে আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছিলেন।"

মুসনাদে আহমাদে ইবনে আব্বাস বর্ণিত একটি হাদীসে আছে ঃ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت ربى تبارك وتعالى "আমি আমার মহাকল্যাণময় ও মর্যাদাবান রবকে দেখেছি।" আরেকটি হাদীসে তিনি বলেন ঃ

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتانى ربى الليلة فى احسن صورة ، احسبه يعنى فى النوم –

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আমার রব আজ রাতে অতীব সুন্দর আকৃতিতে আমার কাছে এসেছিলেন। আমার মনে হয় নবীর (সা) এ কথার অর্থ তিনি স্বপ্নে আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছিলেন।"

তাবারানী ও ইবনে মারদুইয়াহ্‌ ইবনে আব্বাস বর্ণিত একটি হাদীসে এও উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'বার তাঁর রবকে দেখেছেন। একবার দেখেছেন চোখে আরেকবার দেখেছেন অন্তর দিয়ে।

সাত ঃ মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল-কুরাযী বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে কেউ কেউ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ আপনি কি আপনার রবকে দেখেছেন? নবী (সা) জবাব দিলেন ঃ আমি তাঁকে দু'বার অন্তর দিয়ে দেখেছি (ইবনে আবী হাতেম)। এ বর্ণনাটিকে ইবনে জারীর যেরূপ ভাষায় উদ্ধৃত করেছেন তা হচ্ছে, নবী (সা) বললেন ঃ "আমি তাঁকে চোখ দিয়ে অন্তর দিয়ে দু'বার দেখেছি।"

আট ঃ মি'রাজের ঘটনা প্রসংগে শারীক ইবনে আবদুল্লাহর বরাত দিয়ে ইমাম বুখারী কিতাবুত তাওহীদে হযরত আনাস ইবনে মালেক বর্ণিত যে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন তাতে এ কথাগুলো আছে ঃ

حتى جاء سدرة المنتهى ودنا الجبار رب العزة فتدلى حتى كان منه قاب قوسين او ادنى فاوحى الله فيما اوحى اليه خمسين صلوة -

"তিনি যখন সিদরাতুল মুনতাহায় পৌঁছলেন তখন মহাপরাক্রান্ত ও মহিমান্বিত আল্লাহ তাঁর নিকটবর্তী হলেন এবং তার উপর দিকে শূন্যে অবস্থান করলেন। এমন কি নবী (সা) ও তাঁর মধ্যে মুখোমুখি দু'টি ধনুকের মধ্যকার সমান বা তার চেয়েও কম ব্যবধান রইলো। অতপর আল্লাহ তা'আলা তাঁর কাছে যেসব বিষয়ে অহী করলেন তার মধ্যে পঞ্চাশ ওয়াক্ত নামাযের নির্দেশও ছিল।"

কিন্তু এ হাদীসের সনদ ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে ইমাম খাত্তাবী, হাফেজ ইবনে হাজার, ইবনে হাযম এবং الجمع بين الصحيحين প্রণেতা হাফেয আবদুল হক যেসব আপত্তি উথাপন করেছেন তা ছাড়াও সবচেয়ে বড় আপত্তি হচ্ছে এটি স্পষ্টরূপে কুরআনের পরিপন্থী। কারণ, কুরআন মজীদ দু'টি ভিন্ন ভিন্ন সাক্ষাতের কথা উল্লেখ করে। তার মধ্যে প্রথমটি নবুওয়াতের প্রাথমিক যুগে একটি উঁচু দিগন্তে অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং সেখানে دَنَا فَتَدَلّٰى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰى বিষয়ক ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছিল। আর দ্বিতীয়টি সিদরাতুল মুনতাহার সন্নিকটে সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু ওপরে বর্ণিত এ রেওয়ায়াতটি দু'টি সাক্ষাতের ঘটনাকে একসাথে মিলিয়ে জগাখিচুড়ি করে একই সাক্ষাত বানিয়ে ফেলেছে। অতএব কুরআন মজীদের পরিপন্থী হওয়ার কারণে কোন ক্রমেই তা গ্রহণ করা যেতে পারে না।

এরপর ওপরে বর্ণিত হাদীসগুলোর প্রসংগে আসা যাক। ও গুলোর মধ্যে আবার হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) এবং হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসগুলোই

অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তাঁরা উভয়েই ঐকমত্য সহকারে খোদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে একথা বর্ণনা করেছেন যে, উভয় ক্ষেত্রেই তিনি আল্লাহ তা'আলাকে নয়, জিবরাঈল আলাইহিস সালামকে দেখেছিলেন। তাছাড়া এসব হাদীস কুরআন মজীদের বক্তব্য ও ইংগিতের সাথেও সম্পূর্ণরূপে সংগতিপূর্ণ। এছাড়া হযরত আবু যার (রা) এবং হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা) নবীর (সা) যেসব উক্তি উদ্ধৃত করেছেন তা থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে হাদীস গ্রন্থসমূহে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তাতে গুরুতর অনৈক্য পরিলক্ষিত হয়। কোন হাদীসে উভয় সাক্ষাতকেই চাক্ষুষ সাক্ষাত বলা হয়েছে, কোনটাতে উভয় সাক্ষাতকেই অন্তরের সাক্ষাত বলা হয়েছে, কোনটাতে একটি সাক্ষাতকে চাক্ষুষ অপরটাকে অন্তরের বলা হয়েছে, আবার কোনটাতে চাক্ষুষ দর্শনকে পরিষ্কার ভাষায় অস্বীকার করা হয়েছে। এসব বর্ণনার একটিও এমন নয় যাতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে। আর যেখানে তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিজের কোন কথা বা উক্তি উদ্ধৃত করেছেন সেখানে প্রথমত কুরআন মজীদে বর্ণিত এ দু'টি সাক্ষাতলাভের কোনটিরও নামের উল্লেখ নেই। তাছাড়া তাদের একটি রেওয়ায়াতের ব্যাখ্যা অন্য রেওয়ায়াত থেকে যা জানা যায় তা হচ্ছে নবী (সা) কোন সময়ই জাগ্রত অবস্থায় আল্লাহ তা'আলাকে দেখেননি, স্বপ্নে আল্লাহ তা'আলাকে দেখেছিলেন। তাই প্রকৃতপক্ষে এসব আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের সাথে সম্পর্কিত রেওয়ায়াতসমূহের ওপর নির্ভর করা যেতে পারে না। অনুরূপভাবে মুহাম্মাদ ইবনে কা'ব আল-কুরাযীর বর্ণনাসমূহে যদিও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি উদ্ধৃত হয়েছে কিন্তু যেসব সাহাবায়ে কিরাম নবী (সা) থেকে একথা শুনেছেন তাতে তাদের নাম বলা হয়নি। তার একটিতে আবার বলা হয়েছে যে, নবী (সা) চাক্ষুষ দেখার বিষয় সরাসরি অস্বীকার করেছেন।

১৫. অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের যে শিক্ষা দিচ্ছেন তোমরা তো তাকে গোমরাহী ও কুপথগামিতা বলে আখ্যায়িত করছো। অথচ এ জ্ঞান তাঁকে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে দেয়া হচ্ছে। আর আল্লাহ তা'আলা তাঁকে চাক্ষুষভাবে এমন সব সত্য ও বাস্তবতা দেখিয়েছেন যার সাক্ষ তিনি তোমাদের সামনে পেশ করছেন। এখন তেমরা নিজেরাই একটু ভেবে দেখ, যে আকীদা-বিশ্বাস মেনে চলার জন্য তোমরা গোঁ ধরে আছো তা কত অযৌক্তিক। অন্য দিকে যে ব্যক্তি তোমাদের সোজা পথ দেখিয়ে দিচ্ছেন তার বিরোধীতা করে তোমরা কার ক্ষতি করছো? এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে তিনজন দেবীর কথা উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে যাদেরকে মক্কা, তায়েফ, মদীনা এবং হিজাজের আশে পাশের লোক জন বেশী বেশী পূজা করতো। তাদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছে, কখনো কি তোমরা বুদ্ধি বিবেক খাটিয়ে চিন্তা করে দেখেছো, যমীন ও আসমানের প্রভূত্বের ক্ষেত্রে এদের সামান্যতম দখল বা কর্তৃত্বও থাকতে পারে কি? না বিশ্ব-জাহানের প্রভুর সাথে সত্যিই তাদের কোন সম্পর্ক হতে পারে?

লাতের আস্তানা ছিল তায়েফে। বনী সাকীফ গোত্র তার এত ভক্ত ছিল যে, আবরাহা যে সময়, হস্তী বাহিনী নিয়ে কা'বা ঘর ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে মক্কার ওপর আক্রমণ করতে

যাচ্ছিল তখন তারা শুধু তাদের এ উপাস্যের আস্তানা রক্ষা করার জন্য সে অত্যাচারীকে মক্কার রাস্তা দেখানোর জন্য পথ প্রদর্শক সরবরাহ করেছিল যাতে সে লাতের কোন ক্ষতি না করে। অথচ কা'বা যে আল্লাহর ঘর গোটা আরববাসীর মত সাকীফ গোত্রও একথা বিশ্বাস করতো। লাত শব্দের অর্থ নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। ইবনে জারীর তাবারীর জ্ঞানগর্ভ বিশ্লেষণ হচ্ছে এ শব্দটি আল্লাহ শব্দের স্ত্রীলিংগ। মূল শব্দটি ছিল اللهة । এটিকেই পরিবর্তন করে اللات করা হয়েছে। যামাখশারীর মতে— لوى يلوى থেকে শব্দটির উৎপত্তি। এর অর্থ ঘুরা বা কারো প্রতি ঝুঁকে পড়া। মুশরিকরা যেহেতু ইবাদাতের জন্য তার প্রতি মনযোগী হতো, তার সামনে ঝুঁকতো এবং তার তাওয়াফ করতো তাই তাকে 'লাত' আখ্যা দেয়া শুরু হলো। ইবনে আব্বাস تا বর্ণটিতে "তাশদীদ" প্রয়োগ করে لاتّ পড়তেন এবং لت يلت থেকে এর উৎপত্তি হয়েছে বলতেন। এর অর্থ মন্থন করা বা লেপন করা। ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদ বর্ণনা করেছেন যে, মূলত সে ছিল একজন মানুষ, যে তায়েফের সন্নিকটে এক কঙ্করময় ভূমিতে বাস করতো এবং হজ্জের উদ্দেশ্যে গমনকারীদের ছাতু ও অন্যান্য খাদ্য খাওয়াতো। সে মারা গেলে লোকেরা ঐ কঙ্করময় ভূমিতে তার নামে একটা আস্তানা গড়ে তোলে এবং তার উপাসনা করতে শুরু করে। কিন্তু লাতের এ ব্যাখ্যা ইবনে আব্বাস ও মুজাহিদের মত সম্মানিত ব্যক্তিদের থেকে বর্ণিত হওয়া সত্ত্বেও দু'টি কারণে গ্রহণযোগ্য নয়। একটি কারণ হলো একে لات (লাত) বলা হয়েছে لاتّ ("লাত্তা") বলা হয়নি। অপর কারণটি হলো কুরআন মজীদ তিনজনকেই দেবী বলে উল্লেখ করেছে কিন্তু বর্ণিত হাদীস অনুসারে সে পুরুষ ছিল নারী নয়।

عزى (উয্‌যা) শব্দটির উৎপত্তি عزت শব্দ থেকে। এর অর্থ সম্মানিতা। এটা ছিল কুরাইশদের বিশেষ দেবী। এর আস্তানা ছিল মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী "নাখলা" উপত্যকার "হুরাদ" নামক স্থানে (নাখলার অবস্থান জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল–আহকাফ, টীকা–৩৩) বনী হাশেমের মিত্র বনী শায়বান গোত্রের লোক এর প্রতিবেশী ছিল। কুরাইশ এবং অন্যান্য গোত্রের লোকজন এর যিয়ারতের জন্য আসতো, এর উদ্দেশ্যে মানত করতো এবং বলি দান করতো। কা'বার মত এ স্থানটিতেও কুরবানী বা বলির জন্তু নিয়ে যাওয়া হতো এবং এটিকে সমস্ত মূর্তির চেয়ে অধিক সম্মান দেয়া হতো। ইবনে হিশাম বর্ণনা করেছেন, আবু উহায়হার মৃত্যু ঘনিয়ে আসলে আবু লাহাব তাকে রোগ শয্যায় দেখতে গিয়ে দেখলো সে কাঁদছে। আবু লাহাব জিজ্ঞেস করলো ঃ আবু উহায়হা, তুমি কাঁদছো কেন? তুমি কি মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে পড়েছো? মৃত্যু তো সবারই হবে। সে বললো ঃ আল্লাহর শপথ, আমি মৃত্যুর ভয়ে ভীত হয়ে কাঁদছি না। আমার মৃত্যুর পর উয্‌যার পূজার কি উপায় হবে সে দুশ্চিন্তা আমাকে নিশেষ করে দিচ্ছে। আবু লাহাব বললো ঃ তোমার জীবদ্দশায়ও তোমার কারণে উয্‌যার পূজা করা হতো না আর তোমার মৃত্যুর পরে তাকে পরিত্যাগ করাও হবে না। আবু উহায়হা বললো ঃ এখন আমি নিশ্চিন্ত হলাম যে, আমার মৃত্যুর পরে কেউ অবশ্যই আমার স্থান পূরণ করবে।

মানাতের আস্তানা ছিল মক্কা ও মদীনার মাঝে লোহিত সাগরের তীরবর্তী কুদাইদ নামক স্থানে। বিশেষ করে খুযা'আ, আওস এবং খাযরাজ গোত্রের লোকেরা এর খুব ভক্ত ছিল। তার হজ্জ ও তাওয়াফ করা হতো এবং তার উদ্দেশ্যে মানতের বলি দেয়া হতো। হজ্জের মওসুমে হাজীরা বায়তুল্লাহর তাওয়াফ এবং আরাফাতে ও মিনায় অবস্থানের পর সেখান থেকে মানাতের যিয়ারত তথা দর্শনলাভের জন্য লাব্বায়কা লাব্বায়কা ধ্বনি দিতে শুরু করতো। যারা এ দ্বিতীয় হজ্জের নিয়ত করতো তারা সাফা এবং মারওয়ার মাঝে সাঈ করতো না।

১৬. অর্থাৎ এসব দেবীদেরকে তোমরা আল্লাহর কন্যা সন্তান বলে ধরে নিয়েছো। এ অর্থহীন আকীদা–বিশ্বাস গড়ে নেয়ার সময় তোমরা আদৌ এ চিন্তা করনি যে, মেয়ে সন্তান জন্মগ্রহণকে তোমরা নিজেদের জন্য অপমানকর ও লজ্জাকর মনে করে থাকো। তোমরা চাও যেন তোমরা পুত্র সন্তান লাভ করো। কিন্তু যখন আল্লাহর সন্তান আছে বলে ধরে নাও, তখন তাঁর জন্য কন্যা সন্তান বরাদ্দ করো।

১৭. অর্থাৎ তোমরা যাদের দেবী ও দেবতা বলে থাকো তারা দেবীও নয় দেবতাও নয়। তাদের মধ্যে খোদায়ীর কোন বৈশিষ্টও যেমন দেখা যায় না, তেমনি প্রভুত্বের ক্ষমতা ও এখতিয়ারের সামান্যতম অংশও তাদের মধ্যে নেই। তোমরা নিজেরাই তাদেরকে আল্লাহর সন্তান, উপাস্য এবং প্রভুত্বের অংশীদার বানিয়ে নিয়েছো। নিজেদের মনগড়া এসব বিষয়ের সমর্থনে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা কোন প্রমাণ তোমরা পেশ করতে সক্ষম নও।

১৮. অন্য কথায় তাদের গোমরাহীর মৌলিক কারণ দু'টি ঃ এক, তারা কোন জিনিসকে নিজেদের আকীদা–বিশ্বাস ও দীন বানিয়ে নেয়ার জন্য প্রকৃত বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞানের কোন প্রয়োজন অনুভব করে না, বরং অনুমান ও ধারণার ওপর ভিত্তি করে একটি জিনিস মেনে নেয় এবং পরে এমনভাবে তা বিশ্বাস করে নেয়, যেন সেটিই সত্য ও বাস্তব। দুই, প্রকৃতপক্ষে তারা নিজেদের নফসের নানা রকম কামনা বাসনা পূরণ করার জন্যই এ নীতি ও আচরণ গ্রহণ করে থাকে। তাদের মন চায় তাদের এমন কোন উপাস্য থাকুক যে দুনিয়ায় তাদের আশা–আকাংখা পূরণ করবে এবং আখেরাত যদি সংঘটিত হয়–ই, তাহলে সেখানে তাদেরকে ক্ষমা করিয়ে দেয়ার দায়িত্ব গ্রহণ করবে। কিন্তু সে হালাল হারামের কোন বাধ্য বাধকতা আরোপ করবে না এবং কোন রূপ নৈতিক বিধি–বন্ধনেও আবদ্ধ করবে না। একারণেই তারা নবী–রসূলদের আনীত নিয়ম পদ্ধতি অনুসারে এক আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের জন্য প্রস্তুত হতো না। এবং নিজেদের গড়া এসব দেবদেবীর দাসত্ব করাই তাদের মনঃপুত ছিল।

১৯. অর্থাৎ প্রত্যেক যুগেই আল্লাহর পক্ষ থেকে নবী–রসূলগণ এসব পথহারা মানুষকে প্রকৃত সত্য সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তারপর এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে সত্যিকার অর্থে বিশ্ব–জাহানের প্রভুত্ব কার তা জানিয়ে দিয়েছেন।

২০. এ আয়াতের দ্বিতীয় অর্থ এও হতে পারে যে, যাকে ইচ্ছা তাকেই উপাস্য বানিয়ে নেয়ার অধিকার কি মানুষের আছে? এর তৃতীয় একটি অর্থ এও গ্রহণ করা যেতে পারে যে, ঐসব উপাস্যের কাছে মানুষ তার কামনা–বাসনা ও আকাংখা পূরণের যে আশা করে তা কি কখনো পূরণ হওয়া সম্ভব?

وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِى السَّمٰوٰتِ لَا تُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْـًٔا اِلَّا مِنْۢ بَعْدِ اَنْ يَّاْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيَرْضٰى ﴿٢٦﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ لَيُسَمُّوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ تَسْمِيَةَ الْاُنْثٰى ﴿٢٧﴾ وَمَا لَهُمْ بِهٖ مِنْ عِلْمٍ ؕ اِنْ يَّتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ ۚ وَاِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِىْ مِنَ الْحَقِّ شَيْـًٔا ﴿٢٨﴾ فَاَعْرِضْ عَنْ مَّنْ تَوَلّٰى ۙ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ اِلَّا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا ﴿٢٩﴾

২ রুকূ'

আসমানে তো কত ফেরেশতা আছে যাদের সুপারিশও কোন কাজে আসতে পারে না যতক্ষণ না আল্লাহ নিজ ইচ্ছায় যাকে খুশী তার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দান করেন।[২১] কিন্তু যারা আখেরাত মানে না তারা ফেরেশতাদেরকে দেবীদের নামে নামকরণ করে।[২২] অথচ এ ব্যাপারে তাদের কোন জ্ঞানই নেই। তারা কেবলই বদ্ধমূল ধারণার অনুসরণ করছে।[২৩] আর ধারণা কখনো জ্ঞানের প্রয়োজন পূরণে কোন কাজে আসতে পারে না।

সুতরাং হে নবী, যে আমার উপদেশ বাণী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়[২৪] এবং দুনিয়ার জীবন ছাড়া যার আর কোন কাম্য নেই তাকে তার আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও।[২৫]

২১. অর্থাৎ তোমাদের এসব মনগড়া উপাস্যদের সুপারিশ উপকারে আসা তো দূরের কথা, সমস্ত ফেরেশতা মিলেও যদি কারো জন্য সুপারিশ করে তথাপিও তা তার কাজে আসবে না। প্রভুত্বের এখতিয়ারসমূহ সবই পুরোপুরি আল্লাহর হাতে। যদি আল্লাহ তা'আলা কারো পক্ষে সুপারিশ করতে কাউকে অনুমতি না দেন এবং কারো পক্ষে সুপারিশ শুনতে সম্মত না হন তাহলে ফেরেশতাও তাঁর কাছে কারো জন্য সুপারিশ করার সাহস দেখাতে পারে না।

২২. অর্থাৎ তাদের একটি নির্বুদ্ধিতা হচ্ছে, তারা এখতিয়ার ও ক্ষমতাহীন ফেরেশতাদের উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে যারা আল্লাহ তা'আলার কাছে সুপারিশ পর্যন্ত করার সামর্থ ও সাহস রাখে না। তাছাড়া আরো নির্বুদ্ধিতা হচ্ছে এই যে, তারা তাদেরকে নারী বলে মনে করে এবং আল্লাহর কন্যা বলে আখ্যায়িত করে। এসব অজ্ঞতায় নিমজ্জিত হওয়ার মৌলিক কারণ হলো, তারা আখেরাতকে বিশ্বাস করে না। তারা যদি আখেরাতে বিশ্বাস করতো তাহলে এ ধরনের দায়িত্বহীন কথাবার্তা বলতে পারতো না। আখেরাতের অস্বীকৃতি তাদেরকে পরিণাম সম্বন্ধে নিরুদ্বিগ্ন করে দিয়েছে। তারা মনে করে, আল্লাহকে

ذٰلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهٖ ۙ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدٰى ﴿٣٠﴾ وَلِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۙ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنٰى ﴿٣١﴾ اَلَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبٰٓئِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهٰتِكُمْ ۚ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ۚ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ﴿٣٢﴾

এদের[২৬] জ্ঞানের দৌড় এতটুকুই।[২৭] তোমার রবই অধিক জানেন—কে তাঁর পথ ছেড়ে বিপথগামী হয়েছে আর কে সঠিক পথে আছে। যমীন ও আসমানের প্রতিটি জিনিসের মালিক একমাত্র আল্লাহ[২৮]—যাতে[২৯] আল্লাহ অন্যায়কারীদেরকে তাদের কাজের প্রতিদান দেন এবং যারা ভাল নীতি ও আচরণ গ্রহণ করেছে তাদের উত্তম প্রতিদান দিয়ে পুরস্কৃত করেন। যারা বড় বড় গোনাহ[৩০] এবং প্রকাশ্য ও সর্বজনবিদিত অশ্লীল কাজ[৩১] থেকে বিরত থাকে—তবে ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়া ভিন্ন কথা[৩২]—নিশ্চয়ই তোমার রবের ক্ষমাশীলতা অনেক ব্যাপক।[৩৩] যখন তিনি মাটি থেকে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং যখন তোমরা মাতৃগর্ভে ভ্রূণ আকারে ছিলে তখন থেকে তিনি তোমাদের জানেন। অতএব তোমরা নিজেদের পবিত্রতার দাবী করো না। সত্যিকার মুত্তাকী কে তা তিনিই ভাল জানেন।

মানা বা না মানা কিংবা হাজার জন খোদাকে মানায় কোনই পার্থক্য নেই। কারণ তারা এসব আকীদা-বিশ্বাসের কোনটিরই কোন ভাল বা মন্দ পরিণাম দুনিয়ার বর্তমান জীবনে প্রতিফলিত হতে দেখে না। আল্লাহদ্রোহী মুশরিক কিংবা তাওহীদবাদী যাই হোক না কেন এখানে সবার ফসলই পাকতে এবং ধ্বংস হতে দেখা যায়। সবাই রোগাক্রান্ত হয় আবার সুস্থও হয়ে ওঠে। সব রকম ভাল ও মন্দ পরিস্থিতি সবার জন্যই আসে। তাই কোন ব্যক্তি কাউকে উপাস্য মানুক বা না মানুক কিংবা যত ও যেভাবে ইচ্ছা উপাস্য বানিয়ে নিক এটা তাদের কাছে কোন বড় গুরুত্বপূর্ণ বা সুবিবেচনা পাওয়ার মত বিষয় নয়। তাদের মতে হক এবং বাতিলের ফায়সালা যখন এ দুনিয়াতেই হতে হবে আর এ দুনিয়াতে প্রকাশিত ফলাফল দ্বারাই তা নিরূপিত হবে তখন একথা স্পষ্ট যে, এখানে প্রকাশিত ফলাফল কোন আকীদা-বিশ্বাসের ন্যায় ও সত্য হওয়ার চূড়ান্ত ফায়সালা যেমন করে না, তেমনি অন্যসব আকীদা-বিশ্বাসের বাতিল হওয়ার চূড়ান্ত ফায়সালাও দেয় না। কাজেই এরূপ

লোকদের পক্ষে একটি আকীদা–বিশ্বাস গ্রহণ করা এবং আরেকটিকে প্রত্যাখ্যান করা মনের খেয়ালীপনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

২৩. অর্থাৎ ফেরেশতারা যে স্ত্রীলোক এবং আল্লাহর কন্যা এ বিশ্বাসটি তারা জ্ঞান অর্জনের কোন একটি মাধ্যম ছাড়া জানতে পেরেছে বলে অবলম্বন করেনি। বরং নিজেদের অনুমান ও ধারণার ওপর ভিত্তি করে এ বিষয়টা স্থির করে নিয়েছে এবং এর ওপর ভিত্তি করেই এসব আস্তানা গড়ে নিয়েছে। তাদের কাছেই মনের কামনা বাসনা পূর্ণ করার জন্য প্রার্থনা করছে এবং নযর–নেওয়াজ পেশ করা হচ্ছে।

২৪. এখানে 'যিকর' শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ কুরআন হতে পারে কিংবা শুধু উপদেশবাণী হতে পারে এবং আয়াতের অর্থ এও হতে পারে যে, আল্লাহর কথা শুনতে একদম পছন্দ করে না।

২৫. অর্থাৎ তার পিছে লেগে থেকো না এবং তাকে বুঝানোর জন্য নিজের সময় নষ্ট করো না। কেননা এ প্রকৃতির লোক এমন কোন দাওয়াত বা আন্দোলনকে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হবে না যার ভিত্তি আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, যা দুনিয়ার বস্তুগত লাভের চেয়ে অনেক উচ্চতর উদ্দেশ্য ও মূল্যমানের দিকে আহবান জানায় এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী সাফল্য ও সৌভাগ্যই যার মূল লক্ষ। এ ধরনের বস্তুপূজারী এবং আল্লাহ বিমুখ মানুষের পেছনে নিজের শ্রম ব্যয় করার পরিবর্তে যারা আল্লাহর কথা শুনতে প্রস্তুত এবং দুনিয়া পূজার ব্যধিতে আক্রান্ত নয় তাদের দিকে মনযোগ দাও।

২৬. এটি পূর্বাপর প্রসংগহীন একটি বাক্য যা কথার ধারাবাহিকতা ছিন্ন করে আগের কথার ব্যাখ্যা হিসেবে পেশ করা হয়েছে।

২৭. অর্থাৎ এসব লোক দুনিয়া এবং দুনিয়াবী স্বার্থের উর্ধে আর কিছুই জানে না এবং কিছু চিন্তাও করতে পারে না। তাই তাদের পেছনে পরিশ্রম করা বৃথা।

২৮. অন্য কথায় কোন মানুষের পথভ্রষ্ট বা সুপথপ্রাপ্ত হওয়ার ফায়সালা যেমন এ পৃথিবীতে হবে না তেমনি এর ফায়সালা দুনিয়ার মানুষের মতামতের ওপর ছেড়ে দেয়াও হয়নি। এর ফায়সালা একমাত্র আল্লাহর হাতে। তিনিই যমীন ও আসমানের মালিক এবং দুনিয়ার মানুষ ভিন্ন ভিন্ন যেসব পথে চলছে তার কোন্‌টি হিদায়াতের পথ এবং কোন্‌টি গোমরাহীর পথ তা কেবল তিনিই জানেন। অতএব আরবের এসব মুশরিক এবং মক্কার কাফেররা যে তোমাকে বিপথগামী ও পথভ্রষ্ট বলে আখ্যায়িত করছে আর নিজেদের জাহেলিয়াতকে হিদায়াত বলে মনে করছে সে জন্য তুমি মোটেই পরোয়া করবে না। এরা যদি নিজেদের এ ভ্রান্ত ধারণার মধ্যে ডুবে থাকতে চায় তাহলে তাদের ডুবে থাকতে দাও। তাদের সাথে তর্ক–বিতর্ক করে সময় নষ্ট করা এবং মাথা ঘামানোর কোন প্রয়োজন নেই।

২৯. আগে থেকেই যে বক্তব্য চলছিলো এখান থেকে পুনরায় তার ধারাবাহিকতা শুরু হচ্ছে। সুতরাং মাঝখানের পূর্বাপর প্রসংগহীন কথাটা বাদ দিলে বাক্যের অর্থ দাঁড়ায় এরূপ ঃ "তাকে তার আপন অবস্থায় চলতে দাও। যাতে আল্লাহ অন্যায়কারীকে তার কাজের প্রতিফল দান করেন।"

৩০. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আন নিসা, টীকা ৫৩।

৩১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আন'আম, টীকা ১৩০, আন নাহল, টীকা ৮৯ ।

৩২. মূল শব্দ হচ্ছে اِلاَّ اللَّمَمَ । কোন জিনিসের অতি সামান্য পরিমাণ কিংবা নগণ্য প্রভাব অথবা শুধু নৈকট্য বা সামান্য দেরী থাকা বুঝাতে আরবী ভাষায় لمم শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যেমন বলা হয় اَلَمَّ بِالْمَكَانِ সে অমুক স্থানে সামান্য কিছু সময় মাত্র অবস্থান করেছে কিংবা সামান্য সময়ের জন্য গিয়েছে اَلَمَّ بِالطَّعَامِ সে সামান্য খাবার খেয়েছে। بـه لمم তার মস্তিষ্কে কিছুটা বিকৃতি আছে কিংবা তাতে কিছু উন্মাদনা ভাব আছে। কেউ যখন কোন কাজে লিপ্ত হওয়ার নিকটবর্তী হয় কিন্তু কাজটি তখনো করা হয়নি এমন অবস্থা বুঝাতে এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। ফাররা বলেন, আমি আরবদেরকে এভাবে বলতে শুনেছি ضربه مالمم القتل অমুক ব্যক্তি তাকে এত মেরেছে যে, কেবল হত্যা করা বাকি আছে। এবং اَلَمَّ يَفْعَلُ অমুক ব্যক্তি এ কাজ প্রায় করেই ফেলেছিলো। কবি বলেছেন ঃ الممت فحييت ثم قامت فودعت "সে মুহূর্তের জন্য আসলো, সালাম দিল, উঠলো এবং বিদায় হয়ে গেল"

এসব ব্যবহারের দিক লক্ষ করে তাফসীরকারদের মধ্যে কেউ কেউ এ আয়াতের لمم শব্দের অর্থ গ্রহণ করেছেন ছোট গোনাহ। কেউ কেউ এর অর্থ বলেছেন যে, ব্যক্তির কার্যত বড় গোনাহর নিকটবর্তী হওয়া সত্ত্বেও তাতে লিপ্ত না হওয়া। কেউ কেউ একে ক্ষণিকের জন্য গোনাহে লিপ্ত হয়ে পরে তা থেকে বিরত হওয়া অর্থে গ্রহণ করেছেন। কারো কারো মতে এর অর্থ হচ্ছে, ব্যক্তি গোনাহর কল্পনা, ইচ্ছা কিংবা সংকল্প করবে ঠিকই কিন্তু কার্যত কোন পদক্ষেপ নেবে না। এ বিষয়ে সাহাবা ও তাবেয়ীদের মতামত নিম্নরূপ ঃ

যায়েদ ইবনে আসলাম ও ইবনে যায়েদ বলেন ঃ এর অর্থ মানুষ ইসলাম গ্রহণের পূর্বে জাহেলী যুগে যেসব গোনাহ করেছে, কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তা পরিত্যাগ করেছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের (রা) একটি মতও তাই।

ইবনে আব্বাসের (রা) দ্বিতীয় মতটি হচ্ছে, ব্যক্তির কোন বড় গোনাহ বা অশ্লীল কাজে অল্প সময়ের জন্য কিংবা ভুলক্রমে কখনো লিপ্ত হয়ে পড়া এবং পরে তা পরিত্যাগ করা। হযরত আবু হুরাইরা (রা), হযরত আবদুল্লাহ (রা) ইবনে আমর ইবনে আস, মুজাহিদ (রা) হাসান বাসরী (র) এবং আবু সালেহর (র) মতও তাই।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), মাসরূক এবং শা'বী বলেন ঃ এর অর্থ কোন ব্যক্তির কোন বড় গোনাহের নিকটবর্তী হওয়া এবং তার প্রাথমিক পর্যায়সমূহ অতিক্রম করা কিন্তু চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়ে বিরত থাকা। যেমন ঃ কেউ চুরি করার উদ্দেশ্যে বের হলো কিন্তু চুরি করা থেকে বিরত থাকলো। কিংবা পরনারীর সাথে মেলামেশা করলো কিন্তু ব্যভিচার করতে অগ্রসর হলো না। নির্ভরযোগ্য বর্ণনা সূত্রে হযরত আবু হুরাইরা এবং হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকেও এ মতটি উদ্ধৃত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের, ইকরিমা, কাতাদা এবং দাহ্হাক বলেন ঃ এর অর্থ এমন ছোট ছোট গোনাহ যার জন্য দুনিয়াতে কোন শাস্তি নির্দিষ্ট করা হয়নি এবং আখেরাতেও আযাব দেয়ার কোন ভয় দেখানো হয়নি।

أَفَرَءَيْتَ الَّذِي تَوَلَّىٰ ﴿٣٣﴾ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ ﴿٣٤﴾ أَعِندَهُۥ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَىٰ ﴿٣٥﴾ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِمَا فِي صُحُفِ مُوسَىٰ ﴿٣٦﴾ وَإِبْرَٰهِيمَ الَّذِي وَفَّىٰ ﴿٣٧﴾ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ﴿٣٨﴾ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَٰنِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنَّ سَعْيَهُۥ سَوْفَ يُرَىٰ ﴿٤٠﴾ ثُمَّ يُجْزَىٰهُ الْجَزَآءَ الْأَوْفَىٰ ﴿٤١﴾

৩ রুকূ'

হে নবী, তুমি কি সেই ব্যক্তিকে দেখেছো যে আল্লাহর পথ থেকে ফিরে গিয়েছে এবং সামান্য মাত্র দিয়ে ক্ষান্ত হয়েছে?[৩৪] তার কাছে কি গায়েবের জ্ঞান আছে যে সে প্রকৃত ব্যাপারটা দেখতে পাচ্ছে?[৩৫] তার কাছে কি মূসার সহীফাসমূহের কোন খবর পৌছেনি? আর আনুগত্যের পরম পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে[৩৬] যে ইবরাহীম তার সহীফাসমূহের কথাও কি পৌছেনি?

একথা যে, "কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবে না।"[৩৭]

একথা যে, মানুষ যে চেষ্টা সাধনা করে তা ছাড়া তার আর কিছুই প্রাপ্য নেই।[৩৮]

একথা যে, "তার চেষ্টা–সাধনা অচিরেই মূল্যায়ণ করা হবে[৩৯] এবং তাকে তার পুরো প্রতিদান দেয়া হবে।"

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব বলেন ঃ এর অর্থ মনে গোনাহের চিন্তার উদ্রেক করা কিন্তু কার্যত তাতে লিপ্ত না হওয়া।

এগুলো হচ্ছে, সম্মানিত সাহাবা ও তাবেয়ীদের বিভিন্ন ব্যাখ্যা যা বিভিন্ন রেওয়ায়াতে উদ্ধৃত হয়েছে। পরবর্তী কালের তাফসীরকার, ইমাম ও ফিকাহবিদদের অধিকাংশই এ মত পোষণ করেন যে, এ আয়াত এবং সূরা নিসার ৩১ আয়াত সুস্পষ্টরূপে গোনাহকে সগীরা ও কবীরা এই দু'টি বড় ভাগে বিভক্ত করেছে। এ দু'টি আয়াত মানুষকে আশান্বিত করে যে, তারা যদি বড় বড় গোনাহ ও অশ্লিল কাজ থেকে বিরত থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাদের ছোট ছোট গোনাহ মাফ করে দেবেন। যদিও দু'য়েকজন বড় আলেম মত প্রকাশ করেছেন যে, কোন গোনাহই ছোট নয়। আল্লাহর অবাধ্যতা মাত্রই বড় গোনাহ। কিন্তু ইমাম গাযযালী (র) বলেছেন ঃ কবীরা ও সগীরা গোনাহের পার্থক্য এমন একটি বিষয় যা অস্বীকার করা যায় না। কারণ, যেসব উৎস থেকে শরীয়াতের হুকুম–আহকাম সম্পর্কিত জ্ঞান লাভ করা যায় তার সবগুলোতেই এর উল্লেখ আছে।

এখন প্রশ্ন হলো, সগীরা ও কবীরা গোনাহর মধ্যে পার্থক্য কি? এবং কি ধরনের গোনাহ সগীরা আর কি ধরনের গোনাহ কবীরা? এ ব্যাপারে কবীরা ও সগীরা গোনাহর যে সংজ্ঞায় আমরা পূর্ণরূপে নিশ্চিত ও পরিতৃপ্ত তা হচ্ছে, "যে গোনাহকে কিতাব ও

সুন্নাহর কোন সুস্পষ্ট উক্তিতে হারাম বলা হয়েছে অথবা যে গোনাহর জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূল দুনিয়াতে কোন শাস্তি নির্দিষ্ট করেছেন অথবা যে গোনাহের কারণে আখেরাতে আযাবের ভয় দেখিয়েছেন বা অভিশাপ দিয়েছেন অথবা তাতে লিপ্ত ব্যক্তির ওপর আযাব নাযিলের খবর দিয়েছেন" এ ধরনের সমস্ত গোনাহই কবীরা গোনাহ। এ প্রকৃতির গোনাহ ছাড়া শরীয়াতের দৃষ্টিতে আর যত রকমের অপছন্দনীয় কাজ আছে তার সবই সগীরা গোনাহর সংজ্ঞায় পড়ে। একইভাবে কেবলমাত্র গোনাহের আকাংখা পোষণ করা কিংবা ইচ্ছা করাও কবীরা গোনাহ নয়, সগীরা গোনাহ। এমন কি কোন বড় গোনাহর প্রাথমিক পর্যায়সমূহ অতিক্রম করাও ততক্ষণ পর্যন্ত কবীরা গোনাহ নয় যতক্ষণ না ব্যক্তি কার্যত তা করে বসবে। তবে সগীরা গোনাহও যখন ইসলামী বিধানকে হেয়প্রতিপন্ন করার উদ্দেশ্যে করা হয়, আল্লাহ তা'আলার মোকবিলায় অহংকারের মনোবৃত্তি নিয়ে করা হয় এবং যে শরীয়াত একে খারাপ কাজ বলে আখ্যায়িত করেছে তাকে আদৌ গুরুত্ব দেয়ার উপযুক্ত মনে করা না হয় তখন তা কবীরা গোনাহে রূপান্তরিত হয়।

৩৩. অর্থাৎ সগীরা গোনাহকারী ব্যক্তিকে মাফ করে দেয়ার কারণ এ নয় যে, সগীরা গোনাহ কোন গোনাহই নয়। বরং এর কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা তাঁর বান্দাহদের সাথে সংকীর্ণচেতার মত আচরণ এবং ছোট ছোট ব্যাপারে পাকড়াও করার নীতি গ্রহণ করেন না। বান্দা যদি নেকীর পথ অনুসরণ করে এবং বড় বড় গোনাহ ও অশ্লীল কাজ থেকে বিরত থাকে তাহলে ছোট ছোট ব্যাপারে তিনি তাকে পাকড়াও করবেন না। অশেষ রহমতের কারণে তাকে ক্ষমা করে দেবেন।

৩৪. কুরাইশদের বড় নেতাদের অন্যতম ওয়ালীদ ইবনে মুগীরার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। ইবনে জারীর তাবারী বর্ণনা করেছেন যে, এ ব্যক্তি প্রথমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত গ্রহণ করতে মনস্থির করে ফেলেছিল। কিন্তু তার এক মুশরিক বন্ধু জানতে পারলো যে, সে মুসলমান হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করছে। সে তাকে বললো, তুমি পিতৃধর্ম ত্যাগ করো না। যদি তুমি আখেরাতের আযাবের ভয় পেয়ে থাকো তাহলে আমাকে এই পরিমাণ অর্থ দিয়ে দাও, তোমার পরিবর্তে আমি সেখানকার আযাব ভোগ করার দায়িত্ব গ্রহণ করছি। ওয়ালীদ একথা মেনে নিল এবং আল্লাহর পথে প্রায় এসে আবার ফিরে গেল। কিন্তু সে তার মুশরিক বন্ধুকে যে পরিমাণ অর্থ দেবে বলে ওয়াদা করেছিল তার সামান্য মাত্র দিয়ে অবশিষ্ট অংশ বন্ধ করে দিল। এ ঘটনার প্রতি ইংগিত করার উদ্দেশ্য ছিল মক্কার কাফেরদের একথা জানিয়ে দেয়া যে, আখেরাত সম্পর্কে নিরুদ্বেগ এবং দীনের তাৎপর্য সম্পর্কে অজ্ঞতা তাদেরকে কি ধরনের মূর্খতা ও নির্বুদ্ধিতার মধ্যে নিমগ্ন করে রেখেছে।

৩৫. অর্থাৎ সে কি জানতে পেরেছে যে, এ আচরণ তার জন্য সত্যিই কল্যাণকর? সে কি জানতে পেরেছে যে, এভাবে কেউ আখেরাতের আযাব থেকে বাঁচতে পারে?

৩৬. হযরত মূসা ও হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সহীফাসমূহে যে শিক্ষা নাযিল করা হয়েছিল তার সংক্ষিপ্তসার এখানে বর্ণনা করা হচ্ছে। হযরত মূসার সহীফাসমূহ বলতে তো তাওরাতকে বুঝানো হয়েছে। আর হযরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সহীফাসমূহ আজ পৃথিবীতে কোথাও বর্তমান নেই। তাছাড়া ইহুদী ও খৃষ্টানদের পবিত্র গ্রন্থসমূহেও তার কোন উল্লেখ দেখা যায় না। কুরআনই একমাত্র গ্রন্থ যার দু'টি

স্থানে ইবরাহীমের সহীফার শিক্ষাসমূহের কোন কোন অংশ উদ্ধৃত হয়েছে। তার একটি স্থান হলো এটি এবং অপর স্থানটি হলো সূরা আল আ'লার শেষ কয়েকটি আয়াত।

৩৭. এ আয়াত থেকে তিনটি বড় মূলনীতি পাওয়া যায়। এক, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজে তার কাজের জন্য নিজেই দায়ী। দুই, একজনের কাজের দায়দায়িত্ব অন্যের ওপর চাপিয়ে দেয়া যেতে পারে না তবে সেই কাজ সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে তার কোন ভূমিকা থাকলে ভিন্ন কথা। তিন, কেউ চাইলেও অন্য কারো কাজের দায়দায়িত্ব নিজে গ্রহণ করতে পারে না। আর প্রকৃত অপরাধীকে এ কারণে ছেড়ে দেয়া যেতে পারে না যে, তার শাস্তি ভোগ করার জন্য অন্য কেউ এগিয়ে আসছে।

৩৮. একথাটি থেকেও তিনটি মূলনীতি পাওয়া যায়। এক, প্রত্যেক ব্যক্তি যা পরিণতি ভোগ করবে তা তার কৃতকর্মেরই ফল। দুই, একজনের কর্মফল অন্যজন ভোগ করতে পারে না। তবে ঐ কাজের পেছনে তার কোন ভূমিকা থাকলে তা ভিন্ন কথা। তিন, চেষ্টা–সাধনা ছাড়া কেউ–ই কিছু লাভ করতে পারে না।

কোন কোন ব্যক্তি এ তিনটি মূলনীতিকে ভুল পন্থায় পৃথিবীর অর্থনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, কোন ব্যক্তি নিজের কষ্টার্জিত আয় (Earned Income) ছাড়া কোন কিছুর বৈধ মালিক হতে পারে না। কিন্তু একথা কুরআন মজীদেরই দেয়া কিছু সংখ্যক আইন ও নির্দেশের সাথে সাংঘর্ষিক। উদাহরণ হিসেবে উত্তরাধিকার আইনের কথা বলা যেতে পারে। এ আইন অনুসারে কোন ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদে বহু সংখ্যক লোক অংশ পায় এবং বৈধ উত্তরাধিকারী হিসেবে স্বীকৃত হয়। কিন্তু উত্তরাধিকার হিসেবে প্রাপ্ত এ সম্পদ তার শ্রম দ্বারা অর্জিত নয়। শত যুক্তি দেখিয়েও একজন দুগ্ধপোষ্য শিশু সম্পর্কে একথা প্রমাণ করা যাবে না যে, পিতার পরিত্যক্ত সম্পদে তার শ্রমের কোন ভূমিকা আছে। অনুরূপভাবে যাকাত ও সাদকার বিধান অনুসারে শুধুমাত্র শরয়ী ও নৈতিক অধিকারের ভিত্তিতে একজনের অর্থ–সম্পদ অন্যেরা লাভ করে থাকে। এভাবে তারা ঐ সম্পদের বৈধ মালিকানা লাভ করে। কিন্তু সেই সম্পদ সৃষ্টির ব্যাপারে তার শ্রমের কোন অংশ থাকে না। অতএব কুরআনের কোন একটি আয়াত নিয়ে বিচার–বিশ্লেষণ করে কুরআনের অন্যান্য শিক্ষার সাথে সাংঘর্ষিক কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা কুরআনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

আবার কিছু সংখ্যক লোক এসব মূলনীতিকে আখেরাতের সাথে সম্পৃক্ত ধরে নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, এসব মূলনীতি অনুসারে এক ব্যক্তির কাজ কি কোন অবস্থায় অপর ব্যক্তির জন্য কল্যাণকর হতে পারে? এক ব্যক্তি যদি অপর ব্যক্তির জন্য কিংবা তার পরিবর্তে কোন আমল করে তাহলে তার পক্ষ থেকে তা গ্রহণ করা যেতে পারে? এক ব্যক্তির আমল কি অন্য কোন ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া সম্ভব? এসব প্রশ্নের জবাব যদি নেতিবাচক হয় তাহলে "ইসালে সওয়াব" বদলি হজ্জ ইত্যাদি সবই না জায়েজ হয়ে যায়। এমন কি অন্যের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে দোয়া করাও অর্থহীন হয়ে পড়ে। কেননা যার জন্য দোয়া করা হবে সেই দোয়াও তার নিজের কাজ নয়। তবে শুধুমাত্র মু'তাযিলারা ছাড়া ইসলামের অনুসারীদের মধ্য থেকে আর কেউ–ই এ চরম দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেনি। শুধু তারাই এ আয়াতের এ অর্থ গ্রহণ করে থাকে যে এক ব্যক্তির চেষ্টা–সাধনা কোন অবস্থায়ই অন্যের জন্য কল্যাণকর হতে পারে না। অপরদিকে আহলে সুন্নাত একজনের

দোয়া অন্যের জন্য কল্যাণকর হওয়ার বিষয়টা সর্বসম্মতভাবে স্বীকার করে। কেননা, কুরআন থেকেই তা প্রমাণিত। "ইসালে সওয়াব" এবং অন্য কারো পক্ষ থেকে কৃত কোন নেক কাজের কল্যাণকর হওয়ার ব্যাপারে তাদের মধ্যে মৌলিক দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই, বরং বিস্তারিত ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মতানৈক্য বিদ্যমান।

(১) ইসালে সওয়াব হলো, এক ব্যক্তির কোন নেক কাজ করে তার সওয়াব ও প্রতিদান অপর কোন ব্যক্তিকে দেয়া হোক বলে আল্লাহর কাছে দোয়া করা। এ মাসয়ালা সম্পর্কে ইমাম মালেক (র) ও ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন ঃ নিরেট শারীরিক ইবাদাত যেমন ঃ নামায, রোযা ও কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদির সওয়াব অন্যেরা পেতে পারে না। তবে আর্থিক ইবাদাত যেমন ঃ সাদকা কিংবা আর্থিক ও শারিরীক উভয়টির সংমিশ্রিত ইবাদাত যেমন ঃ হজ্জ—এ সবের সওয়াব অন্যে পেতে পারে। কারণ, মূলনীতি হিসেবে এটা অবিসম্পাদিত যে, এক ব্যক্তির আমল অন্যের কল্যাণে আসবে না। তবে, অনেক সহীহ হাদীসের ভাষ্য অনুসারে যেহেতু সাদকার সওয়াব পৌছানো যায় এবং বদলি হজ্জও করা যায়, তাই আমরা এ প্রকৃতির ইবাদাতের "ইসালে সওয়াব" বা সওয়াব পৌছানোর বৈধতা স্বীকাব করছি। পক্ষান্তরে হানাফী আলেমদের রায় হলো, মানুষ তাঁর সব রকম নেক আমলের সওয়াব অপরকে দান করতে পারে—তা নামায হোক বা রোযা, কুরআন তিলাওয়াত হোক বা যিকর কিংবা সাদকা হোক বা হজ্জ ও উমরা হোক। এর স্বপক্ষে যুক্তি হচ্ছে, শ্রমের কাজ করে মানুষ যেমন মালিককে বলতে পারে, এর পারিশ্রমিক আমার পরিবর্তে অমুক ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া হোক। তেমনি কোন নেক কাজ করে সে আল্লাহ তা'আলার কাছে এ বলে দোয়া করতে পারে এ কাজের প্রতিদান আমার পক্ষ থেকে অমুক ব্যক্তিকে দিয়ে দেয়া হোক। এ ক্ষেত্রে কতিপয় নেকীর কাজকে বাদ দিয়ে অন্য কতিপয় নেকীর কাজের মধ্যে একে সীমিত রাখার কোন যুক্তিসংগত কারণ নেই। এ বিষয়টি বহু সংখ্যক হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ঃ

বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, ইবনে মাজা, তাবারানী (ফিল-আওসাত) মুসতাদরিক এবং ইবনে আবী শায়বাতে হযরত আয়েশা, হযরত আবু হুরাইরা, হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ, হযরত আবু রাফে', হযরত আবু তালহা আনসারী এবং হুযাইফা ইবনে উসাইদুল গিফারী কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'টি ভেড়া নিয়ে তার একটি নিজের ও নিজের পরিবারের সবার পক্ষ থেকে এবং অপরটি তাঁর উম্মতের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছেন।

মুসলিম, বুখারী, মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ এবং নাসায়ীতে হযরত আয়েশা কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো, আমার মা অকস্মাত মারা গিয়েছেন। আমার বিশ্বাস, যদি তিনি কথা বলার সুযোগ পেতেন তাহলে অবশ্যই সাদকা করার জন্য বলতেন। এখন আমি যদি তাঁর পক্ষ থেকে সাদকা করি তাহলে তিনি কি তার প্রতিদান পাবেন? নবী (সা) বললেন, হ্যাঁ।

মুসনাদে আহমাদে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, তার দাদা আস ইবনে ওয়ায়েল জাহেলী যুগে একশত উট কুরবানী করার মানত করেছিলেন। তার চাচা হিশাম ইবনুল আস তার অংশের পঞ্চাশটি উট কুরবানী করে দিয়েছেন। হযরত আমর ইবনুল আস রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস

করলেন, তিনি কি করবেন। নবী (সা) বললেন ঃ তোমার পিতা যদি তাওহীদের অনুসারী হয়ে মারা গিয়ে থাকেন তাহলে তুমি তার পক্ষ থেকে রোযা রাখো অথবা সাদকা করো। এতে তার কল্যাণ হবে।

মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজাতে হযরত হাসান বাসরীর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত সা'দ ইবনে উবাদা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ আমার মা ইনতিকাল করেছেন? আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে সাদকা করবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী, তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজা প্রভৃতি হাদীসগ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা), হযরত আবু হুরাইরা (রা) এবং হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আরো কিছু সংখ্যক হাদীস আছে। ঐ সব হাদীসেও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে সাদকা করার অনুমতি দিয়েছেন এবং বলেছেন, তা মৃত ব্যক্তির জন্য কল্যাণকর।

দারু কুতনীতে বর্ণিত হয়েছে ঃ এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, আমি আমার পিতা–মাতার সেবা তাঁদের জীবদ্দশায়ও করে যাচ্ছি। তাঁদের মৃত্যুর পর কিভাবে সেবা করবো? তিনি বললেন ঃ "তাদের মৃত্যুর পর তোমার নামাযের সাথে তাদের জন্যও নামায পড়বে, তোমার রোযার সাথে তাদের জন্য রোযা রাখবে, এটাও তাদের সেবার অন্তরভুক্ত।" দারু কুতনীতে হযরত আলী (রা) থেকে আরো একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে তিনি বলেন ঃ নবী (সা) বলেছেন কোন ব্যক্তি যদি কবরস্থানের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে এবং এগার বার কুল হুয়াল্লাহু আহাদ পড়ে ঐ কবরস্থানের মৃতদের জন্য দোয়া করে তাহলে ওখানে যত মৃত আছে তাদের সকলকে সওয়াব দান করা হবে। একটি আরেকটির সমর্থক এ ধরনের বিপুল সংখ্যক হাদীস এ বিষয় স্পষ্ট করে দেয় যে, "ইসালে সওয়াব" বা সওয়াব পৌছানো শুধু সম্ভবই নয়, বরং সব রকম ইবাদাত এবং নেকীর কাজের সওয়াব পৌছানো যেতে পারে। এ জন্য বিশেষ ধরনের আমল বা ইবাদাত নির্দিষ্ট নেই। তবে এ প্রসংগে চারটি বিষয় খুব ভালভাবে বুঝে নিতে হবে ঃ

এক ঃ কেবল এমন আমলের সওয়াবই পৌছানো যেতে পারে যা নিছক আল্লাহর উদ্দেশ্যে শরীয়াতের নিয়ম–কানুন মাফিক করা হয়েছে। তা নাহলে একথা স্পষ্ট যে, গায়রুল্লাহর জন্য কিংবা শরীয়াতের বিধি–বিধানের পরিপন্থী কোন কাজ বা ইবাদাত করা হলে তা অন্য কারো জন্য দান করা তো দূরের কথা আমলকারী নিজেই তার কোন সওয়াব পেতে পারে না।

দুই ঃ যেসব ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার দরবারে সৎলোক হিসেবে মেহমান হয়ে আছে তারা তো নিশ্চিতভাবেই এ সওয়াবের উপহার লাভ করবেন। কিন্তু যারা সেখানে অপরাধী হিসেবে হাজতে বন্দী আছে তাদের কাছে কোন সওয়াব পৌছবে বলে আশা করা যায় না। আল্লাহর মেহমানদের কাছে তো উপহার পৌছতে পারে। কিন্তু আল্লাহর বন্দীদের কাছে উপহার পৌছার কোন আশা নেই। কোন ব্যক্তি যদি ভুল বুঝার কারণে তার জন্য ইসালে সওয়াব করে তাহলে তার সওয়াব নষ্ট হবে না, বরং অপরাধীর কাছে পৌছার বদলে মূল আমলকারীর কাছে ফিরে আসবে। ঠিক মানি অর্ডার যেমন প্রাপকের হাতে না পৌছলে প্রেরকের কাছে ফিরে আসে।

তিন ঃ সওয়াব পৌছানো সম্ভব কিন্তু আযাব পৌছানো সম্ভব নয়। অর্থাৎ কেউ নেককাজ করে অন্য কাউকে তার সওয়াব দান করবে এটা সম্ভব কিন্তু গোনাহর কাজ করে তার আযাব অন্য কাউকে দান করবে আর তা তার কাছে পৌছে যাবে, তা সম্ভব নয়।

চার ঃ নেক কাজের দু'টি কল্যাণকর দিক আছে। একটি হচ্ছে নেক কাজের সে শুভ ফলাফল যা আমলকারীর ব্যক্তিসত্তায় ও চরিত্রে প্রতিফলিত হয় এবং যার কারণে সে আল্লাহর পুরস্কার ও প্রতিদান লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়। দ্বিতীয়ত তার সেই সব প্রতিদান যা তাকে আল্লাহ তা'আলা পুরস্কার হিসেবে দান করেন। এর প্রথমটির সাথে ইসালে সওয়াবের কোন সম্পর্ক নেই, শুধু দ্বিতীয়টির সাথে এর সম্পর্ক। এর উদাহরণ হলো ঃ কোন ব্যক্তি শরীর চর্চার মাধ্যমে কুস্তিতে দক্ষতা লাভের চেষ্টা করে। এভাবে তার মধ্যে যে শক্তি ও দক্ষতা সৃষ্টি হয় তা সর্বাবস্থায় তার নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, তা অন্য কাউকে দেয়া যায় না। অনুরূপভাবে সে যদি কোন রাজ দরবারের কর্মচারী হয় এবং কুস্তিগীর হিসেবে তার জন্য একটি বেতন নির্দিষ্ট থাকে তাহলে সে বেতনও শুধু সে-ই পাবে। অন্য কাউকে তা দেয়া হবে না। তবে তার কর্মতৎপরতায় খুশী হয়ে তার পৃষ্ঠপোষক তাকে যেসব পুরস্কার ও উপহার দেবে সেগুলো সম্পর্কে সে আবেদন করতে পারে যে তা তার শিক্ষক, মাতা-পিতা কিংবা অন্য কল্যাণকামী ও হিতাকাংখীদের দেয়া হোক। নেক কাজের ব্যাপারটাও তাই। এর আত্মিক কল্যাণসমূহ হস্তান্তর যোগ্য নয়। তার প্রতিদানও কাউকে হস্তান্তর করা যায় না। কিন্তু তার পুরস্কার ও সওয়াব সম্পর্কে সে আল্লাহ তা'আলার কাছে এ বলে দোয়া করতে পারে যে, তা তার কোন ঘনিষ্ঠ বন্ধু কিংবা কোন কল্যাণকামীকে দান করা হোক। এ কারণে একে 'ইসালে জাযা' প্রতিদান পৌছানো নয়, "ইসালে সওয়াব" সওয়াব পৌছানো বলা হয়ে থাকে।

(২) এক ব্যক্তির চেষ্টা ও তৎপরতা অন্য কোন ব্যক্তির জন্য উপকারী হওয়ার আরেকটি রূপ হচ্ছে, ব্যক্তি হয় অন্য কারো ইচ্ছা বা ইংগিতে তার জন্য কোন নেক কাজ করবে। কিংবা তার ইচ্ছা বা ইংগিত ছাড়াই তার পক্ষ থেকে এমন কোন কাজ করবে যা মূলত ঐ ব্যক্তির জন্য ওয়াজিব ছিল কিন্তু সে নিজে তা আদায় করতে পারেনি। এ ব্যাপারে হানাফী ফিকাহবিদদের মত হলো ঃ ইবাদাত তিন প্রকার ঃ এক, নিরেট দৈহিক ইবাদাত, যেমন ঃ নামায। দুই, নিরেট আর্থিক ইবাদাত, যেমন ঃ যাকাত এবং তিন, দেহ ও অর্থের সমন্বিত ইবাদাত, যেমন ঃ হজ্জ। এসব ইবাদাতের মধ্যে প্রথম প্রকারের ইবাদাতে কোন রকম প্রতিনিধিত্ব চলে না। যেমন এক ব্যক্তির প্রতিনিধি হিসেবে আরেক ব্যক্তি নামায পড়তে পারে না। দ্বিতীয় প্রকারের ইবাদাতে প্রতিনিধিত্ব চলতে পারে। যেমন ঃ স্বামী স্ত্রীর অলঙ্কারাদির যাকাত আদায় করতে পারে। তৃতীয় প্রকারের ইবাদাতে প্রতিনিধিত্ব কেবল তখনি চলতে পারে যখন মূল ব্যক্তি, যার পক্ষ থেকে কোন কাজ করা হচ্ছে, নিজের দায়িত্ব নিজে পালনে সাময়িকভাবে নয়, বরং স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে পড়ে। যেমন, বদলি হজ্জ শুধু এমন ব্যক্তির পক্ষ থেকে হতে পারে যে নিজে হজ্জ পালন করতে যেতে অক্ষম এবং কখনো হজ্জ পালনে যেতে সক্ষম হওয়ার আশাও করা যায় না। মালেকী ও শাফেয়ী মাযহাবের অনুসারীগণও এ মতের সমর্থক। তবে বদলি হজ্জের জন্য ইমাম মালেক শর্ত আরোপ করেছেন যে, বাপ যদি ছেলেকে এ মর্মে অসীয়ত করে থাকে যে,

তার মৃত্যুর পর তার ছেলে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করবে তাহলে তা জায়েজ হবে অন্যথায় নয়। তবে এ ব্যাপারে হাদীসের স্পষ্ট বক্তব্য হচ্ছে বাপের ইংগিত বা অসীয়ত থাক বা না থাক—ছেলে তার পক্ষ থেকে বদলি হজ্জ করতে পারে।

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, খাস'আম গোত্রের এক মহিলা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো ঃ আমার পিতার ওপর হজ্জের আদেশ এমন অবস্থায় প্রয়োজ্য হয়েছে যখন তিনি অত্যন্ত বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তিনি উটের পিঠে বসে থাকতে পারেন না। নবী (সা) বললেন ঃ فحجى عنه "তার পক্ষ থেকে তুমি হজ্জ আদায় করো (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযী, নাসায়ী)। হযরত আলীও (রা) প্রায় অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত হদীস বর্ণনা করেছেন।" (আহমাদ, তিরমিযী)।

হযরত আবদুল্লাহ (রা) যুবায়ের খাস'আম গোত্রেরই একজন পুরুষের কথা উল্লেখ করে বলেন যে, সে ও তার বৃদ্ধ পিতা সম্পর্কে এ একই প্রশ্ন করেছিলো। নবী (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমিই কি তার বড় ছেলে? সে বললো হ্যাঁ। তিনি বললেন ঃ ارايت لو كان على ابيك دين فقضيته عنه كان يجزى ذلك عنه তুমি কি মনে করো, যদি তোমার পিতা ঋণী থাকে আর তুমি তা আদায় করে দাও তাহলে তার পক্ষ থেকে তা আদায় হয়ে যাবে? সে বললোঃ 'জি হাঁ'। তিনি বললেন, فاحجج عنه তাহলে অনুরূপভাবে তুমি তার পক্ষ থেকে হজ্জও আদায় করো। (আহমদ, নাসায়ী)

ইবনে আব্বাস বলেন ঃ জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা এসে বললো ঃ আমার মা হজ্জ করার মানত করেছিলেন। কিন্তু হজ্জ আদায় করার আগেই তিনি মারা গেছেন। এখন আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করতে পারি? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন ঃ তোমার মা যদি ঋণগ্রস্ত হতো তাহলে তুমি কি তা পরিশোধ করতে পারতে না? একইভাবে তোমরা আল্লাহর হকও আদায় করো। আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পালন করার মাধ্যমে আল্লাহর অধিকার প্রদান করা সবচেয়ে বেশী জরুরী কাজ। (বুখারী, নাসায়ী) বুখারী ও মুসলিমের আরো একটি রেওয়ায়াত হচ্ছে, এক ব্যক্তি এসে তার বোন সম্পর্কে প্রশ্ন করলো যা ওপরে উল্লেখ করা হয়েছে। নবী (সা) তাকেও এ একই জবাব দিলেন।

এসব বর্ণনা থেকে অর্থ ও দেহের সমন্বিত ইবাদাতসমূহে প্রতিনিধিত্বের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এরপর থাকে নিরেট দৈহিক ইবাদাতসমূহ। এ বিষয়ে এমন কিছু হাদীস আছে যা থেকে এ প্রকৃতির ইবাদাতসমূহের ক্ষেত্রেও প্রতিনিধিত্বের বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন ইবনে আব্বাসের (রা) এই বর্ণনা যে, জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো ঃ আমার মা রোযা মানত করেছিলেন। কিন্তু তা পূরণ করার পূর্বেই তিনি মারা গিয়েছেন। আমি কি তাঁর পক্ষ থেকে রোযা রাখতে পারি? নবী (সা) বললেন ঃ তার পক্ষ থেকে রোযা রাখো (বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, নাসায়ী, আবু দাউদ)। হযরত বুরাইদা (রা) বর্ণিত এ হাদীস থেকেও প্রমাণ পাওয়া যায় যে, এক মহিলা তার মা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো যে, তার ওপর এক মাসের (অথবা আরেকটি বর্ণনা অনুসারে দু' মাসের) রোযা ওয়াজিব ছিল। আমি কি তার পক্ষ থেকে এ রোযা পালন করবো? নবী (সা) তাকেও অনুমতি দিলেন। (মুসলিম, আহমাদ, তিরমিযি, আবু দাউদ)। তাছাড়া হযরত আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীসেও নবী (সা) বলেছেন ঃ مَنْ مَاتَ وَعَلَيهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ কেউ যদি মারা যায় আর তাঁর

ওপর কিছু রোযা থাকে তাহলে তার পক্ষ থেকে তার অভিভাবক সেই রোযা রাখবে (বুখারী, মুসলিম, আহ্‌মাদ)। বাযযার বর্ণিত হাদীসে নবীর (সা) কথা উল্লেখিত হয়েছে এরূপ ঃ فَلْيَصُمْ عَنْهُ وَلِيُّهُ إِنْ شَاءَ অর্থাৎ তার অভিভাবক ইচ্ছা করলে তার পক্ষ থেকে রোযা রাখবে। এসব হাদীসের ভিত্তিতে আসহাবুল হাদীস, ইমাম আওযায়ী এবং জাহেরিয়াগণ দৈহিক ইবাদাতসমূহেও প্রতিনিধিত্ব জায়েয হওয়ার সমর্থক। কিন্তু ইমাম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী এবং ইমাম যায়েদ ইবনে আলীর ফতোয়া হচ্ছে, মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা রাখা যেতে পারে না। ইমাম আহমাদ, ইমাম লাইস এবং ইসহাক ইবনে রাহাবিয়া বলেন ঃ এটা কেবল তখনই করা যেতে পারে যখন মৃত ব্যক্তি তা মানত করেছে কিন্তু পূরণ করতে পারেনি। বিরোধীদের যুক্তি হলো, যেসব হাদীস থেকে এর বৈধতার প্রমাণ পাওয়া যায় তার বর্ণনাকারীগণ নিজেরাই ঐ সব হাদীসের পরিপন্থী ফতোয়া দিয়েছেন। নাসায়ী ইবনে আব্বাসের ফতোয়া নিম্নোক্ত ভাষায় উদ্ধৃত করেছেন ঃ لَا يُصَلِّ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يَصُمْ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ কোন ব্যক্তি যেন কারো পক্ষ থেকে নামায না পড়ে এবং রোযাও না রাখে। আবদুর রায্‌যাকের বর্ণনা অনুসারে হযরত আয়েশার ফতোয়া হলো ঃ لَا تَصُومُوا عَنْ مَوْتَاكُمْ وَأَطْعِمُوا عَنْهُمْ "তোমাদের মৃতদের পক্ষ থেকে রোযা রেখো না, খাবার খাইয়ে দাও।" আবদুর রায্‌যাক আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকেও একথাই উদ্বৃত করেছেন, অর্থাৎ মৃতের পক্ষ থেকে যেন রোযা রাখা না হয়। এ থেকে জানা যায় যে, প্রথম প্রথম শারীরিক ইবাদাতসমূহেও প্রতিনিধিত্বের অনুমতি ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্থিরিকৃত হয় যে, এটা করা জায়েজ নয়। অন্যথায় কি করে সম্ভব যে যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন তারা নিজেরাই আবার তার পরিপন্থী ফতোয়া প্রদান করবেন?

এ ক্ষেত্রে একথা ভালভাবে বুঝতে হবে যে, প্রতিনিধিত্বমূলকভাবে কোন ফরয পালন কেবল তাদের জন্যই উপকারী হতে পারে যারা নিজে ফরয আদায় করতে আগ্রহী কিন্তু বাস্তব কোন অসুবিধার কারণে অপারগ হয়ে পড়েছেন। তবে সমর্থ ও সক্ষম হওয়া সত্ত্বেও কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে হজ্জ আদায় করা থেকে বিরত থাকে এবং এ ফরযটি আদায় করা সম্পর্কে তার মনে কোন অনুভূতি পর্যন্ত না থেকে থাকে তার জন্য বদলি হজ্জ যতই করা হোক না কেন তা তার জন্য কল্যাণকর হবে না। এটা ঠিক যেন কোন ব্যক্তি কর্তৃক অপর কোন ব্যাক্তির ঋণের টাকা আত্মসাত করা এবং মৃত্যু পর্যন্ত পরিশোধ করার ইচ্ছা না থাকা। পরবর্তী সময়ে তার পক্ষ থেকে যদি প্রতিটি পাইও পরিশোধ করা হয় তবুও আল্লাহ তা'আলার দৃষ্টিতে সে ঋণ আত্মসাতকারী ব্যক্তি হিসেবেই গণ্য হবে। অপরের আদায় করে দেয়ায় কেবল সেই ব্যক্তিই নিষ্কৃতি পেতে পারে যে তার জীবদ্দশায় ঋণ আদায়ে আগ্রহী ছিল। কিন্তু কোন অসুবিধার কারণে আদায় করতে পারেনি।

৩৯. অর্থাৎ আখেরাতে মানুষের কাজ-কর্মের যাঁচাই বাছাই হবে এবং কে কি কাজ করে এসেছে তা দেখা হবে। আয়াতের এ অংশটি যেহেতু পূর্ববর্তী অংশের পরপরই বলা হয়েছে তাই এ থেকে স্বতই একথা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, আখেরাতের প্রতিদান ও শাস্তির সাথেই প্রথম অংশের সম্পর্ক। এ অংশকে যারা এ পৃথিবীর জন্য একটি অর্থনৈতিক মূলনীতি হিসেবে পেশ করে থাকে তাদের কথা ঠিক নয়। কুরআন মজীদের কোন আয়াতের এমন কোন অর্থ গ্রহণ করা ঠিক নয় যা পূর্বাপর প্রসংগের পরিপন্থী এবং কুরআনের অন্যান্য বক্তব্যের সাথে সাংঘর্ষিক।

وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ ﴿٤٢﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ ﴿٤٣﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ
وَأَحْيَا ﴿٤٤﴾ وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ ﴿٤٥﴾ مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَىٰ ﴿٤٦﴾
وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿٤٧﴾ وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ ﴿٤٨﴾ وَأَنَّهُ
هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ ﴿٤٩﴾ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ﴿٥٠﴾ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ ﴿٥١﴾

একথা যে, "শেষ পর্যন্ত তোমার রবের কাছেই পৌঁছতে হবে।"

একথা যে, "তিনিই হাসিয়েছেন এবং তিনিই কাঁদিয়েছেন।"[৪০]

একথা যে, "তিনিই মৃত্যু দিয়েছেন এবং তিনিই জীবন দান করেছেন।"

একথা যে, "তিনিই পুরুষ ও নারী রূপে জোড়া সৃষ্টি করেছেন।"—এক ফোটা শুক্রের সাহায্যে যখন তা নিক্ষেপ করা হয়।"[৪১]

একথা যে, "পুনরায় জীবন দান করাও তাঁরই কাজ।"[৪২]

একথা যে, "তিনিই সম্পদশালী করেছেন এবং স্থায়ী সম্পদ দান করেছেন।"[৪৩]

একথা যে, "তিনিই শে'রার রব।"[৪৪]

আর একথাও যে, তিনিই প্রথম আদকে[৪৫] *ধ্বংস করেছেন এবং সামূদকে এমনভাবে নিশ্চিহ্ন করেছেন যে, কাউকে অবশিষ্ট রাখেননি।*

৪০. অর্থাৎ আনন্দ ও দুঃখের কার্যকারণ তার পক্ষ থেকেই সৃষ্টি হয়ে থাকে। ভাল ও মন্দ ভাগ্যের মূলসূত্র তাঁরই হাতে। কারো ভাগ্যে যদি আরাম ও আনন্দ জুটে থাকে তাহলে তা তাঁর দানেই হয়েছে। আবার কেউ যদি বিপদাপদ ও দুঃখ-কষ্টের মুখোমুখি হয়ে থাকে তাও তাঁর ইচ্ছায়ই হয়েছে। এ বিশ্ব-জাহানে এমন আর কোন সত্তা নেই ভাগ্যের ভাঙা গড়ায় যার কোন হাত আছে।

৪১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আর রূম, টীকা ২৭ থেকে ৩০; আশ শূরা, টীকা ৭৭।

৪২. ওপরের দু'টি আয়াতের সাথে এ আয়াতটি মিলিয়ে পড়লে বুঝা যায়, বাক্যের বিন্যাস থেকে আপনা আপনি মৃত্যুর পরের জীবনের প্রমাণও পাওয়া যাচ্ছে। যে আল্লাহ মৃত্যু এবং জীবন দান করার ক্ষমতা রাখেন, যিনি একফোটা নগণ্য শুক্র দিয়ে মানুষের মত একটি সৃষ্টিকে তৈরী করেন, বরং সৃষ্টির একই উপাদান ও একই সৃষ্টির পদ্ধতি থেকে নারী ও পুরুষের দু'টি স্বতন্ত্র শ্রেণী সৃষ্টি করে দেখান, তার জন্য মানুষকে পুনরায় সৃষ্টি করা কোন কঠিন কাজ নয়।

৪৩. মূল আয়াতে اقنى শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ভাষাবিদ ও মুফাসসিরগণ এর বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। কাতাদা বলেন ঃ ইবনে আব্বাস এর অর্থ বলেছেন ارضى

وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ ﴿٥٢﴾ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴿٥٣﴾ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ ﴿٥٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴿٥٥﴾

তাদের পূর্বে তিনি নূহের কওমকে ধ্বংস করেছেন। কারণ, তারা আসলেই বড় অত্যাচারী ও অবাধ্য লোক ছিল। তিনি উল্টে দেয়া জনপদকেও উঠিয়ে নিক্ষেপ করেছেন। তারপর ঐগুলোকে আচ্ছাদিত করে দিল তাই যা (তোমরা জানো যে কি) আচ্ছাদিত করেছিলো।[৪৬]

তাই[৪৭], হে শ্রোতা, তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করবে?[৪৮]

(সম্মত) করে দিয়েছেন। ইবনে আব্বাস থেকে ইকরিমা এর অর্থ বর্ণনা করেছেন قنع (সন্তুষ্ট করে দিয়েছেন)। ইমাম রাযী বলেন ঃ মানুষকে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত যা–ই দেয়া হয়ে থাকে তাকেই اقناء বলে। আবু উবায়দা এবং আরো কিছু সংখ্যক ভাষাভিজ্ঞের মতে اقنى শব্দটির উদ্ভব قنية শব্দ থেকে। এর অর্থ অবশিষ্ট ও সংরক্ষিত থাকার মত সম্পদ। যেমন ঃ ঘর–বাড়ী, জমিজমা, বাগান, গবাদিপশু ইত্যাদি। ইবনে যায়েদ এসব অর্থ থেকে ভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন اقنى শব্দটি এখানে افقر (দরিদ্র করে দিয়েছে) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এভাবে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় তিনি যাকে ইচ্ছা সম্পদশালী করেছেন এবং যাকে ইচ্ছা দরিদ্র বানিয়েছেন।

৪৪. শে'রা আকাশের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র। আরবীতে একে مرزم الجوزاء، الكلب الاكبر، الكلب الجبار، الشعرى العبور প্রভৃতি নামে উল্লেখ করা হয়ে থাকে। ইংরেজী ভাষায় একে Sirius, Dog star এবং Canis Majoris বলা হয়। এটি সূর্যের চেয়েও ২৩ গুণ বেশী উজ্জ্বল। কিন্তু পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব আট আলোকবর্ষেরও বেশী। তাই একে সূর্যের চেয়ে ছোট ও কম উজ্জ্বল দেখা যায়। মি রবাসীরা এর উপাসনা করতো। কারণ এর উদয়কালে নীল নদে জোয়ার ও প্লাবন হতো। সুতরাং তারা মনে করতো, এর উদয়ের প্রভাবেই এরূপ হয়েছে। জাহেলী যুগে আরবদেরও বিশ্বাস ছিল যে, এ নক্ষত্র মানুষের ভাগ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। সেই কারণে এটি আরবদের উপাস্য দেবতাদের মধ্যে অন্তরভুক্ত ছিল এবং বিশেষ করে কুরাইশদের প্রতিবেশী খুজা'য়া গোত্র এর উপাসনার জন্য বিখ্যাত ছিল। আল্লাহ তা'আলার বক্তব্যের অর্থ হচ্ছে, শে'রা নক্ষত্র তোমাদের ভাগ্য গড়ে না বরং তার রব গড়ে থাকেন।

৪৫. প্রথম আদ অর্থ প্রাচীন আদ জাতি যাদের কাছে হযরত হূদ আলাইহিস সালামকে পাঠানো হয়েছিল। হযরত হূদকে (আ) অস্বীকার করার অপরাধে এ জাতি আল্লাহর আযাবের শিকার হলে যারা তার ওপর ঈমান এনেছিল কেবল তারাই রক্ষা পায়। এদের বংশধরদেরকে ইতিহাসে পরবর্তীকালের আদ বা দ্বিতীয় আদ বলা হয়ে থাকে।

هٰذَا نَذِيْرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْاُوْلٰى ﴿٥٦﴾ اَزِفَتِ الْاٰزِفَةُ ﴿٥٧﴾ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ كَاشِفَةٌ ﴿٥٨﴾ اَفَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ ﴿٥٩﴾ وَتَضْحَكُوْنَ وَلَا تَبْكُوْنَ ﴿٦٠﴾ وَاَنْتُمْ سٰمِدُوْنَ ﴿٦١﴾ فَاسْجُدُوْا لِلّٰهِ وَاعْبُدُوْا ﴿٦٢﴾

এটি একটি সাবধান বাণী—ইতিপূর্বে আগত সাবধান বাণীসমূহের মধ্য থেকে।[৪৯] আগমনকারী মুহূর্ত অতি সন্নিকটবর্তী হয়েছে।[৫০] আল্লাহ ছাড়া আর কেউ তার প্রতিরোধকারী নেই।[৫১] তাহলে কি এসব কথা শুনেই তোমরা বিস্ময় প্রকাশ করছো?[৫২] হাসছো কিন্তু কাঁদছো না?[৫৩] আর গান-বাদ্য করে তা এড়িয়ে যাচ্ছো?[৫৪] আল্লাহর সামনে মাথা নত কর এবং তাঁর ইবাদাত করতে থাকো।[৫৫]

৪৬. উল্টিয়ে দেয়া জনপদসমূহ অর্থ লূতের কওমের জনপদসমূহ। আর "আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল তাদের ওপর যা কিছু আচ্ছন্ন করে দিয়েছিলো" অর্থ সম্ভবত মরু সাগরের পানি। তাদের জনপদসমূহ মাটিতে দেবে যাওয়ার পর এ সমুদ্রের পানি তার ওপর ছড়িয়ে পড়েছিলো। আজ পর্যন্ত তা এ অঞ্চল প্লাবিত করে আছে।

৪৭. কোন কোন মুফাস্সিরের মতে একথাটিও ইবরাহীম ও মূসার সহীফাসমূহের একটি বাক্যাংশ। কিন্তু কোন কোন মুফাসসিরের মতে فَغَشّٰهَا مَا غَشّٰى পর্যন্তই সহীফাসমূহের বাক্য শেষ হয়েছে এবং এখান থেকে অন্য বিষয় শুরু হচ্ছে। পরবর্তী কথার প্রতি লক্ষ করলে প্রথমোক্ত বক্তব্যই সঠিক বলে মনে হয়। কারণ পরবর্তী এই বাক্য ঃ "এটি একটি সাবধান বাণী—ইতিপূর্বে আগত সাবধানবাণীসমূহের মধ্য থেকে' এ বিষয়ের প্রতিই ইংগিত করে যে, পূর্ববর্তী সবগুলো বাক্যই হযরত ইবরাহীম (আ) ও মূসার (আ) সহীফাসমূহে উদ্ধৃত হয়েছে। আর এগুলো সবই পূর্বেকার সাবধান বাণীসমূহের অন্তরভুক্ত।

৪৮. মূল আয়াতে تَتَمَارٰى শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ সন্দেহ পোষণ এবং ঝগড়া করা উভয়টিই। এখানে প্রত্যেক শ্রোতাকে সম্বোধন করা হয়েছে। যে ব্যক্তিই এ বাণী শুনছে তাকেই সম্বোধন করে বলা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহ অস্বীকার করা এবং তা নিয়ে নবী-রসূলদের সাথে ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়ার যে পরিণতি মানবেতিহাস দেখেছে তা সত্ত্বেও কি তুমি সেই নির্বুদ্ধিতার কাজ করবে? অতীত জাতিসমূহও তো এ একই সন্দেহ পোষণ করেছিলো যে, তারা এ পৃথিবীতে যেসব নিয়ামত ভোগ করছে তা একমাত্র আল্লাহর নিয়ামত না তা সরবরাহের কাজে অন্য কেউ শরীক আছে? অথবা এসব কারো সরবরাহকৃত নিয়ামত নয় বরং আপনা থেকেই পাওয়া গিয়েছে। এ সন্দেহের কারণেই তারা নবী-রসূলদের (আ) বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছিল। নবী-রসূলগণ তাদের বলতেন, আল্লাহ এবং এক আল্লহই তোমাদেরকে এসব নিয়ামতের সবগুলো দান করেছেন। তাই তোমাদের উচিত তাঁরই প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া এবং তাঁরই দাসত্ব করা। কিন্তু

তারা একথা মানতো না এবং এ বিষয়টি নিয়েই নবী–রসূলদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হতো। এখন কথা হলো, এসব জাতি তাদের এ সন্দেহ ও বিবাদের কি পরিণাম দেখেছে তাকি তুমি ইতিহাসে দেখতে পাও না? যে সন্দেহ–সংশয় ও বিবাদ অন্যদের জন্য ধ্বংসাত্মক প্রমাণিত হয়েছে তুমিও কি সেই সন্দেহ–সংশয় ও ঝগড়ায় লিপ্ত হবে?

এ ক্ষেত্রে আরো লক্ষ রাখতে হবে যে, আদ, সামূদ এবং নূহের কওমের লোকেরা হযরত ইবরাহীমের (আ) পূর্বে অতিবাহিত হয়েছিলো। এবং লূতের কওম হযরত ইবরাহীমের (আ) সময়েই আযাবে নিপতিত হয়েছিল। তাই এ বাক্যটি যে ইবরাহীমের সহীফার অংশ সে ব্যাপারে কোন অস্পষ্টতা বা জটিলতা নেই।

৪৯. মূল কথাটি হলো هَـٰذَا نَذِيرٌ مِّنَ النُّذُرِ الْأُولَىٰ । এ আয়াতটির ব্যাখ্যায় মুফাস্‌সিরগণের তিনটি মত আছে। এক, نَذِيرٌ অর্থ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। দুই, এর অর্থ কুরআন। তিন, এর অর্থ অতীতের ধ্বংস প্রাপ্ত জাতিসমূহের পরিণতি যা পূর্ববর্তী আয়াতসমূহে বর্ণনা করা হয়েছে। পরবর্তী বিষয়বস্তুর বিচারে আমাদের মতে এ তৃতীয় ব্যাখ্যাই অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

৫০. অর্থাৎ একথা মনে করো না যে, চিন্তা–ভাবনা করার জন্য এখনো অনেক সময় আছে। তাই এসব কথা নিয়ে এখনই গুরুত্ব সহকারে চিন্তা–ভাবনা করার এবং অবিলম্বে এসব মেনে নেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য তাড়াহুড়ার প্রয়োজনটা কি? কিন্তু না; তোমাদের কেউ–ই জানে না তার জন্য জীবনের আর কতটা সময় এখনো আছে। যে কোন সময় তোমাদের যে কোন লোকের মৃত্যু এসে হাজির হতে পারে এবং অকস্মাত কিয়ামতও এসে পড়তে পারে। তাই চূড়ান্ত ফায়সালার মুহূর্তকে দূরে মনে করো না। যে ব্যক্তিই নিজের পরিণাম সম্পর্কে ভেবে দেখতে চায় সে যেন এক মুহূর্তও বিলম্ব না করে নিজেকে সংযত করে। কারণ, প্রতিবার শ্বাস গ্রহণের সাথে সাথে এ সম্ভাবনাও বিদ্যমান যে, দ্বিতীয়বার শ্বাস গ্রহণের আর কোন সুযোগ হয়তো পাওয়া যাবে না।

৫১. অর্থাৎ ফায়সালার সময় যখন এসে পড়বে তখন তোমরা না পারবে তা প্রতিরোধ করতে আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের যেসব উপাস্য আছে তাদের কারো এমন ক্ষমতাও নেই যে তা ঠেকাতে পারে। তা ঠেকালে কেবল মাত্র আল্লাহ তা'আলাই ঠেকাতে পারেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তা ঠেকাবেন না।

৫২. মূল আয়াতে هٰذَا الْحَدِيثُ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে কুরআন মজীদের আকারে যেসব শিক্ষা পেশ করা হচ্ছিলো এর দ্বারা সেই সব শিক্ষাকে বুঝানো হয়েছে। আর বিস্ময় বলতে বুঝানো হয়েছে সেই বিস্ময়কে যা অভিনব ও অবিশ্বাস্য কথা শুনে মানুষ প্রকাশ করে থাকে। আয়াতটির প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বিষয়ের প্রতি আহবান জানাচ্ছেন তা তো এসব কথাই যা তোমরা শুনেছো। তাহলে এগুলোই কি সেই সব কথা যা শুনে তোমরা কান খাড়া করে থাকো এবং বিস্ময়ের সাথে এমনভাবে মুখের দিকে তাকাতে থাকো যেন তোমাদেরকে কোন অদ্ভুত ও অভিনব কথা শুনানো হচ্ছে?

৫৩. অর্থাৎ নিজেদের মূর্খতা ও গোমরাহীর কারণে যেখানে তোমদের কান্না আসা দরকার সেখানে যে সত্য তোমাদের সামনে পেশ করা হচ্ছে তা নিয়ে তোমরা ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করছো।

৫৪. মূল আয়াতে سامدون শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ভাষাবিদগণ এ শব্দটির দু'টি অর্থ বর্ণনা করেছেন। ইবনে আব্বাস, ইকরিমা এবং আবু উবায়দা নাহবীর মতে سمود অর্থ গান বাদ্য করা। মক্কার কাফেররা কুরআনের আওয়াজকে স্তব্ধ করতে ও মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য জোরে জোরে গান বাদ্য শুরু করতো। এখানে সেদিকেই ইংগিত দেয়া হয়েছে। ইবনে আব্বাস ও ইকরিমা এর আরেকটি অর্থ বর্ণনা করেছেন। তা হচ্ছে ঃ

السمود البر طمة وهى رفع الراس تكبرا ، كانوا يمرون على النبى صلى الله عليه وسلم غضابا مبرطمين –

"অহংকার ভরে ঘাড় উঁচু বা বাঁকা করা। মক্কার কাফেররা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ক্রোধে ঘাড় উঁচু করে চলে যেতো।"

রাগেব ইস্পাহানী তার 'মুফরাদাত' গ্রন্থে এ অর্থটিই গ্রহণ করেছেন। এ অর্থ বিবেচনা করে কাতাদা سامدون শব্দের অর্থ করেছেন غافلون এবং সায়ীদ ইবনে জুবাইর অর্থ করেছেন معرضون ।

৫৫. ইমাম আবু হানীফা, ইমাম শাফেয়ী ও অধিকাংশ আলেমের মতে এ আয়াত পাঠ করে সিজদা করা অবশ্য কর্তব্য। ইমাম মালেক এ আয়াত তিলাওয়াত করে যদিও সব–সময় সিজদা করতেন (যেমন কাজী আবু বকর ইবনুল আরাবী আহকামুল কুরআন গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন) কিন্তু এখানে সিজদা করা জরুরী নয় বলে তিনি মত পোষণ করতেন। তাঁর এ মতের ভিত্তি যায়েদ ইবনে সাবেতের এই বর্ণনা যে, "আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে সূরা নাজ্ম পাঠ করলে তিনি সিজদা করেননি।" (বুখারী, মুসলিম, আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, নাসায়ী)। কিন্তু উক্ত হাদীসটি এ আয়াত পাঠ করে সিজদা করার বাধ্যবাধকতা রহিত করে না। কারণ এ ক্ষেত্রে এরূপ সম্ভাবনা বিদ্যমান যে, কোন কারণে নবী (সা) সে সময় সিজদা করেননি কিন্তু পরে করেছেন। এ বিষয়ে অন্য সব রেওয়ায়াত থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় যে, এ আয়াত পাঠ করে সব সময় অবশ্যই সিজদা করা হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), ইবনে আব্বাস (রা) ও মুত্তালিব (রা) ইবনে আবী ওয়াদা'আর সর্বসম্মত বর্ণনাসমূহ হচ্ছে, নবী (সা) সর্বপ্রথম যখন হারাম শরীফে তিলাওয়াত করেন তখন তিনি সিজদা করেছিলেন। সে সময় মুসলমান ও কাফের সবাই তাঁর সাথে সিজদায় পড়ে গিয়েছিলো।" (বুখারী, আহমাদ, নাসায়ী)। ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন যে, "নবী (সা) নামাযে সূরা নাজ্ম তিলাওয়াত করে সিজদা করেছেন এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত সিজদায় থেকেছেন।" (বায়হাকী, ইবনে মারদুইয়া)। সাবুরাতুল জুহানী বলেন ঃ হযরত উমর (রা) ফজরের নামাযে সূরা নাজ্ম পড়ে সিজদা করেছেন এবং তারপর উঠে সূরা যিলযাল পড়ে রুকূ' করেছেন।" (সা'য়ীদ ইবনে মানসুর)। ইমাম মালেক নিজেও মুয়াত্তা গ্রন্থের ما جاء فى سجود القران অনুচ্ছেদে হযরত উমরের এ আমলের বিষয়টি উল্লেখ করেছেন।

আল ক্বামার

৫৪

নামকরণ

সূরার সর্ব প্রথম আয়াতের وَانْشَقَّ الْقَمَرُ বাক্যাংশ থেকে এর নাম গৃহীত হয়েছে। এভাবে নামকরণের তাৎপর্য হচ্ছে এটি সেই সূরা যার মধ্যে القمر শব্দ আছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

এ সূরার মধ্যে চন্দ্র খণ্ডিত হওয়ার উল্লেখ আছে। এ থেকেই এর নাযিলের সময়–কাল চিহ্নিত হয়ে যায়। মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণ এ ব্যাপারে একমত যে, চন্দ্র খণ্ডিত হওয়ার এ ঘটনা হিজরতের প্রায় পাঁচ বছর পূর্বে মক্কায় মিনা নামক স্থানে সংঘটিত হয়েছিলো।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াতের বিরুদ্ধে মক্কার কাফেররা যে হঠকারিতার পন্থা অবলম্বন করে আসছিলো এ সূরায় সে বিষয়ে তাদেরকে সাবধান করে দেয়া হয়েছে। কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার যে খবর রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিচ্ছিলেন তা যে সত্যিই সংঘটিত হতে পারে এবং তার আগমনের সময় যে অত্যন্ত নিকটবর্তী–চন্দ্র খণ্ডিত হওয়ার বিস্ময়কর ঘটনা তার সুস্পষ্ট প্রমাণ। চন্দ্রের মত একটি বিশাল উপগ্রহ তাদের চোখের সামনে বিদীর্ণ হয়েছিলো। তার দু'টি অংশ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি আরেকটি থেকে এত দূরে চলে গিয়েছিলো যে, প্রত্যক্ষদর্শীরা একটি খণ্ডকে পাহাড়ের এক পাশে এবং অপর খণ্ডটিকে অপর পাশে দেখতে পেয়েছিলো। তারপর দু'টি অংশ মুহূর্তের মধ্যে আবার পরস্পর সংযুক্ত হয়েছিলো। বিশ্ব ব্যবস্থা যে অনাদি, চিরস্থায়ী ও অবিনশ্বর নয়, বরং তা ধ্বংস ও ছিন্ন ভিন্ন হতে পারে এটা তার অকাট্য প্রমাণ। বড় বড় তারকা ও গ্রহরাজি ফেটে টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়তে পারে, একটি আরেকটির ওপর আছড়ে পড়তে পারে এবং কিয়ামতের বিস্তারিত বর্ণনা দিতে গিয়ে কুরআনে তার যে চিত্র অংকন করা হয়েছে তার সব কিছুই যে ঘটতে পারে, শুধু তাই নয় বরং এ ঘটনা এ ইংগিতও দিচ্ছিলো যে, বিশ্ব ব্যবস্থা ধ্বংস ও ছিন্নভিন্ন হওয়ার সূচনা হয়ে গিয়েছে এবং কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময় অতি নিকটে এসে পড়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দিকটির প্রতিই মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন ঃ তোমরা দেখো এবং সাক্ষী থাকো। কিন্তু কাফেররা এ ঘটনাকে যাদুর বিস্ময়কর কর্মকাণ্ড বলে আখ্যায়িত করলো এবং তা না মানতে বদ্ধপরিকর রইল। এ হঠকারিতার জন্য তাদেরকে এ সূরায় তিরস্কার করা হয়েছে।

বক্তব্য শুরু করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, এসব লোক যুক্তি তর্কও মানে না, ইতিহাস থেকেও শিক্ষা গ্রহণ করে না, স্পষ্ট নিদর্শনাদি চোখে দেখেও বিশ্বাস করে না। এরা কেবল তখনই মানবে যখন সত্যি সত্যিই কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং এরা কবর থেকে উঠে হাশরের দিনের একচ্ছত্র অধিপতির দিকে ছুটে যেতে থাকবে।

এরপর তাদের সামনে নূহের কওম, আদ, সামূদ, লূতের কওম এবং ফেরাউনের অনুসারীদের অবস্থা সংক্ষেপে বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে, আল্লাহর প্রেরিত রসূলদের সাবধান বাণীসমূহ অমান্য করে এসব জাতি কি ভয়াবহ আযাবে নিপতিত হয়েছিলো। এভাবে এক একটি জাতির কাহিনী বর্ণনা করার পর বারবার বলা হয়েছে যে, কুরআন উপদেশ গ্রহণের সহজ মাধ্যম। এ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে কোন জাতি যদি সঠিক পথ অনুসরণ করে তাহলে এসব কওমের ওপর যে আযাব এসেছে তা তাদের ওপর কখনো আসতে পারে না।

কিন্তু এটা কোন্ ধরনের নির্বুদ্ধিতা যে, এই সহজলভ্য উৎস থেকে উপদেশ গ্রহণ করার পরিবর্তে কেউ গোঁ ধরে থাকবে যে, আযাবে নিপতিত না হওয়া পর্যন্ত মানবে না।

একইভাবে অতীত জাতিসমূহের ইতিহাস থেকে উদাহরণ পেশ করার পর মক্কার কাফেরদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে যে, যে কর্মপন্থা গ্রহণের কারণে অপরাপর জাতিসমূহ সাজা প্রাপ্ত হয়েছে তোমরাও যদি সেই একই কর্মপন্থা গ্রহণ করো তাহলে তোমরাই বা শাস্তি পাবে না কেন? তোমাদের কি আলাদা কোন বৈশিষ্ট আছে যে, তোমাদের সাথে অন্যদের চেয়ে ভিন্ন আচরণ করা হবে? নাকি এই মর্মে ক্ষমার কোন বিশেষ সনদ লিখিতভাবে তোমাদের কাছে এসেছে যে, অন্যদেরকে যে অপরাধে পাকড়াও করা হয়েছে সেই একই অপরাধ করলেও তোমাদের পাকড়াও করা হবে না? আর তোমরা যদি নিজেদের দলীয় বা সংঘবদ্ধ শক্তির কারণে গর্বিত হয়ে থাকো তাহলে তোমাদের এ সংঘবদ্ধ শক্তিকে অচিরেই পরাজিত হয়ে পালাতে দেখা যাবে। সর্বোপরি কিয়ামতের দিন তোমাদের সাথে এর চেয়েও কঠোর আচরণ করা হবে।

সবশেষে কাফেরদের বলা হয়েছে, কিয়ামত সংঘটনের জন্য আল্লাহ তা'আলার বড় কোন প্রস্তুতির প্রয়োজন নেই। তাঁর আদেশ হওয়া মাত্র চোখের পলকে তা সংঘটিত হবে। তবে সব কিছুর মতই বিশ্ব ব্যবস্থা ও মানব জাতির জন্যও একটা "তাকদীর" বা পরিকল্পিত সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ আছে। এই পরিকল্পনা অনুসারে এ কাজের জন্য যে নির্দিষ্ট সময় আছে সে সময়েই তা হবে। এ ক্ষেত্রে কেউ চ্যালেঞ্জ করলো আর অমনি তাকে স্বমতে আনার জন্য কিয়ামত সংঘটিত করে দেয়া হলো এমনটা হতে পারে না। তা সংঘটিত হচ্ছে না দেখে তোমরা যদি বিদ্রোহ করে বসো তাহলে নিজেদের দুষ্কর্মের প্রতিফলই ভোগ করবে। আল্লাহর কাছে তোমাদের সমস্ত কর্মকাণ্ডের ফিরিস্তি প্রস্তুত হচ্ছে। তোমাদের ছোট বড় কোন তৎপরতাই তাতে লিপিবদ্ধ হওয়া থেকে বাদ পড়ছে না।

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ﴿١﴾ وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ ﴿٢﴾ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ ﴿٣﴾

কিয়ামতের সময় নিকটবর্তী হয়েছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে।[১] কিন্তু এসব লোকের অবস্থা হচ্ছে তারা যে নিদর্শনই দেখে, তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে এ তো গতানুগতিক যাদু।[২] এরা (একেও) অস্বীকার করলো এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করলো।[৩] প্রত্যেক বিষয়কে শেষ পর্যন্ত একটা পরিণতি লাভ করতে হয়।[৪]

১. অর্থাৎ যে কিয়ামতের সংঘটিত হওয়ার খবর তোমাদের দিয়ে আসা হচ্ছে তার সময় যে ঘনিয়ে এসেছে এবং বিশ্ব ব্যবস্থা ধ্বংস ও ছিন্ন ভিন্ন হওয়ার সূচনা যে হয়ে গিয়েছে, চাঁদ বিদীর্ণ হওয়াই তার প্রমাণ। তাছাড়া চাঁদের মত একটি বিশাল জ্যোতিষ্কের বিদীর্ণ হয়ে যাওয়ার ঘটনা এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, যে কিয়ামতের কথা তোমাদেরকে বলা হচ্ছে তা সংঘটিত হওয়া সম্ভব। এ কথা সুস্পষ্ট যে, চাঁদ যখন বিদীর্ণ হতে পারে তখন পৃথিবীও বিদীর্ণ হতে পারে, তারকা ও গ্রহরাজির কক্ষপথ ও পরিবর্তিত হতে পারে, উর্ধজগতের গোটা ব্যবস্থাই ধ্বংস ও ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যেতে পারে। এর মধ্যেকার কোনটিই অনাদি, চিরস্থায়ী এবং স্থির ও স্বয়ংসম্পূর্ণ নয় যে, কিয়ামত সংঘটিত হতে পারে না।

কেউ কেউ এ আয়াতাংশের ব্যাখ্যা করেছেন, এভাবে যে, "চাঁদ বিদীর্ণ হবে" আরবী ভাষার বাকরীতি অনুসারে এ অর্থ গ্রহণ সম্ভব হলেও বাক্যের পূর্বাপর প্রসংগের সাথে এ অর্থ একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। প্রথমত এ অর্থ গ্রহণ করলে আয়াতের প্রথম অংশ অর্থহীন হয়ে পড়ে। এ আয়াত নাযিল হওয়ার সময় চাঁদ যদি বিদীর্ণ না হয়ে থাকে বরং ভবিষ্যতে কোন এক সময় বিদীর্ণ হয় তাহলে তার ভিত্তিতে একথা বলা একেবারেই নিরর্থক যে, কিয়ামতের সময় সন্নিকটবর্তী হয়েছে। ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে এমন ঘটনা কিয়ামত সন্নিকটবর্তী হওয়ার প্রমাণ হতে পারে কি করে যে তাকে প্রমাণ হিসেবে পেশ করা যুক্তিযুক্ত হবে? দ্বিতীয়ত এ অর্থ গ্রহণ করার পর যখন আমরা পরবর্তী বাক্য পাঠ করি তখন বুঝা যায় যে, এর সাথে তার কোন মিল নেই। পরবর্তী আয়াত সুস্পষ্টভাবে বলছে যে, লোকেরা সে সময় কোন নিদর্শন দেখেছিলো যা ছিল কিয়ামতের সম্ভাব্যতার স্পষ্ট

প্রমাণ। কিন্তু তারা তাকে যাদুর তেলেসমাতি আখ্যায়িত করে অস্বীকার করেছিলো এবং কিয়ামত সংঘটিত হওয়া সম্ভব নয় বলে নিজেদের বদ্ধমূল ধারণা আঁকড়ে ধরে পড়েছিলো। যদি اِنْشَقَّ الْقَمَرُ কথাটির অর্থ "চাঁদ বিদীর্ণ হয়েছে" গ্রহণ করা হয় তাহলেই কেবল পূর্বাপর প্রসংগের মাঝে তা খাপ খায়। কিন্তু এর অর্থ যদি "বিদীর্ণ হবে" গ্রহণ করা হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে পরবর্তী সব কথাই সামঞ্জস্যহীন হয়ে পড়ে। বক্তব্যের ধারাবাহিকতার মাঝে এ অংশটি জুড়ে দিয়ে দেখুন, আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন যে, একথাটির কারণে গোটা বক্তব্যই অর্থহীন হয়ে পড়েছে।

"কিয়ামতের সময় নিকটবর্তী হয়েছে এবং চাঁদ বিদীর্ণ হবে। কিন্তু এসব লোকের অবস্থা হচ্ছে, তারা যে নিদর্শনই দেখে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এতো গতানুগতিক যাদু। এরা অস্বীকার করলো এবং নিজেদের প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করলো।"

সুতরাং প্রকৃত সত্য এই যে, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা কুরআনের সুস্পষ্ট বক্তব্য থেকেই প্রমাণিত তা কেবল হাদীসের বর্ণনা সমূহের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। তবে হাদীস সমূহের বর্ণনা থেকে এ বিষয়টি সবিস্তারে জানা যায় এবং তা কবে ও কোথায় সংঘটিত হয়েছিলো তাও অবহিত হওয়া যায়। বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, আহমদ, আবু 'উওয়ানা, আবু দাউদ তায়ালেসী, আবদুর রায্যাক, ইবনে জারীর, বায়হাকী, তাবারানী, ইবনে মারদুইয়া ও আবু নু'য়াইম ইস্পাহানী বিপুল সংখ্যক সনদের মাধ্যমে হযরত আলী, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর, হযরত হুযাইফা, হযরত আনাস ইবনে মালেক ও হযরত জুবাইর ইবনে মুত'এম থেকে এসব হাদীস বর্ণনা করেছেন।

এসব সম্মানিত সাহাবা কিরামের মধ্যে তিনজন অর্থাৎ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ, হযরত হুযাইফা ও হযরত জুবাইর ইবনে মুত'এম স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, তাঁরা এ ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। তাছাড়া তাঁদের মধ্যে দু'জন এমন ব্যক্তি আছেন যারা প্রত্যক্ষদর্শী নন। কারণ এটা তাদের মধ্যে একজনের (আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস) জন্মের পূর্বের ঘটনা। আর অপরজন ঘটনার সময় শিশু ছিলেন। কিন্তু তারা উভয়েই যেহেতু সাহাবী। তাই যেসব বয়স্ক সাহাবা এ ঘটনা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন তাঁদের নিকট থেকে শুনেই হয়তো তারা এ ঘটনা বর্ণনা করেছেন।

সমস্ত রেওয়ায়াত একত্রিত করলে এ ঘটনার যে বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় তা হচ্ছে, এটি হিজরতের প্রায় পাঁচ বছর পূর্বের ঘটনা। সেদিন ছিল চান্দ্র মাসের চতুর্দশ রাত্রি। চাঁদ তখন সবে মাত্র উদিত হয়েছিলো। অকস্মাত তা দ্বিখণ্ডিত হলো এবং তার একটি অংশ সম্মুখের পাহাড়ের এক দিকে আর অপর অংশ অপরদিকে পরিদৃষ্ট হলো। এ অবস্থা অল্প কিছু সময় মাত্র স্থিতি পায়। এর পরক্ষণেই উভয় অংশ আবার পরস্পর সংযুক্ত হয়। নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে সময় মিনাতে অবস্থান করছিলেন। তিনি লোকদের বললেন : দেখো এবং সাক্ষী থাকো। কাফেররা বললো : মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ওপর যাদু করেছিলো তাই আমাদের দৃষ্টি ভ্রম ঘটেছিল। অন্যেরা বললো : মুহাম্মাদ আমাদের ওপর যাদু করতে পারে, তাই বলে সমস্ত মানুষকে তো যাদু করতে সক্ষম নয়। বাইরের লোকদের আসতে দাও। আমরা তাদেরকেও জিজ্ঞেস করবো,

তারাও এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছে কি না। বাইরে থেকে কিছু লোক আসলে তারা বললো যে, তারাও এ দৃশ্য দেখেছে।

হযরত আনাস থেকে বর্ণিত কোন কোন রেওয়ায়াতের ভিত্তিতে এরূপ ভুল ধারণার সৃষ্টি হয় যে, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার ঘটনা একবার নয়, দুইবার সংঘটিত হয়েছিলো। কিন্তু প্রথমত সাহাবীদের মধ্যে আর কেউ এ কথা বর্ণনা করেননি। দ্বিতীয়ত হযরত আনাসের কোন কোন রেওয়ায়াতে (مَرَّتَيْنِ) দুইবার কথাটি উল্লেখিত হয়েছে এবং কোন কোনটিতে فِرْقَتَيْنِ বা شِقَّتَيْنِ (দুই খণ্ড) শব্দ উল্লেখিত হয়েছে। তৃতীয়ত, কুরআন মজীদে শুধু একবার খণ্ডিত হওয়ার কথা উল্লেখিত হয়েছে। এ দিক দিয়ে সঠিক কথা এটিই যে এ ঘটনা শুধু একবারই সংঘটিত হয়েছিলো।

এ সম্পর্কে সমাজে কিছু কিচ্ছাকাহিনীও প্রচলিত আছে। ওগুলোতে বলা হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আঙুল দিয়ে চাঁদের দিকে ইশারা করলেন আর তা দ্বি-খণ্ডিত হয়ে গেল। তাছাড়া চাঁদের একাট অংশ নবীর (সা) জামার গলদেশ দিয়ে প্রবেশ করে হাতার মধ্য দিয়ে বেরিয়ে গেল। এসব একেবারেই ভিত্তিহীন কল্পকাহিনী।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, এ ঘটনার সত্যিকার ধরন ও প্রকৃতি কি ছিল? এটা কি কোন মু'জিযা ছিল যা মক্কার কাফেরদের দাবীর প্রেক্ষিতে রিসালাতের প্রমাণ হিসেবে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেখিয়েছিলেন ? নাকি এটা কোন দুর্ঘটনা ছিল যা আল্লাহর কুদরত বা অসীম ক্ষমতায় চাঁদের বুকে সংঘটিত হয়েছিল এবং রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেদিকে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন শুধু এই জন্য যে, তা কিয়ামতের সম্ভাব্যতাও সন্নিকটবর্তী হওয়ার একটি নিদর্শন। মুসলিম মনীষীদের একটি বিরাট গোষ্ঠী এ ঘটনাকে নবীর (সা) মু'জিযা হিসেবে গণ্য করেন। তাঁদের ধারণা অনুসারে মক্কার কাফেরদের দাবীর কারণে এ মু'জিযা দেখানো হয়েছিলো। কিন্তু হযরত আনাস বর্ণিত হাদীসসমূহের দু'য়েকটির ওপর ভিত্তি করেই এ অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। তিনি ছাড়া অন্য আর কোন সাহাবীই এ কথা বর্ণনা করেননি। ইবনে হাজার তাঁর ফাতহুল বারী গ্রন্থে বলেছেন ঃ "যতগুলো সূত্রে এ ঘটনার বর্ণনা দেয়া হয়েছে তার মধ্যে হযরত আনাস বর্ণিত হাদীস ছাড়া আর কোথাও এ কথা আমার চোখে পড়েনি যে, মুশরিকদের দাবীর কারণে চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত হওয়ার ঘটনা ঘটেছিল।" بَابُ انْشِقَاقِ الْقَمَرِ । আবু নুয়াইম ইস্পাহানী "দালায়েলুন নবুওয়াত" গ্রন্থে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস থেকেও একই বিষয়ে একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। কিন্তু তার সনদ দুর্বল। মজবুত সনদে হাদীস গ্রন্থসমূহে যতগুলো হাদীস হযরত ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত হয়েছে তার কোনটিতেই একথার উল্লেখ নেই। তাছাড়া হযরত আনাস ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস উভয়ই এ ঘটনার সম সাময়িক ছিলেন না। অপর দিকে যেসব সাহাবাকিরাম সে সময় বর্তমান ছিলেন— যেমন ঃ হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা), হযরত হুযাইফা (রা), হযরত জুবাইর (রা) ইবনে মুত'এম, হযরত আলী (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর-তাঁদের কেউ-ই এ কথা বলেননি যে, মক্কার মুশরিকরা নবীর (সা) নবুওয়াতের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে কোন নির্দশনের দাবী করেছিলো এবং সে কারণেই তাদেরকে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হওয়ার এ মু'জিযা দেখানো হয়েছিলো। সব চেয়ে বড় কথা, কুরআন মজীদ এ ঘটনাকে মুহাম্মাদের (সা) রিসালাতের নিদর্শন হিসেবে পেশ

করছে না, বরং কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার নিদর্শন হিসেবে পেশ করছে। তবে নবী (সা) লোকদেরকে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার যে খবর দিয়েছিলেন এ ঘটনা তার সত্যতা প্রমাণ করছিলো। সুতরাং এদিক দিয়ে এ ঘটনা অবশ্যই তাঁর নবুওয়াতেরও সত্যতার স্পষ্ট প্রমাণ ছিল।

বিরুদ্ধবাদীরা এ ক্ষেত্রে দুই ধরনের আপত্তি উত্থাপন করে থাকে। প্রথমত, তাদের মতে এরূপ ঘটা আদৌ সম্ভব নয় যে, চাঁদের মত বিশালায়তন একটি উপগ্রহ বিদীর্ণ হয়ে দুই খণ্ড হয়ে যাবে এবং খণ্ড দু'টি পরস্পর শত সহস্র মাইল দূরত্বে চলে যাওয়ার পর আবার পরস্পর সংযুক্ত হবে। দ্বিতীয়ত, তারা বলে, এ ঘটনা যদি ঘটেই থাকে তাহলে তা দুনিয়াময় প্রচার হয়ে যেতো, ইতিহাসে তার উল্লেখ দেখা যেতো এবং জ্যোতিষ-শাস্ত্রের গ্রন্থসমূহে তার বর্ণনা থাকতো। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ দু'টি আপত্তি গুরুত্বহীন। চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার সম্ভাব্যতার প্রশ্নে বলা যায়, তা সম্ভব নয় একথা প্রাচীন কালে হয়তো বা গ্রহণযোগ্য হতে পারতো। কিন্তু গ্রহ-উপগ্রহসমূহের গঠন প্রকৃতি সম্পর্কে বর্তমানে মানুষ যে জ্ঞান ও তথ্য লাভ করেছে তার ভিত্তিতে একটি গ্রহ তার আভ্যন্তরীণ অগ্ন্যুৎপাতের কারণে বিদীর্ণ হতে পারে। এ ভয়ানক বিস্ফোরণের ফলে তা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পরস্পর বহুদূরে চলে যেতে পারে এবং তার কেন্দ্রের চৌম্বক শক্তির কারণে পুনরায় পরস্পর সংযুক্ত হতে পারে। এটা সম্পূর্ণরূপে সম্ভব। এরপর দ্বিতীয় আপত্তির গুরুত্বহীন হওয়া সম্পর্কে বলা যায়, এ ঘটনা অকস্মাৎ এক মুহূর্তের জন্য সংঘটিত হয়েছিল। সে বিশেষ মুহূর্তে সারা পৃথিবীর দৃষ্টি চাঁদের দিকে নিবদ্ধ থাকবে এটা জরুরী নয়। সে মুহূর্তে বিস্ফোরণের কোন শব্দ হয়নি যে, সেদিকে মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে। এ উদ্দেশ্যে পূর্বাহ্নেই কোন ঘোষণা দেয়া হয়নি যে লোকজন তার অপেক্ষায় আকাশের দিকে চেয়ে থাকবে। ভূ-পৃষ্ঠের সর্বত্র তা দৃষ্টিগোচর হওয়াও সম্ভব ছিল না। সে সময় শুধু আরব ও তার পূর্বাঞ্চল সন্নিহিত দেশ সমূহেই চন্দ্র উদিত হয়েছিল। সে সময় ইতিহাস চর্চার রুচি ও প্রবণতা ছিল না এবং স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবেও সে সময় তা এতটা উন্নত ছিল না যে, পূর্বাঞ্চলীয় দেশসমূহের যেসব লোক তা দেখেছিলো তারা তা লিপিবদ্ধ করে নিতো, কোন ঐতিহাসিকের কাছে এসব প্রমাণাদি সংগৃহীত থাকতো এবং কোন গ্রন্থে সে তা লিপিবদ্ধ করতো। তা সত্ত্বেও মালাবারের ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, সেরাতে সেখানকার একজন রাজা এ দৃশ্য দেখেছিলেন। জ্যোতিষ শাস্ত্রীয় গ্রন্থাদি ও পঞ্জিকাসমূহে এ ঘটনার উল্লেখ কেবল তখনই থাকা জরুরী হতো যদি এর দ্বারা চন্দ্রের গতি, তার পরিক্রমণের পথ এবং উদয়াস্তের সময়ে কোন পরিবর্তন সূচিত হতো। কিন্তু তা যেহেতু হয়নি, তাই প্রাচীনকালের জ্যোতির্বিদদের দৃষ্টিও এদিকে আকৃষ্ট হয়নি। সে যুগের মানমন্দিরসমূহও এতটা উন্নত ছিল না যে, নভোমণ্ডলে সংঘটিত প্রতিটি ঘটনাই তারা পর্যবেক্ষণ ও রেকর্ডভুক্ত করতে পারতেন।

২. মূল ইবারতে سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রাতদিন একের পর এক যে যাদু চালিয়ে যাচ্ছেন, নাউযুবিল্লাহ—এটিও তার একটি। দুই, এটা পাকা যাদু। অত্যন্ত নিপুণভাবে এটি দেখানো হয়েছে। তিন, অন্য সব যাদু যেভাবে অতীত হয়ে গিয়েছে এটিও সেভাবে অতীত হয়ে যাবে, এর দীর্ঘস্থায়ী কোন প্রভাব পড়বে না।

وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ ④ حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ⑤ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ ⑥ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ ⑦ مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ⑧

এসব লোকদের কাছে (পূর্ববর্তী জাতি সমূহের) সেসব পরিণতির খবর অবশ্যই এসেছে যার মধ্যে অবাধ্যতা থেকে নিবৃত্ত রাখার মত যথেষ্ট শিক্ষনীয় বিষয় আছে। আরো আছে এমন যুক্তি যা নসীহতের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ মাত্রায় পূরণ করে। কিন্তু সাবধানবাণী তাদের জন্য ফলপ্রদ হয় না। অতএব হে নবী, এদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও।[৫] যেদিন আহবানকারী একটি অত্যন্ত অপছন্দনীয়[৬] জিনিসের দিকে আহবান জানাবে, লোকেরা ভীত বিহবল দৃষ্টি নিয়ে[৭] নিজ নিজ কবর থেকে[৮] এমনভাবে উঠে আসবে যেন তারা বিক্ষিপ্ত পতঙ্গরাজি। তারা আহবানকারীর দিকে দৌড়িয়ে যেতে থাকবে। আর সেসব অস্বীকারকারী (যারা দুনিয়াতে তা অস্বীকার করতো) সে সময় বলবে, এ তো বড় কঠিন দিন।

৩. অর্থাৎ কিয়ামত বিশ্বাস না করার যে সিদ্ধান্ত তারা নিয়ে রেখেছে এ নিদর্শন দেখার পরও তারা সেটিকেই আঁকড়ে ধরে আছে। কিয়ামতকে বিশ্বাস করা যেহেতু তাদের প্রবৃত্তির আকাংখার পরিপন্থী ছিল, তাই সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখার পরও এরা তা মেনে নিতে রাজী হয়নি।

৪. এর অর্থ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমাদের ন্যায় ও সত্যের দিকে আহবান জানাতে থাকবেন আর তোমরা হঠকারিতা করে নিজেদের বাতিল মত ও পথের ওপর অবিচল থাকবে, এ অবস্থা অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত চলতে পারে না। তাঁর ন্যায় ও সত্যপন্থী হওয়া এবং তোমাদের বাতিল পন্থী হওয়া কখনো প্রমাণিত হবে না, তা হতে পারে না। সব কিছুই শেষ পর্যন্ত একটা পরিণতি লাভ করে। অনুরূপভাবে তোমাদের ও মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সংঘাত চলছে তারও একটি অনিবার্য পরিণাম আছে। তাকে অবশ্যই সে পরিণাম লাভ করতে হবে। এমন একটি সময় অবশ্যই আসতে হবে যখন প্রকাশ্যে প্রমাণিত হবে যে, তিনি ন্যায় ও সত্যের পথে ছিলেন আর তোমরা বাতিলের অনুসরণ করছিলে। অনুরূপভাবে যারা ন্যায় ও সত্যপন্থী, তারা ন্যায় ও সত্যপন্থা অনুসরণের এবং যারা বাতিল পন্থী, তারা বাতিল পন্থা অনুসরণের ফলও একদিন অবশ্যই লাভ করবে।

৫. অন্য কথায় এদের আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও। আখেরাত অস্বীকৃতির পরিণাম ও ফলাফল কি এবং অপরাপর জাতিসমূহ নবী-রসূলদের কথা না মানার যে দৃষ্টান্তমূলক

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ ﴿٩﴾ فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ﴿١٠﴾ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَمِرٍ ﴿١١﴾ وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾

এদের পূর্বে নূহের (আ) জাতিও অস্বীকার করেছে।[৯] তারা আমার বান্দাকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যায়িত করেছে, এবং বলেছে, এ লোকটি পাগল। উপরন্তু তাকে তীব্রভাবে তিরস্কারও করা হয়েছে।[১০] অবশেষে সে তার রবকে উদ্দেশ্য করে বললো; আমি পরাভূত হয়েছি, এখন তুমি এদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করো। তখন আমি আসমানের দরজাসমূহ খুলে দিয়ে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষণ করলাম এবং যমীন বিদীর্ণ করে ঝর্ণাধারায় রূপান্তরিত করলাম।[১১] এ পানির সবটাই সেই কাজ পূর্ণ করার জন্য সংগৃহীত হলো যা আগে থেকেই সুনির্দিষ্ট ছিল।

শাস্তি ভোগ করেছে তা যখন এদেরকে অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য পন্থায় বুঝানো হয়েছে এবং মানবেতিহাস থেকে উদাহরণ পেশ করে বলে দেয়া হয়েছে, তারপরও এরা যদি হঠকারিতা পরিহার না করে তাহলে তাদেরকে এ বোকার স্বর্গেই বাস করতে দাও। এরপর এরা কেবল তখনই তোমার কথা মেনে নেবে যখন মৃত্যুর পর কবর থেকে উঠে নিজের চোখে দেখবে, কিয়ামত শুরু হয়ে গিয়েছে। তখন স্বচক্ষেই দেখতে পাবে যে, যে কিয়ামত সম্পর্কে তাদেরকে আগে ভাগেই সাবধান করে দিয়ে সঠিক পথ অনুসরণের পরামর্শ দেয়া হতো তা যথারীতি শুরু হয়ে গেছে।

৬. আরেকটি অর্থ অজানা–অচেনা জিনিসও হতে পারে। অর্থাৎ এমন জিনিস যা কখনো তাদের কল্পনায়ও স্থান পায়নি, যার কোন চিত্র বা ধারণা তাদের মগজে ছিল না, কোন সময় এ ধরনের কোন কিছুর মুখোমুখি হতে হবে সে অনুমানও তারা করতে পারেনি।

৭. মূল শব্দ হচ্ছে خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ অর্থাৎ তাদের দৃষ্টি আনত থাকবে। এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে। এক, ভীতি ও আতঙ্ক তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। দুই, তাদের মধ্যে লজ্জা ও অপমানবোধ জাগ্রত হবে এবং চেহারায় তার বহির্প্রকাশ ঘটবে। কারণ, কবর থেকে বেরিয়ে আসামাত্র তারা বুঝতে পারবে যে, এটিই সে পরকালীন জীবন যা আমরা অস্বীকার করতাম। যে জীবনের জন্য আমরা কোন প্রস্তুতি গ্রহণ করে আসিনি এবং যে জীবনে এখন আমাদেরকে অপরাধী হিসেবে আল্লাহর সামনে হাজির হতে হবে। তিন, তারা হতবুদ্ধি হয়ে তাদের চোখের সামনে বিদ্যমান সে ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে থাকবে। তা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নেয়ার হুঁশও তাদের থাকবে না।

৮. কবর বলতে শুধুমাত্র সেসব কবরই বুঝানো হয়নি মাটি খুঁড়ে যার মধ্যে কাউকে যথারীতি দাফন করা হয়েছে। বরং এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে, যেখানেই কোন ব্যক্তি মৃত্যু

আর নূহকে (আ) আমি কাষ্ঠফলক ও পেরেক সম্বলিত[১২] বাহনে আরোহন করিয়ে দিলাম যা আমার তত্ত্বাবধানে চলছিলো। এ ছিলো সে ব্যক্তির জন্য প্রতিশোধ যাকে অস্বীকার ও অবমাননা করা হয়েছিলো।[১৩] সে নৌকাকে আমি একটি নিদর্শন বানিয়ে দিয়েছি।[১৪] এমতাবস্থায় উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছ কি? দেখো, কেমন ছিল আমার আযাব আর কেমন ছিল আমার সাবধান বাণী। আমি এ কুরআনকে উপদেশ লাভের সহজ উৎস বানিয়ে দিয়েছি।[১৫] এমতাবস্থায় উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছ কি?

বরণ করেছে কিংবা যেখানেই তার দেহ পড়েছিল হাশরের ময়দানের দিকে আহবানকারীর একটি আওয়াজ শুনেই সে সেখান থেকে উঠে দাঁড়াবে।

৯. অর্থাৎ অখেরাত সংঘটিত হবে যেখানে মানুষকে তার কাজ কর্মের হিসেব দিতে হবে এ কথাটাই তারা অবিশ্বাস করেছে, যে নবী তাঁর জাতিকে এ সত্য সম্পর্কে অবহিত করে আসছিলো সে নবীকেও অস্বীকার করেছে, আখেরাতের জিজ্ঞাসাবাদে সফলকাম হওয়ার জন্য মানুষকে কিরূপ আকীদা বিশ্বাস পোষণ করতে হবে, কি ধরনের কাজ করতে হবে এবং কোন্ জিনিস পরিহার করে চলতে হবে এসব সম্পর্কে নবী যা শিক্ষা দিতেন তাও তারা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছে।

১০ অর্থাৎ এ লোকেরা নবীকে অস্বীকার ও অমান্যই শুধু করেনি, তাঁকে পাগল বলে আখ্যায়িত করেছে, তাঁকে হুমকি ও ভীতি প্রদর্শন করেছে, তাঁর প্রতি অভিশাপ ও তিরস্কার বর্ষণ করেছে, হুমকি-ধমকি ও ভয়ভীতি দেখিয়ে সত্য প্রচার থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেছে এবং তাঁর জীবন ধারণ অসম্ভব করে তুলেছে।

১১. অর্থাৎ আল্লাহর নির্দেশে ভূ-পৃষ্ঠ ফেটে এমনভাবে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত হতে থাকলো, যেন তা ভূ-পৃষ্ঠ নয়, অসংখ্য ঝর্ণাধারা।

১২. অর্থাৎ প্লাবন আসার পূর্বেই আল্লাহর নির্দেশে হযরত নূহ (আ) যে জাহাজ নির্মাণ করেছিলেন।

১৩. মূল ইবারত হচ্ছে جَزَاءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ অর্থাৎ এসব করা হয়েছে সে ব্যক্তির কারণে প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে যাকে অবমাননা ও অসম্মান করা হয়েছিল। كفر শব্দটিকে যদি অস্বীকৃতি অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহলে অর্থ হবে "যার কথা মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানানো হয়েছিল। আর যদি নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা বা অস্বীকৃতি অর্থে গ্রহণ

করা হয় তাহলে তার অর্থ হয়" যার সত্তা ছিল একটি নিয়ামত স্বরূপ তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা ও অস্বীকৃতির আচরণ করা হয়েছিল।

১৪. এ অর্থও হতে পারে যে, আমরা এ আযাবকে শিক্ষণীয় নির্দশন বানিয়ে দিয়েছি। কিন্তু আমাদের মতে সর্বাধিক অগ্রাধিকার যোগ্য অর্থ হচ্ছে, সে জাহাজকে শিক্ষনীয় নিদর্শন বানিয়ে দেয়া হয়েছে। একটি সুউচ্চ পর্বতের ওপরে তার অস্তিত্ব টিকে থাকা হাজার হাজার বছর ধরে মানুষকে আল্লাহর গযব সম্পর্কে সাবধান করে আসছে। তাদেরকে স্বরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, এ ভূ-খণ্ডে আল্লাহর নাফরমানদের জন্য কি দুর্ভাগ্য নেমে এসেছিল এবং ঈমান গ্রহণকারীদের কিভাবে রক্ষা করা হয়েছিল। ইমাম বুখারী, ইবনে আবী হাতেম, আবদুর রায্যাক ও ইবনে জারীর কাতাদা থেকে যেসব হাদীস বর্ণনা করেছেন তা থেকে জানা যায় যে, মুসলমানদের ইরাক ও আল-জাযিরা বিজয়ের যুগে এ জাহাজ জুদী পাহাড়ের ওপর (অন্য একটি রেওয়ায়াত অনুসারে "বা-কিরদা" নামক জনপদের সন্নিকটে) বর্তমান ছিল এবং প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ তা দেখেছিলেন। বর্তমান যুগেও বিমান ভ্রমণের সময় কেউ কেউ এ এলাকার একটি পর্বত শীর্ষে জাহাজের মত বস্তু পড়ে থাকতে দেখেছেন। সেটিকে নূহের জাহাজ বলে সন্দেহ করা হয়। আর এ কারণেই তা অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে মাঝে মধ্যে অভিযাত্রী দল অভিযান পরিচালনা করে আসছে। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা-৪৭, হূদ, টীকা-৪৬; আল আনকাবূত, টীকা-২৫)

১৫. কেউ কেউ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ কথাটির ভুল অর্থ গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ কুরআন একখানা সহজ গ্রন্থ। এ গ্রন্থ বুঝার জন্য কোন জ্ঞানের প্রয়োজন নেই। এমনকি আরবী ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ ছাড়াই যে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করলে এর তাফসীর করতে পারে এবং হাদীস ও ফিকাহর সাহায্য ছাড়াই কুরআনের আয়াত থেকে যে কোন আইন ও বিধান উদ্ভাবন করতে পারে। অথচ পূর্বাপর যে প্রসংগে একথাটি বলা হয়েছে সে দিকে লক্ষ রেখে বিবেচনা করলে বুঝা যায়, একথাটির উদ্দেশ্য মানুষকে এ বিষয়টি উপলব্ধি করানো যে, উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের একটি উৎস হচ্ছে বিদ্রোহী জাতিসমূহের ওপর নাযিল হওয়া দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং আরেকটি উৎস হলো এ কুরআন যা যুক্তি প্রমাণ ও ওয়াজ নসীহতের মাধ্যমে তোমাদেরকে সরল সহজ পথ দেখিয়ে দিচ্ছে। প্রথমোক্ত উৎসের তুলনায় নসীহতের এ উৎস অধিক সহজ। এতদসত্ত্বেও কেন তোমরা এ থেকে কল্যাণ লাভ করছো না এবং আযাব দেখার জন্যই গোঁ ধরে আছ? এটা সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর মেহেরবানী যে, তিনি তাঁর নবীর মাধ্যমে এ কিতাব পাঠিয়ে তোমাদের সাবধান করে দিচ্ছেন যে তোমরা যে পথে চলছো তা চূড়ান্ত ধ্বংসের দিকে নিয়ে যায়। তাছাড়া তোমাদের কল্যাণ কোন্ পথে তাও বলে দেয়া হয়েছে। নসীহতের এ পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে এজন্য যাতে ধ্বংসের গহবরে পতিত হওয়ার আগেই তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করা যায়। সহজভাবে বুঝানোর পরও যে ব্যক্তি মানে না এবং গর্তের মধ্যে পতিত হওয়ার পরই কেবল স্বীকার করে যে, এটি সত্যিই গর্ত তার চেয়ে নির্বোধ আর কে আছে?

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ﴿١٨﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِىْ يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾ تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنْقَعِرٍ ﴿٢٠﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ﴿٢١﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٢٢﴾

আদ জাতি অস্বীকার করেছিলো। দেখো, কেমন ছিল আমার আযাব এবং কেমন ছিল আমার সাবধানবাণী। আমি এক বিরামহীন অশুভ দিনে১৬ তাদের ওপর প্রচণ্ড ঝড়ো বাতাস পাঠালাম যা তাদেরকে উপরে উঠিয়ে এমনভাবে ছুঁড়ে ফেলছিলো যেন তারা সমূলে উৎপাটিত খেজুর বৃক্ষের কাণ্ড। দেখো, কেমন ছিল আমার আযাব এবং কেমন ছিল আমার সাবধানবাণী। আমরা এ কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের সহজ উৎস বানিয়ে দিয়েছি। অতপর উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছ কি?

১৬. অর্থাৎ এমন একটি দিন যার দুর্যোগ ও দুর্ভোগ একাধারে কয়েকদিন ধরে চলেছিল। সূরা حٰم السجده এর ১৬ আয়াতে فِى اَيَّامٍ نَّحِسَاتٍ কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং সূরা الحاقة আল হাক্কার ৭ আয়াতে বলা হয়েছে যে, এই ঝঞ্চা বাত্যা একাধারে সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত চলেছিল। সাধারণভাবে প্রসিদ্ধ কথা হলো, এ আযাব যেদিন শুরু হয়েছিল সেদিন ছিল বুধবার। এ কারণে মানুষের মধ্যে এ ধারণা ছড়িয়ে পড়েছে যে, বুধবার দিনটি হচ্ছে অশুভ। তাই এ দিনে কোন কাজ শুরু করা উচিত নয়। এ বিষয়ে কিছু যয়ীফ হাদীসও উদ্ধৃত করা হয়েছে যার কারণে এ দিনটির অশুভ হওয়ার বিশ্বাস সাধারণের মনমগজে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে। উদাহরণ হিসেবে ইবনে মারদূইয়া ও খতীব বাগদাদীর বর্ণিত এ হাদীসটিও আছে যে, اخر اربعاء فى الشهر يوم نحس مستمر (মাসের শেষ বুধবার অশুভ, যার অশুভ প্রভাব একাধারে চলতে থাকে। ইবনে জাওযী একে 'মাওযূ' অর্থাৎ জাল ও মনগড়া হাদীস বলেছেন। ইবনে রজব বলেছেন, এ হাদীস সহীহ নয়। হাফেজ সাখাবী বলেন ঃ এ হাদীস যতগুলো সূত্রে বর্ণিত হয়েছে তা সবই একেবারে ভিত্তিহীন। অনুরূপভাবে তাবারানী বর্ণিত এই হাদীস يوم الاربعاء يوم نحس مستمر (বুধবার দিনটি অশুভ দিন যার অকল্যাণ ক্রমাগত চলতে থাকে)। আরো কিছু সংখ্যক হাদীসে একথাও বর্ণিত হয়েছে যে, বুধবার দিন যেন ভ্রমণ না করা হয়, লেনদেন না করা হয়। নখ না কাটানো হয় এবং রোগীর সেবা না করা হয়। কুষ্ঠ ও শ্বেত রোগ এ দিনেই শুরু হয়। কিন্তু এসব হাদীসের সব কটিই যয়ীফ। এর ওপরে কোন আকীদা–বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করা যায় না। বিশেষজ্ঞ মুনাভী বলেন ঃ

توقى الاربعاء على جهة الطيرة وظن اعتقاد المنجمين حرام شديد التحريم ، اذ الايام كلها لله تعالى ، لا تنفع ولا تضر بذاتها –

২য় রুকূ'

সামূদ সাবধান বাণীসমূহ অস্বীকার করলো এবং বলতে লাগলো "এখন কি আমরা আমাদেরই মধ্যকার এক ব্যক্তিকে এককভাবে মেনে চলবো?[১৭] আমরা যদি তার আনুগত্য গ্রহণ করি তাহলে তার অর্থ হবে আমরা বিপথগামী হয়েছি এবং আমাদের বিবেক–বুদ্ধির মাথা খেয়েছি। আমাদের মধ্যে কি একা এই ব্যক্তিই ছিল যার ওপর আল্লাহর যিকর নাযিল করা হয়েছে? না, বরং এ চরম মিথ্যাবাদী ও দাম্ভিক।[১৮] (আমি আমার নবীকে বললাম) কে চরম মিথ্যাবাদী ও দাম্ভিক তা এরা কালকেই জানতে পারবে। আমি উটনীকে তাদের জন্য ফিতনা বানিয়ে পাঠাচ্ছি। এখন একটু ধৈর্য ধরে দেখ, এদের পরিণতি কি হয়।

"অশুভ লক্ষণসূচক মনে করে বুধবারের দিনকে পরিত্যাগ করা এবং এ ক্ষেত্রে জ্যোতিষদের ন্যায় বিশ্বাস পোষণ করা কঠোরভাবে হারাম। কেননা, সব দিনই আল্লাহর। কোন দিনই দিন হিসেবে কল্যাণ বা অকল্যাণ কিছুই সাধন করতে পারে না।"

আল্লামা আলুসী বলেন ঃ "সবদিন সমান। বুধবারের বিশেষ কোন বৈশিষ্ট নেই। রাত ও দিনের মধ্যে এমন কোন মুহূর্ত নেই যা কারো জন্য কল্যাণকর এবং কারো জন্য অকল্যাণকর নয়। আল্লাহ তা'আলা প্রতিটি মুহূর্তেই কারো জন্য অনুকূল এবং কারো জন্য প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি করে থাকেন।"

১৭. অন্য কথায় তিনটি কারণে তারা হযরত সালেহ (আ) এর অনুসরণ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। প্রথম কারণ, তিনি মানুষ, মানব সত্তার উর্ধে নন যে, আমরা তার শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নেব। দ্বিতীয় কারণ, তিনি আমাদের কওমেরই একজন মানুষ। আমাদের ওপর তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কোন কারণ নেই, তৃতীয় কারণ, তিনি একা, এক ব্যক্তি। আমাদের সাধারণ মানুষদেরই একজন। তিনি কোন নেতা নন। তাঁর সাথে কোন বড় দল বা সৈন্য সামন্ত নেই, সেবক সেবিকাও নেই। তাই আমরা তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব মেনে নিতে পারি না। তাদের মতে নবী হবে মানব সত্তার উর্ধে। আর তিনি যদি মানুষ হন তাহলে আমাদের নিজের দেশ ও জাতির মধ্যে জন্মগ্রহণ করবেন না, উপর থেকে নেমে আসবেন অথবা বাইরে

وَنَبِّئْهُمْ اَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۚ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطٰى فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ﴿٣٠﴾ اِنَّاۤ اَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْا كَهَشِيْمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿٣٢﴾

তাদের জানিয়ে দাও, এখন তাদের ও উটনীর মধ্যে পানি ভাগ হবে এবং প্রত্যেকেই তার পালার দিনে পানির জন্য আসবে।”[১৯] শেষ পর্যন্ত তারা নিজেদের লোকটিকে ডাকলো, সে এ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করলো এবং উটনীকে হত্যা করলো[২০] দেখ, কেমন ছিল আমার আযাব আর কেমন ছিল আমার সাবধান বাণীসমূহ। আমি তাদের ওপর একটি মাত্র বিকট শব্দ পাঠালাম এবং তারা খোঁয়াড়ের মালিকের শুষ্ক ও পদদলিত শস্যের মত হয়ে গেল।[২১] আমি এ কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের সহজ উৎস বানিয়ে দিয়েছি। এখন উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

থেকে পাঠানো হবে। তাও যদি না হয় তাহলে অন্তত তিনি হবেন নেতা। তাঁর অস্বাভাবিক শান শওকত ও জাঁকজমক থাকবে। এ কারণে মানুষের পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মনোনীত করেছেন বলে মেনে নেয়া হবে। মক্কার কাফেররাও এই মূর্খতার মধ্যেই নিমজ্জিত ছিল। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষ। সাধারণ লোকদের মতই তিনি বাজারে চলাফেরা করেন। কাল আমাদের মাঝেই তিনি জন্ম গ্রহণ করেছেন এবং আজ দাবী করছেন যে, আল্লাহ আমাকে নবী বানিয়েছেন। মক্কার কাফেররা এ যুক্তির ভিত্তিতেই তাঁর রিসালাত মানতে অস্বীকৃতি জানাচ্ছিলো।

১৮. মূল আয়াতে اشر শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ আত্মগর্বী ও দাম্ভিক ব্যক্তি যার মগজে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছে এবং এ কারণে সে গর্ব প্রকাশ করে থাকে।

১৯. "আমি উটনীকে তাদের জন্য ফিতনা বানিয়ে পাঠাচ্ছি" এটা এ কথার ব্যাখ্যা। ফিতনাটা ছিল এই যে, হঠাৎ একটি উটনী এনে তাদের সামনে পেশ করে তাদেরকে বলে দেয়া হলো যে, একদিন এটি একা পানি পান করবে। অন্যদিন তোমরা সবাই নিজের ও তোমাদের জীব জন্তুর জন্য পানি নিতে পারবে। যেদিন উটনীর পানি পানের পালা সেদিন তোমাদের মধ্য থেকে কোন ব্যক্তি নিজেও কোন ঝর্ণা বা কূপের ধারে পানি নিতে আসবে না এবং তাদের জীবজন্তুকেও পানি পান করানোর জন্য আনবে না। এ চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছিল সে ব্যক্তির পক্ষ থেকে যাঁর সম্পর্কে তারা নিজেরাই বলতো যে, তার না আছে কোন সৈন্য সামন্ত, না আছে কোন বড় দল।

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ ﴿٣٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ ۖ نَجَّيْنَاهُمْ بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾ نِعْمَةً مِنْ عِنْدِنَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ ﴿٣٥﴾ وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٧﴾ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ ﴿٣٨﴾ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٩﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴿٤٠﴾

লূতের কওম সাবধানবাণীসমূহ অস্বীকার করলো। আমি তাদের ওপর পাথর বর্ষণকারী বাতাস পাঠালাম। শুধু লূতের পরিবারের লোকেরা তা থেকে রক্ষা পেল। আমি নিজের অনুগ্রহে তাদেরকে রাতের শেষ প্রহরে বাঁচিয়ে বের করে দিলাম। যারা কৃতজ্ঞ আমি তাদের সবাইকে এভাবে প্রতিদান দিয়ে থাকি। লূত তার কওমের লোকদেরকে আমার শাস্তি সম্পর্কে সাবধান করেছিল। কিন্তু তারা সবগুলো সাবধানবাণী সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করলো এবং কথাচ্ছলেই উড়িয়ে দিল। অতপর তারা তাকে তার মেহমানদের হিফাজত করা থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করলো। শেষ পর্যন্ত আমি তাদের চোখ অন্ধ করে দিলাম। এখন তোমরা আমার আযাব ও সাবধানবাণীর স্বাদ আস্বাদন করো।[২২] খুব ভোরেই একটি অপ্রতিরোধ্য আযাব তাদের ওপর আপতিত হলো। এখন আমার আযাব ও সাবধান বাণীসমূহের স্বাদ আস্বাদন করো। আমি এ কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের সহজ উৎস বানিয়ে দিয়েছি। উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

২০. এ শব্দগুলো থেকে আপনা আপনি একটি পরিস্থিতির আভাস পাওয়া যায়। তাহলো ঐ উটনীটা অনেক দিন পর্যন্ত তাদের জনপদে দৌরাত্ম্য চালিয়েছে। তার পানি পানের নির্দিষ্ট দিনে পানির ধারে কাছে যাওয়ার সাহস কারো হতো না। অবশেষে তারা তাদের কওমের একজন দুঃসাহসী নেতাকে ডেকে বললো ঃ তুমি তো অত্যন্ত সাহসী বীরপুরুষ। কথায় কথায় হাতা গুটিয়ে মারতে ও মরতে প্রস্তুত হয়ে যাও। একটু সাহস করে এ উটনীর ব্যাপারটা চুকিয়ে দাও তো। তাদের উৎসাহ দানের কারণে সে একাজ সমাধা করার দায়িত্ব গ্রহণ করলো এবং উটনীকে মেরে ফেললো। এর পরিষ্কার অর্থ হচ্ছে, উটনীর কারণে তারা অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত ছিল। তারা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, এর পেছনে অস্বাভাবিক কোন শক্তি কাজ করছে। তাই তাকে আঘাত করতে তারা ভয়

وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ﴿٤١﴾ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ ﴿٤٢﴾ أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَٰئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿٤٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ ﴿٤٤﴾ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾

৩ রুকূ'

ফেরাউনের অনুসারীদের কাছেও সাবধান বাণীসমূহ এসেছিল। কিন্তু তারা আমার সবগুলো নিদর্শনকে অস্বীকার করলো। অবশেষে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। যেভাবে কোন মহা-পরাক্রমশালী পাকড়াও করে।

তোমাদের কাফেররা কি ঐসব লোকদের চেয়ে কোন অংশে ভাল ? নাকি আসমানী কিতাবসমূহে তোমাদের জন্য কোন ক্ষমা লিখিত আছে ? না কি এসব লোক বলে, আমরা একটা সংঘবদ্ধ শক্তি। নিজেরাই নিজেদের রক্ষার ব্যবস্থা করবো। অচিরেই এ সংঘবদ্ধ শক্তি পরাজিত হবে। এবং এদের সবাইকে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালাতে দেখা যাবে।২৪

পাচ্ছিল। এ কারণে একটি উটনীকে হত্যা করা, তাদের কাছে একটি অভিযান পরিচালনার চেয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। অথচ উটনীটা পেশ করেছিলেন একজন নবী যার কোন সেনাবাহিনী ছিল না, যার ভয়ে তারা ভীত ছিল। (আরো বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল-আ'রাফ, টীকা-৫৮, আশ্ শূ'আরা, টীকা-১০৪, ১০৫)।

২১. যারা গবাদি পশু পালে তারা পশুর খোঁয়াড়ের সংরক্ষণ ও হিফাজতের জন্য কাঠ ও গাছের ডালপালা দিয়ে বেড়া তৈরী করে দেয়। এ বেড়ার কাঠ ও গাছ-গাছালীর ডালপালা আস্তে আস্তে শুকিয়ে ঝরে পড়ে এবং পশুদের আসা যাওয়ায় পদদলিত হয়ে করাতের গুঁড়ার মত হয়ে যায়। সামূদ জাতির দলিত মথিত লাশসমূহকে করাতের ঐ গুঁড়োর সাথে তুলনা করা হয়েছে।

২২. এ ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা সূরা হূদ (আয়াত ৭৭ থেকে ৮৩) ও সূরা হিজরে (আয়াত ৬১ থেকে ৭৪) পূর্বেই দেয়া হয়েছে। ঘটনার সারসংক্ষেপ হলো, আল্লাহ তা'আলা এ জাতির ওপর আযাব পাঠানোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে কয়েকজন ফেরেশতাকে অত্যন্ত সুদর্শন বালকের আকৃতিতে হযরত লূতের বাড়ীতে মেহমান হিসেবে পাঠিয়ে দিলেন। কওমের লোকজন তাঁর কাছে এত সুশ্রী মেহমান আসতে দেখে তাঁর বাড়ীতে গিয়ে চড়াও হলো এবং তাঁর কাছে দাবী করলো যে, তিনি যেন তাঁর মেহমানদের সাথে কুকর্ম করার জন্য তাদের হাতে তুলে দেন। হযরত লূত এ জঘন্য আচরণ থেকে বিরত থাকার জন্য তাদের কাছে অত্যন্ত কাকুতি-মিনতি ও অনুরোধ-উপরোধ করলেন। কিন্তু তারা তা মানলো না এবং ঘরে প্রবেশ করে জোরপূর্বক মেহমানদের বের করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলো। এ পর্যায়ে হঠাৎ তারা অন্ধ হয়ে গেল। এ

এদের সাথে বুঝাপড়া করার জন্য প্রকৃত প্রতিশ্রুত সময় হচ্ছে কিয়ামত। কিয়ামত অত্যন্ত কঠিন ও অতীব তিক্ত সময়। প্রকৃতপক্ষে এ পাপীরা ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত আছে। এদের বিবেক বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। যেদিন এদেরকে উবুড় করে আগুনের মধ্যে টেনে হেঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে, সেদিন এদের বলা হবে, এখন জাহান্নামের স্পর্শের স্বাদ আস্বাদন করো।

আমি প্রত্যেকটি জিনিসকে একটি পরিমাপ অনুযায়ী সৃষ্টি করেছি।[২৫] আমার নির্দেশ একটি মাত্র নির্দেশ হয়ে থাকে এবং তা চোখের পলকে কার্যকর হয়।[২৬] তোমার মত অনেককেই আমি ধ্বংস করেছি[২৭] আছে কি কোন উপদেশ গ্রহণকারী ? তারা যা করেছে সবই রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ আছে এবং প্রতিটি ছোট ও বড় বিষয়ই লিখিতভাবে বিদ্যমান আছে।[২৮]

আল্লাহর নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষাকারীরা নিশ্চিতরূপে বাগান ও ঝর্ণাসমূহের মধ্যে অবস্থান করবে, সত্যিকার মর্যাদার স্থানে মহা শক্তিধর সম্রাটের সান্নিধ্যে।

সময় ফেরেশতারা হযরত লূতকে বললেন, তিনি ও তাঁর পরিবারের লোকজন ভোর হওয়ার পূর্বেই যেন এ জনপদের বাইরে চলে যান। তারা জনপদের বাইরে চলে যাওয়া মাত্র ঐ জাতির ওপর এক ভয়ানক আযাব নেমে আসে। বাইবেলেও ঘটনাটি এভাবেই বর্ণিত হয়েছে। বাইবেলের ভাষা হচ্ছে ঃ তখন তাহারা লোটের উপরে ভারী চড়াও হইয়া কবাট ভাংগিতে গেল। তখন সেই দুই ব্যক্তি হস্ত বাড়াইয়া লোটকে গৃহের মধ্যে আপনাদের নিকটে টানিয়া লইয়া কবাট বন্ধ করিলেন ; এবং গৃহদ্বারের নিকটবর্তী ক্ষুদ্র ও মহান সকল লোককে অন্ধতায় আহত করিলেন। তাহাতে তাহারা দ্বার খূঁজিতে খূঁজিতে পরিশ্রান্ত হইল।-(আদি পুস্তক, ১৯ ঃ ৯-১১)

২৩. কুরাইশদের সম্বোধন করা হয়েছে। এর অর্থ, তোমাদের মধ্যে এমন কি গুণ আছে এবং এমন কি মূল্যবান বৈশিষ্ট আছে যে, যে ধরনের কুফরী, সত্য প্রত্যাখ্যান ও হঠকারিতার আচরণের জন্য অন্যান্য জাতিসমূহকে শাস্তি দেয়া হয়েছে তোমরা সে একই নীতি ও আচরণ গ্রহণ করলেও তোমাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে না?

২৪. এটা একটা সুস্পষ্ট ভবিষ্যতবাণী। হিজরতের পাঁচ বছর পূর্বে এ ভবিষ্যৎবাণী করা হয়েছিল। এতে বলা হয়েছিল, কুরাইশদের সংঘবদ্ধ শক্তি যে শক্তি নিয়ে তাদের গর্ব ছিল অচিরেই মুসলমানদের কাছে পরাজিত হবে। সে সময় কেউ কল্পনাও করতে পারতো না যে, অদূর ভবিষ্যতে কিভাবে এ বিপ্লব সাধিত হবে। সে সময় মুসলমানরা এমন অসহায় অবস্থার মধ্যে নিপতিত ছিল যে, তাদের একটি দল দেশ ছেড়ে হাবশায় আশ্রয় নিয়েছিল এবং অবশিষ্ট মুসলমানগণ আবু তালেব গিরি গুহায় অবরুদ্ধ ছিল। কুরাইশদের বয়কট ও অবরোধ ক্ষুধায় তাদেরকে মৃতপ্রায় করে দিয়েছিল। এরূপ পরিস্থিতিতে কে কল্পনা করতে পারতো যে, মাত্র সাত বছরের মধ্যেই অবস্থা পাল্টে যাবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের ছাত্র ইকরিমা বর্ণনা করেন যে, হযরত 'উমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বলতেন, যে সময় সূরা ক্বামারের এ আয়াত নাযিল হয় তখন আমি অস্থির হয়ে পড়েছিলাম যে, এটা কোন্ সংঘবদ্ধ শক্তি যা পরাজিত হবে? কিন্তু বদর যুদ্ধে যখন কাফেররা পরাজিত হয়ে পালাচ্ছিল সে সময় আমি দেখতে পেলাম রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ম পরিহিত অবস্থায় সামনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন এবং তাঁর পবিত্র জবান থেকে উচ্চারিত হচ্ছে سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ তখন আমি বুঝতে পারলাম এ পরাজয়ের খবরই দেয়া হয়েছিল (ইবনে জারীর ইবনে আবী হাতেম)।

২৫. অর্থাৎ দুনিয়ার কোন জিনিসই উদ্দেশ্য ও লক্ষহীনভাবে সৃষ্টি করা হয়নি। বরং প্রত্যেক বস্তুরই একটা পরিমিতি ও অনুপাত আছে। সে অনুসারে প্রত্যেক বস্তু একটা নির্দিষ্ট সময় অস্তিত্ব লাভ করে, একটি বিশেষ রূপ ও আকৃতি গ্রহণ করে। একটি বিশেষ সীমা পর্যন্ত প্রবৃদ্ধি ও ক্রমবিকাশ লাভ করে, একটি নির্দিষ্ট সময়কাল পর্যন্ত টিকে থাকে এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। এ বিশ্বজনীন নিয়ম–নীতি অনুসারে এ দুনিয়াটারও একটা 'তাকদীর' বা পরিমিতি ও অনুপাত আছে। সে অনুযায়ী একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তা চলছে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়েই তার পরিসমাপ্তি ঘটতে হবে। এর পরিসমাপ্তির জন্য যে সময় নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে তার এক মুহূর্ত পূর্বে এর পরিসমাপ্তি ঘটবে না কিংবা এক মুহূর্ত পরে তা অবশিষ্টও থাকবে না। এ পৃথিবী অনাদি ও চিরস্থায়ী নয় যে, চিরদিনই তা আছে এবং চিরদিন থাকবে। কিংবা কোন শিশুর খেলনাও নয় যে, যখনই তোমরা চাইবে তখনই তিনি এটাকে ধ্বংস করে দেখিয়ে দেবেন।

২৬. অর্থাৎ কিয়ামত সংগঠনের জন্য আমাকে কোন বড় প্রস্তুতি নিতে হবে না কিংবা তা সংঘটিত করতে কোন দীর্ঘ সময়ও ব্যয়িত হবে না। আমার পক্ষ থেকে একটি নির্দেশ জারী হওয়ার সময়টুকু মাত্র লাগবে। নির্দেশ জারী হওয়া মাত্রই চোখের পলকে তা সংঘটিত হয়ে যাবে।

২৭. অর্থাৎ তোমরা যদি মনে করে থাক যে, এ বিশ্ব কোন মহাজ্ঞানী ও ন্যায়বান আল্লাহর কর্তৃত্বের অধীন নয়, বরং এটা মগের মুল্লুক যেখানে মানুষ যা ইচ্ছা তাই করতে পারে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করার কেউ নেই—তাহলে তোমাদের চোখ খুলে দেয়ার জন্য

মানবেতিহাসেই বিদ্যমান। এখানে এ নীতি অনুসারী জাতিসমূহকে একের পর এক ধ্বংস করা হয়েছে।

২৮. অর্থাৎ এ লোকেরা যেন একথা ভেবে বিভ্রান্ত না হয় যে, তাদের সম্পাদিত কাজ–কর্ম বুঝি কোথাও উধাও হয়ে গিয়েছে। না, প্রত্যেক ব্যক্তি, প্রত্যেক গোষ্ঠী এবং প্রত্যেক জাতির গোটা রেকর্ডই সংরক্ষিত আছে। যথা সময়ে তা সামনে এসে হাজির হবে।

আর রাহমান

৫৫

নামকরণ

প্রথম শব্দটিকেই এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। এভাবে বুঝানো হয়েছে যে, এটি সেই সূরা যা "আর–রাহমান" শব্দ দিয়ে শুরু হয়েছে। তাছাড়া সূরার বিষয়বস্তুর সাথেও এ নামের গভীর মিল রয়েছে। কারণ এ সূরার মধ্যে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার রহমতের পরিচায়ক গুণাবলী ও তার বাস্তব ফলাফলের উল্লেখ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

তাফসীর বিশারদগণ সাধারণতঃ এ সূরাটিকে মক্কী সূরা বলে আখ্যায়িত করেন। যদিও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, ইকরিমা ও কাতাদা থেকে কোন কোন হাদীসে একথা উদ্ধৃত হয়েছে যে, এ সূরা মদীনায় অবতীর্ণ তা সত্ত্বেও প্রথমত ঐ সব সম্মানিত সাহাবা থেকে আরো কিছু সংখ্যক হাদীসে বিপরীত বক্তব্যও উদ্ধৃত হয়েছে। দ্বিতীয়ত, এ সূরার বিষয়বস্তু মদীনায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের তুলনায় মক্কায় অবতীর্ণ সূরাসমূহের সাথে বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ।এমন কি বিষয়বস্তুর বিচারে এটি মক্কী যুগেরও একেবারে প্রথম দিকের বলে মনে হয়। তাছাড়া বেশ কিছু নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকে একথা প্রমাণিত হয় যে, এটি হিজরতের কয়েক বছর পূর্বে মক্কাতে নাযিল হয়েছিল। মুসনাদে আহমদে হযরত আসমা বিনতে আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা বর্ণনা করেছেন ঃ কা'বা ঘরের যে কোণে হাজরে আসওয়াদ স্থাপিত আমি হারাম শরীফের মধ্যে সে কোণের দিকে মুখ করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামায পড়তে দেখেছি। তখনও পর্যন্ত আল্লাহর নির্দেশ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ (তোমাকে যে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে প্রকাশ্যে তা বলে দাও) নাযিল হয়নি। সে নামাযে মুশরিকরা তাঁর মুখ থেকে فَبِاَىِّ اٰلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ কথাটি শুনেছিল। এ থেকে জানা যায় যে, এ সূরাটি সূরা আল হিজ্‌রের পূর্বেই নাযিল হয়েছিল।

আল বায্‌যার, ইবনে জারীর, ইবনুল মুনযির, দারুকুতনী (ফিল আফরাদ), ইবনে মারদুইয়া এবং আল খাতীব (ফিত তারীখ) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর থেকে এ হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন যে, একবার রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে সূরা আর রাহমান তিলাওয়াত করলেন অথবা এ সূরাটি তাঁর সামনে পাঠ করা হলো। পরে তিনি লোকদের বললেন ঃ জিনরা তাদের রবকে যে জওয়াব দিয়েছিল তোমাদের নিকট থেকে সে রকম সুন্দর জওয়াব শুনছি না কেন? লোকেরা বললো, সে জওয়াব কি

ছিল! নবী (সা) বললেন ঃ যখনই আমি আল্লাহর বাণী فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ পড়ছিলাম, জিনরা তার জবাবে বলছিল لَا بِشَيْءٍ مِّنْ نِعْمَةِ رَبِّنَا نُكَذِّبُ আমরা আমাদের রবের কোন নিয়ামতকেই অস্বীকার করি না।"

তিরমিযী, হাকেম ও হাফেজ আবু বকর বাযযার হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ থেকে প্রায় অনুরূপ বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁদের বর্ণনার ভাষা হচ্ছে ঃ সূরা রাহমানের তিলাওয়াত শুনে লোকজন যখন চুপ করে থাকলো তখন নবী (সা) বললেন ঃ

لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا احسن مردودا منكم ، كنت كلما اتيت على قوله فبای الاء ربكما تكذبان قالوا لابشیء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد -

" যে রাতে কুরআন শোনার জন্য জিনরা একত্রিত হয়েছিল, সে রাতে আমি জিনদের এ সূরা শুনিয়েছিলাম। তারা তোমাদের চেয়ে এর উত্তম জওয়াব দিচ্ছিল। যখনই আমি আল্লাহ তা'আলার এ বাণী শুনাচ্ছিলাম হে জিন ও মানুষ তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে অস্বীকার করবে" তখনই তারা জওয়াবে বলছিল ঃ হে আমাদের রব, আমরা তোমার কোন নিয়ামতকেই অস্বীকার করি না। সব প্রশংসা কেবল তোমারই।"

এ হাদীস থেকে জানা যায়, সূরা আহকাফে (২৯ থেকে ৩২ আয়াত) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে জিনদের কুরআন শোনার যে ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে সেই সময় নবী (সা) নামাযে সূরা আর রাহমান পাঠ করছিলেন। এটা নবুওয়াতের ১০ম বছরের ঘটনা। সে সময় নবী (সা) তায়েফ সফর থেকে ফেরার পথে "নাখলা" নামক স্থানে কিছু সময় অবস্থান করেছিলেন। যদিও অপর কিছু সংখ্যক হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে যে, সে সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানা ছিল না যে, জিনেরা তাঁর নিকট থেকে কুরআন শরীফ শুনছে। বরং পরে আল্লাহ তা'আলা তাঁকে এ কথা অবহিত করেছিলেন যে, জিনেরা তাঁর কুরআন তিলাওয়াত শুনছিলো কিন্তু আল্লাহ তা'আলা নবীকে (সা) যেভাবে জিনদের কুরআন তিলাওয়াত শোনা সম্পর্কে অবহিত করেছিলেন অনুরূপভাবে তাঁকে একথাও জানিয়েছিলেন যে, কুরআন তিলাওয়াত শোনার সময় তারা তার কি জওয়াব দিচ্ছিল। এরূপ হওয়াটা অযৌক্তিক ব্যাপার নয়।

এসব বর্ণনা থেকে শুধু এতটুকুই জানা যায় যে, সূরা আর রাহমান সূরা আল হিজ্‌র ও সূরা আহকাফের পূর্বে নাযিল হয়েছিল। এসব ছাড়া আমরা আরো একটি হাদীস দেখতে পাই যা থেকে জানা যায়, সূরা আর রাহমান মক্কী যুগের প্রথম দিকে অবতীর্ণ সূরা সমূহের একটি। ইবনে ইসহাক হযরত 'উরওয়া ইবনে যুবায়ের থেকে এই মর্মে একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন যে, সাহাবা কিরাম একদিন পরস্পর আলোচনা করলেন কুরাইশরা তো প্রকাশ্যে কখনো কাউকে উচ্চস্বরে কুরআন তিলাওয়াত করতে শুনেনি। আমাদের মধ্যে এমন কে আছে যে একবার অন্তত তাদেরকে এ পবিত্র বাণী শোনাতে পারে? হযরত

আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বললেন ঃ আমি এ কাজ করবো। সাহাবা কিরাম বললেন ঃ তারা তোমার ওপর জুলুম করবে বলে আমাদের আশংকা হয়। আমাদের মতে, একাজ এমন কোন ব্যক্তির করা উচিত যার জ্ঞাতি–গোষ্ঠী শক্তিশালী। কুরাইশরা যদি তার অনিষ্ট করার উদ্দেশ্যে হাত বাড়ায় তাহলে তার গোষ্ঠীর লোকেরা যেন তার সাহায্যে এগিয়ে আসে। হযরত আবদুল্লাহ বললেন, আমাকেই একাজ করতে দাও আল্লাহ আমার হিফাজতকারী পরে বেশ কিছু বেলা হলে তিনি হারাম শরীফে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কুরাইশ নেতারা সেই সময় নিজ নিজ মজলিসে বসেছিল। হযরত আবদুল্লাহ মাকামে ইবরাহীমে পৌঁছে উচ্চস্বরে সূরা আর রাহমান তিলাওয়াত করতে শুরু করলেন। আবদুল্লাহ কি বলছে কুরাইশরা প্রথমে তা বুঝার চেষ্টা করলো। পরে যখন তারা বুঝতে পারলো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বাণী হিসেবে যেসব কথা পেশ করেন এটা সে কথা তখন তারা তার ওপরে ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং তার মুখের ওপর চপেটাঘাত করতে লাগলো। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ কোন পরোয়াই করলেন না। যতক্ষণ তাঁর সাধ্যে কুলালো ততক্ষণ তিনি তাদের কুরআন শুনিয়ে যেতে থাকলেন। পরিশেষে তিনি তাঁর ফুলে উঠা মুখ নিয়ে ফিরে আসলে সংগী–সাথীরা বললো ঃ আমরা এ আশংকাই করেছিলাম। জবাবে তিনি বললেন ঃ আল্লাহর এ দুশমনরা আমার কাছে আজকের চেয়ে অধিক গুরুত্বহীন আর কখনো ছিল না। তোমরা চাইলে আমি আগামীকাল আবার তাদেরকে কুরআন শোনাবো। সবাই বললো এ–ই যথেষ্ট হয়েছে। যা তারা আদৌ শুনতে চাইতো না তা তো তুমি শুনিয়ে দিয়েছো (সীরাতে ইবনে হিশাম, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা–৩৩৬)।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এটাই কুরআন মজীদের একমাত্র সূরা যার মধ্যে মানুষের সাথে পৃথিবীর অপর একটি স্বাধীন সৃষ্টি জিনদেরকেও সরাসরি সম্বোধন করা হয়েছে এবং উভয়কেই আল্লাহর কুদরতের পরিপূর্ণতা, তাঁর সীমা–সংখ্যাহীন দয়া ও অনুগ্রহ, তাঁর সামনে তাদের অক্ষমতা ও অসহায়ত্ব এবং তাঁর কাছে তাদের জবাবদিহির উপলব্ধি জাগ্রত করে তাঁর অবাধ্যতার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সাবধান করে দেয়া হয়েছে আর আনুগত্যের উত্তম ফলাফল সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। যদিও পবিত্র কুরআনের কয়েকটি স্থানে এ বিষয়ে পরিষ্কার বক্তব্য রয়েছে যা থেকে স্পষ্ট জানা যায় যে, জিনরাও মানুষের মত স্বাধীন ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পন্ন দায়িত্বশীল সৃষ্টি, যাদেরকে কুফরী ও ঈমান গ্রহণের এবং আনুগত্য করার ও অবাধ্য হওয়ার স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যেও মানুষের মতই কাফের ও ঈমানদার এবং অনুগত ও অবাধ্য আছে। তাদের মধ্যেও এমন গোষ্ঠী আছে যারা নবী–রসূল আলাইহিমুস সালাম ও আসমানী কিতাবসমূহের ওপর ঈমান এনেছে। তবে এ সূরা অকাট্যভাবে প্রমাণ করে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও কুরআন মজীদের দাওয়াত জিন ও মানুষ উভয়ের জন্য এবং নবীর (সা) রিসালাত শুধু মানবজাতি পর্যন্ত সীমাবদ্ধ নয়।

সূরার শুরুতে মানুষকে লক্ষ করেই সম্বোধন করা হয়েছে। কারণ তারাই পৃথিবীর খিলাফত লাভ করেছে, তাদের মধ্যেই আল্লাহর রসূল এসেছেন এবং তাদের ভাষাতেই

আল্লাহর কিতাব নাযিল করা হয়েছে। কিন্তু পরে ১৩ আয়াত থেকে মানুষ ও জিন উভয়কেই সমানভাবে সম্বোধন করা হয়েছে এবং উভয়ের সামনে একই দাওয়াত পেশ করা হয়েছে।

সূরার বিষয়বস্তু ছোট ছোট বাক্যে একটি বিশেষ ক্রমানুসারে বর্ণিত হয়েছে ঃ

১ থেকে ৪ পর্যন্ত আয়াতে বলা হয়েছে, এ কুরআনের শিক্ষা আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে এসেছে। এ শিক্ষার সাহায্যে তিনি মানব জাতির হিদায়াতের ব্যবস্থা করবেন এই তাঁর রহমতের স্বাভাবিক দাবী। কারণ বুদ্ধি বিবেচনা ও বোধশক্তি সম্পন্ন জীব হিসেবে তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।

৫ ও ৬ আয়াতে বলা হয়েছে যে, গোটা বিশ্ব–জাহানের ব্যবস্থাপনা আল্লাহ তা'আলার একক নির্দেশ ও কর্তৃত্বাধীনে চলছে। আসমান ও যমীনের সব কিছুই তার কর্তৃত্বাধীন। এখানে দ্বিতীয় আর কারো কর্তৃত্ব চলছে না।

৭ থেকে ৯ আয়াতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য বর্ণনা করা হয়েছে তা হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব–জাহানের গোটা ব্যবস্থাকে পূর্ণ ভারসাম্য ও সামঞ্জস্যসহ ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ ব্যবস্থাপনার প্রকৃতি দাবী করে যে, এখানে অবস্থানকারীরাও তাদের ক্ষমতা ও স্বাধীনতার সীমার মধ্যে সত্যিকার ভারসাম্য ও ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকুক এবং ভারসাম্য বিনষ্ট না করুক।

১০ থেকে ২৫ আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার অসীম ক্ষমতার বিস্ময়কর দিক ও তার পূর্ণতা বর্ণনা করার সাথে সাথে জিন ও মানুষ তাঁর যেসব নিয়ামত ভোগ করছে সে দিকেও ইংগিত দেয়া হয়েছে।

২৬ থেকে ৩০ পর্যন্ত আয়াতে জিন ও মানব জাতিকে এ মহাসত্য স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে যে, এই বিশ্ব–জাহানে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ–ই অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী নয় এবং ছোট বড় কেউ–ই এমন নেই যে তার অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনে আল্লাহর মুখাপেক্ষী নয়। যমীন থেকে আসমান পর্যন্ত রাতদিন যা কিছু ঘটছে তা তাঁরই কর্তৃত্বে সংঘটিত হচ্ছে।

৩১ থেকে ৩৬ আয়াতে এ উভয় গোষ্ঠীকেই এই বলে সাবধান করে দেয়া হয়েছে যে, সে সময় অচিরেই আসবে যখন তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এ জিজ্ঞাসাবাদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে তোমরা কোথাও যেতে পারবে না। সবখানে আল্লাহর কর্তৃত্ব তোমাদের পরিবেষ্টন করে আছে। তার মধ্য থেকে বেরিয়ে সটকে পড়ার সাধ্য তোমাদের নেই। তাঁর কর্তৃত্বের গণ্ডি থেকে পালিয়ে যেতে পারবে বলে যদি তোমাদের মধ্যে অহমিকা সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে একবার পালিয়ে দেখ।

৩৭ ও ৩৮ আয়াতে বলা হয়েছে যে, এ জিজ্ঞাসাবাদ হবে কিয়ামতের দিন।

যেসব মানুষ ও জিন দুনিয়ায় আল্লাহ তা'আলার নাফরমানী করতো ৩৯ থেকে ৪৫ পর্যন্ত আয়াতে তাদের পরিণাম সম্পর্কে বলা হয়েছে।

যেসব সৎকর্মশীল মানুষ ও জিন পৃথিবীতে আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করেছে এবং একদিন আল্লাহর সামনে হাজির হয়ে নিজের সব কাজের হিসেব দিতে হবে এ

উপলব্ধি নিয়ে কাজ করেছে আখেরাতে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যেসব পুরস্কার দিবেন, ৪৬ আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত সে সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা দেয়া হয়েছে।

এ বক্তব্যের পুরোটাই বক্তৃতার ভাষায় পেশ করা হয়েছে। এটা একটা আবেগময় ও উচ্চমানের ভাষণ। এ ভাষণের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার অসীম শক্তির এক একটি বিস্ময়কর দিক, তাঁর দেয়া নিয়ামতসমূহের এক একটি নিয়ামত, তাঁর সার্বভৌম ক্ষমতা ও পরাক্রমের এক একটি দিক এবং তাঁর পুরস্কার ও শাস্তির ব্যাপক বিস্তৃত ক্ষেত্রসমূহের এক একটি জিনিস বর্ণনা করে জিন ও মানুষকে বার বার প্রশ্ন করা হয়েছে : فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ । آلاء যে একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ তা আমরা পরে আলোচনা করবো। এ ভাষণের মধ্যে এ শব্দটিকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে। জিন ও মানুষের উদ্দেশ্যে এ প্রশ্ন প্রত্যেক ক্ষেত্রে স্থান কাল ও পাত্র ভেদে একটি বিশেষ অর্থ বহন করছে।

اَلرَّحْمٰنُ ﴿١﴾ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ﴿٢﴾ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ﴿٣﴾ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ﴿٤﴾ اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴿٥﴾ وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ ﴿٦﴾ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيْزَانَ ﴿٧﴾ اَلَّا تَطْغَوْا فِى الْمِيْزَانِ ﴿٨﴾ وَاَقِيْمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيْزَانَ ﴿٩﴾

পরম দয়ালু (আল্লাহ) এ কুরআনের শিক্ষা দিয়েছেন।[১] তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন[২] এবং তাকে কথা শিখিয়েছেন।[৩]

সূর্য ও চন্দ্র একটি হিসেবের অনুসরণ করছে[৪] এবং তারকারাজি[৫] ও গাছপালা সব সিজদাবনত।[৬] আসমানকে তিনিই সুউচ্চ করেছেন এবং দাড়িপাল্লা কায়েম করেছেন।[৭] এর দাবী হলো তোমরা দাড়িপাল্লায় বিশৃংখলা সৃষ্টি করো না। ইনসাফের সাথে সঠিকভাবে ওজন করো এবং ওজনে কম দিও না।[৮]

১. অর্থাৎ এ কুরআনের শিক্ষা কোন মানুষের রচিত বা তৈরী নয়, বরং পরম দয়ালু আল্লাহ নিজে এর শিক্ষা দাতা। আল্লাহ তা'আলা কুরআনের এ শিক্ষা কাকে দিয়েছেন এখানে সে কথা বলার প্রয়োজন ছিল না। কেননা, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকেই মানুষ তা শুনছিলো। তাই অবস্থার দাবী অনুসারে আপনা থেকেই একথার প্রতিপাদ্য এই প্রকাশ পাচ্ছিল যে, এ শিক্ষা দেয়া হয়েছিল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে।

এ বাক্য দিয়ে সূচনা করার প্রথম উদ্দেশ্যই হচ্ছে একথা বলে দেয়া যে, নবী (সা) নিজে এর রচয়িতা নন, এ শিক্ষা দানকারী স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। তাছাড়া আরো একটি উদ্দেশ্য আছে। 'রাহমান' শব্দটি সে দিকেই ইংগিত করছে। এটা নবীর (সা) রচিত কোন শিক্ষা নয়, বরং আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে শুধু এতটুকু কথা বলার প্রয়োজন হলে আল্লাহ তা'আলার 'যাত' বা মূল নাম ব্যবহার না করে গুণবাচক নাম ব্যবহারের কোন প্রয়োজন ছিলনা। তাছাড়া একান্তই গুণবাচক নাম ব্যবহার করার প্রয়োজন হলে শুধু এ বিষয়টি প্রকাশের জন্য আল্লাহর পবিত্র নামসমূহের মধ্য থেকে যে কোন একটি নাম গ্রহণ করা

যেতে পারতো। কিন্তু যখন আল্লাহ, স্রষ্টা, বা রিযিকদাতা এ শিক্ষা দিয়েছেন বলার পরিবর্তে 'রাহমান' এ শিক্ষা দিয়েছেন বলা হয়েছে তখন আপনা থেকেই এ বিষয় প্রকাশ পায় যে, বান্দাদের হিদায়াতের জন্য কুরআন মজীদ নাযিল করা সরাসরি আল্লাহর রহমত। যেহেতু তিনি তাঁর সৃষ্টির প্রতি অতীব দয়াবান; তাই তিনি তোমাদেরকে অন্ধকারে হাতড়িয়ে মরার জন্য ছেড়ে দেয়া পছন্দ করেননি। তিনি তাঁর রহমতের দাবী অনুসারে এ কুরআন পাঠিয়ে তোমাদেরকে এমন জ্ঞান দান করেছেন যার ওপরে পার্থিব জীবনে তোমাদের সত্যানুসরণ এবং আখেরাতের জীবনের সফলতা নির্ভরশীল।

২. অন্য কথায় আল্লাহ তা'আলা যেহেতু মানুষের স্রষ্টা, তাই স্রষ্টার দায়িত্ব হচ্ছে নিজের সৃষ্টিকে পথ প্রদর্শন করা এবং যে পথের মাধ্যমে সে তার সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করতে সক্ষম হবে সে পথ দেখানো। সুতরাং আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআনের এ শিক্ষা নাযিল হওয়া শুধু তাঁর অনুগ্রহ পরায়ণতার দাবীই নয়, তাঁর স্রষ্টা হওয়ারও অনিবার্য এবং স্বাভাবিক দাবী। স্রষ্টা যদি সৃষ্টিকে পথ প্রদর্শন না করেন তাহলে আর কে তা করবে? তাছাড়া স্রষ্টা নিজেই যদি পথ প্রদর্শন না করেন তাহলে আর কে তা করতে পারে? স্রষ্টা যে বস্তু সৃষ্টি করলেন তিনি যদি তাকে সৃষ্টির উদ্দেশ্য পূরণ করার পন্থা–পদ্ধতি না শেখান তাহলে তাঁর জন্য এর চেয়ে বড় ত্রুটি আর কি হতে পারে? সুতরাং প্রকৃত পক্ষে আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে মানুষকে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হওয়া কোন আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয়। বরং তাঁর পক্ষ থেকে যদি এ ব্যবস্থা না থাকতো তাহলে সেটাই হতো বিস্ময়কর ব্যাপার। গোটা সৃষ্টিলোকে যে জিনিসই তিনি সৃষ্টি করেছেন তা কেবল সৃষ্টি করেই ছেড়ে দেননি। তাকে এমন উপযুক্ত আকার–আকৃতি দিয়েছেন যার সাহায্যে সে প্রাকৃতিক ব্যবস্থার অধীনে তার নিজের অংশের কাজ করার যোগ্য হতে পারে। সাথে সাথে সে কাজ সম্পাদন করার পন্থা পদ্ধতিও তাকে শিখিয়েছেন। মানুষের নিজের দেহের এক একটি লোম এবং এক একটি কোষকে (Cell) মানবদেহে যে কাজ আঞ্জাম দিতে হবে সে কাজ শিখেই তা জন্ম লাভ করেছে। তাই মানুষ নিজে কেমন করে তার স্রষ্টার শিক্ষা ও পথ নির্দেশ লাভ করা থেকে মুক্ত ও বঞ্চিত হতে পারে? এ বিষয়টি কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভঙ্গিতে বুঝানো হয়েছে। সূরা লায়লে (১২ আয়াত) বলা হয়েছে إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ "পথ প্রদর্শন করা আমার দায়িত্ব।" সূরা নাহ্‌লে (৯ আয়াত) বলা হয়েছে : وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ সরল সোজা পথ দেখিয়ে দেয়া আল্লাহর দায়িত্ব। বাঁকা পথের সংখ্যা তো অনেক। সূরা ত্বা–হায় (৪৭–৫০ আয়াত) উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফেরাউন মূসার মুখে রিসালাতের পয়গাম শুনে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলো : তোমার সেই 'রব' কে যে আমার কাছে দূত পাঠায়? জবাবে হযরত মূসা বললেন :

رَبُّنَا الَّذِيٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى –

"তিনিই আমার রব যিনি প্রতিটি জিনিসকে একটি নির্দিষ্ট আকার–আকৃতি দান করে পথ প্রদর্শন করেছেন।"

অর্থাৎ তিনি তাকে সেই নিয়ম–পদ্ধতি শিখিয়েছেন যার সাহায্যে সে বস্তু জগতে তার করণীয় কাজ সম্পাদন করতে পারবে। মানুষকে শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার পক্ষ

থেকে নবী–রসূল ও আসমানী কিতাবসমূহ আসা যে সরাসরি প্রকৃতিরই দাবী, একজন নিরপেক্ষ মন–মগজের অধিকারী মানুষ এসব যুক্তি প্রমাণ দেখে সে বিষয়ে নিশ্চিত ও সন্তুষ্ট হতে পারে।

৩. মূল আয়াতে بيان শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর একটি অর্থ হচ্ছে মনের ভাব প্রকাশ করা। অর্থাৎ কোন কিছু বলা এবং নিজের উদ্দেশ্য ও অভিপ্রায় ব্যক্ত করা। দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে পার্থক্য ও বৈশিষ্ট স্পষ্ট করে তোলা। এখানে এর অর্থ হচ্ছে ভাল মন্দ ও কল্যাণ–অকল্যাণের মধ্যকার পার্থক্য। এ দু'টি অর্থ অনুসারে ক্ষুদ্র এ আয়াতাংশটি ওপরে বর্ণিত যুক্তি প্রমাণকে পূর্ণতা দান করে। বাকশক্তি এমন একটি বিশিষ্ট গুণ যা মানুষকে জীবজন্তু ও পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্টিকূল থেকে পৃথক করে দেয়। এটা শুধু বাকশক্তিই নয়। এর পেছনে জ্ঞান ও বুদ্ধি, ধারণা ও অনুভূতি, বিবেক ও সংকল্প এবং অন্যান্য মানসিক শক্তি কার্যকর থাকে যেগুলো ছাড়া মানুষের বাকশক্তি কাজ করতে পারে না। এজন্য বাকশক্তি প্রকৃতপক্ষে মানুষের জ্ঞানী ও স্বাধীন সৃষ্টজীব হওয়ার স্পষ্ট প্রমাণ। আর আল্লাহ তা'আলা এ বিশেষ গুণটি যখন মানুষকে দান করেছেন তখন এটাও স্পষ্ট যে, জ্ঞান ও অনুভূতি এবং ইখতিয়ারবিহীন সৃষ্টিকূলের পথ প্রদর্শনের জন্য শিক্ষার যে প্রকৃতি ও পদ্ধতি উপযুক্ত হতে পারে মানুষের শিক্ষার প্রকৃতি ও পদ্ধতি তা হতে পারে না। একইভাবে মানুষের আরেকটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ গুণ হলো আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে একটি নৈতিক অনুভূতি (Moral sense) সৃষ্টি করে দিয়েছেন যার কারণে সে প্রকৃতিগতভাবেই ভাল ও মন্দ, ন্যায় ও অন্যায়, জুলুম ও ইনসাফ এবং উচিত ও অনুচিতের মধ্যে পার্থক্য করে এবং চরম গোমরাহী ও অজ্ঞতার মধ্যেও তার ভিতরের এ আত্মজ্ঞান ও অনুভূতি লোপ পায় না। এ দু'টি বিশেষ বৈশিষ্টের অনিবার্য দাবী হচ্ছে মানুষের জ্ঞানালোক সমৃদ্ধ ও স্বাধীন জীবনের জন্য শিক্ষাদানের পন্থা ও পদ্ধতি জন্মগতভাবে লব্ধ শিক্ষা পদ্ধতি— যার সাহায্যে মাছকে সাঁতার কাটা, পাখীকে উড়ে বেড়ানো এবং মানুষের নিজ দেহের মধ্যে চোখের পাতাকে পলক ফেলা, চোখকে দেখা, কানকে শোনা এবং পাকস্থলীকে হজম করা শেখানো হয়েছে—থেকে ভিন্ন হতে হবে। জীবনের এ ক্ষেত্রে মানুষ নিজেও শিক্ষক, বই পুস্তক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রচার–প্রোপাগাণ্ডা ও ধর্মীয় শিক্ষা, লেখা, বক্তৃতা, বিতর্ক ও যুক্তি প্রমাণের মত উপায় উপকরণকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে স্বীকার করে এবং শুধু জন্মগতভাবে লব্ধ জ্ঞানকে যথেষ্ট মনে করে না। তাহলে মানুষের স্রষ্টার ওপরে তাদের পথ প্রদর্শনের যে দায়িত্ব বর্তায় তা সম্পাদন করার জন্য যখন তিনি রসূল ও কিতাবকে শিক্ষাদানের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেন তখন তা বিস্ময়ের ব্যাপার হবে কেন? সৃষ্টি যেমন হবে তার শিক্ষাও তেমন হবে এটা একটা সহজ যুক্তিগ্রাহ্য কথা। بيان যে সৃষ্টিকে শেখানো হয়েছে তার জন্য 'কুরআন'ই হতে পারে শিক্ষার উপযুক্ত মাধ্যম। যেসব সৃষ্টিকে 'বায়ান' শেখানো হয়নি তাদের উপযোগী শিক্ষা মাধ্যম 'বায়ান' শেখানো হয়েছে এমন সৃষ্টির জন্য উপযোগী হতে পারে না।

৪. অর্থাৎ এসব বিরাট বিরাট গ্রহ উপগ্রহ একটা অত্যন্ত শক্তিশালী নিয়মবিধি ও অপরিবর্তনীয় শৃংখলার বাঁধনে আবদ্ধ। মানুষ সময়, দিন, তারিখ এবং ফসলাদি ও

মওসূমের হিসেব করতে সক্ষম হচ্ছে এ কারণে যে, সূর্যের উদয়াস্ত ও বিভিন্ন রাশি অতিক্রমের যে নিয়ম কানুন নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে তাতে কোন সময়ই কোন পরিবর্তন হয় না। পৃথিবীতে অসংখ্য জীব–জন্তু বেঁচেই আছে এ কারণে যে, চন্দ্র ও সূর্যকে ঠিকমত হিসেব করে পৃথিবী থেকে একটি বিশেষ দূরত্বে স্থাপন করা হয়েছে এবং একটি সঠিক মাপ জোকের মাধ্যমে বিশেষ শৃংখলার সাথে এ দূরত্বের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে। কোন হিসেব নিকেশ ও মাপজোক ছাড়াই যদি পৃথিবী থেকে এদের দূরত্বের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটতো তাহলে কারো পক্ষেই এখানে বেঁচে থাকা সম্ভব হতো না। অনুরূপভাবে পৃথিবীর চারদিকে চন্দ্র ও সূর্যের গতি বিধিতে এমন পূর্ণ ভারসাম্য কায়েম করা হয়েছে যে, চন্দ্র একটি বিশ্বজনীন পঞ্জিকায় রূপান্তরিত হয়েছে যা অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রতিরাতে সমগ্র বিশ্বকে চান্দ্র মাসের তারিখ নির্দেশ করে দেয়।

৫. মূল আয়াতে النجم শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর সর্বজন বিদিত ও সহজ বোধগম্য অর্থ তারকা। কিন্তু আরবী ভাষায় এ শব্দটি দ্বারা এমন সব লতাগুল্ম ও লতিয়ে উঠা গাছকে বুঝানো হয় যার কোন কাণ্ড হয় না। যেমন ঃ শাক–সবজি, খরমুজ, তরমুজ ইত্যাদি। এখানে এ শব্দটি কোন্ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সে বিষয়ে মুফাসসিরদের মধ্যে মতভেদ আছে। ইবনে আব্বাস, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, সুদ্দী ও সুফিয়ান সাওরীর মতে এর অর্থ কাণ্ডহীন উদ্ভিদরাজি। কেননা এর পরেই الشجر (বৃক্ষ) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে যার সাথে এ অর্থ বেশী সামঞ্জস্যপূর্ণ। অপর দিকে মুজাহিদ, কাতাদা ও হাসান বাসরীর মতে এখানেও 'নাজ্‌ম' অর্থ পৃথিবীর লতাগুল্ম নয়, বরং আকাশের তারকা। কারণ এটাই এর সহজ বোধগম্য ও সর্বজন বিদিত অর্থ। এ শব্দটি শোনার সাথে সাথে মানুষের মন–মগজে এ অর্থটিই জেগে ওঠে এবং সূর্য ও চন্দ্রের উল্লেখের পর তারকাসমূহের উল্লেখ করাই সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। মুফাসসির ও অনুবাদকদের অধিকাংশই যদিও প্রথম অর্থকেই অগ্রাধিকার দিয়েছেন। একে ভ্রান্ত বলা যায় না। কিন্তু তা সত্ত্বেও হাফেজ ইবনে কাসীরের এ মতটি সঠিক যে, ভাষা ও বিষয়বস্তু উভয় বিচারেই দ্বিতীয় অর্থটিই অধিক অগ্রগণ্যতা পাওয়ার যোগ্য বলে মনে হয়। কুরআন মজিদের অন্য একটি স্থানেও তারকা ও বৃক্ষরাজির সিজদাবনত হওয়ার উল্লেখ আছে এবং সেখানে نجوم শব্দটি তারকা ছাড়া অন্য কোন অর্থ গ্রহণ করা যেতে পারে না। আয়াতটি হচ্ছে ঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يَسْجُدُ لَهٗ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِى الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابُّ وَكَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ ....

..................(الحج:١٨)

এখানে সূর্য ও চন্দ্রের সাথে نجوم শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে এবং شجر শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে পাহাড় ও জীবজন্তুর সাথে। আর বলা হয়েছে, এসব আল্লাহর সামনে সিজদাবনত।

৬. অর্থাৎ আকাশের তারকা ও পৃথিবীর বৃক্ষরাজি সবই আল্লাহর নির্দেশের অনুগত এবং তাঁর আইন–বিধানের অনুসারী। তাদের জন্য যে নিয়ম–বিধি তৈরী করে দেয়া হয়েছে তারা তা মোটেই লংঘন করে না।

এ দু'টি আয়াতে যা কিছু বর্ণনা করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য এ কথা বলা যে, সমগ্র বিশ্ব–জাহানের গোটা ব্যবস্থাপনা আল্লাহ তা'আলার তৈরী এবং সব কিছু তাঁরই আনুগত্য করে চলেছে। পৃথিবী থেকে আসমান পর্যন্ত কোথাও কোন সার্বভৌম সত্তা নেই। অন্য কারো কর্তৃত্ব এ বিশ্বজাহানে চলছে না।, আল্লাহর কর্তৃত্বে কারো কোন রকম দখলও নেই, কারো এমন মর্যাদাও নেই যে, তাকে উপাস্য বানানো যায়। সবাই এক আল্লাহর বান্দা ও দাসানুদাস। একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহই সকলের মনিব। তাই তাওহীদই সত্য। আর কুরআনই তার শিক্ষা দিচ্ছে। এ শিক্ষা পরিত্যাগ করে যে ব্যক্তিই শিরক অথবা কুফরীতে লিপ্ত হচ্ছে সে প্রকৃতপক্ষে গোটা বিশ্ব–জাহানের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে লড়াইতে লিপ্ত আছে।

৭. প্রায় সব তাফসীরকারই এখানে "মীযান" (দাড়িপাল্লা) অর্থ করেছেন সুবিচার ও ইনসাফ এবং মীযান কায়েম করার অর্থ বর্ণনা করেছেন এই যে, আল্লাহ তা'আলা বিশ্ব–জাহানের এই গোটা ব্যবস্থায় ইনসাফ ও সুবিচার কায়েম করেছেন। মহাকাশে আবর্তনরত এসব সীমা সংখ্যাহীন তারকা ও গ্রহ উপগ্রহ, বিশ্ব–জাহানে সক্রিয় এই বিশাল শক্তিসমূহ, এবং এ বিশ্বলোকে বিদ্যমান অসংখ্য সৃষ্টি ও বস্তুরাজির মধ্যে যদি পূর্ণমাত্রার সুবিচার ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা না হতো তাহলে এ জগত এক মুহূর্তের জন্যেও চলতে পারতো না। কোটি কোটি বছর ধরে এই পৃথিবীর বুকে বাতাস ও পানি এবং স্থলভাগে সৃষ্টিকুল আছে, তাদের প্রতি লক্ষ করুন। তাদের জীবন তো এ জন্যই টিকে আছে যে, তাদের জীবন ধারণের উপকরণের মধ্যে পুরোপুরি সুবিচার ও ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত আছে। এসব উপকরণের মধ্যে যদি সামান্য পরিমাণ ভারসাম্যহীনতাও সৃষ্টি হয় তাহলে এখানে জীবনের নাম গন্ধ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে না।

৮. অর্থাৎ তোমরা যেহেতু এমন একটি ভারসাম্যপূর্ণ বিশ্বলোকে বাস করছো যার গোটা ব্যবস্থাপনাই সুবিচার ও ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত। তাই তোমাদেরকেও সুবিচার ও ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। যে গণ্ডীর মধ্যে তোমাদেরকে স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে সেখানে যদি তোমরা বে–ইনসাফী করো এবং যে হকদারদের হক তোমাদের হাতে দেয়া হয়েছে তাদের হক যদি তোমরা হরণ কর, তাহলে তা হবে বিশ্ব প্রকৃতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল। এ মহা বিশ্বের প্রকৃতি জুলুম, বে–ইনসফী ও অধিকার হরণকে স্বীকার করে না। এখানে বড় রকমের কোন জুলুম তো দূরের কথা, দাঁড়ি পাল্লার ভারসাম্য বিঘ্নিত করে কেউ যদি খরিদ্দারকে এক তোলা পরিমাণ জিনিসও কম দেয় তাহলে সে বিশ্বলোকের ভারসাম্যে বিপর্যয় সৃষ্টি করে। –এটা কুরআনের শিক্ষার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এ তিনটি আয়াতে এ শিক্ষাটাই তুলে ধরা হয়েছে। কুরআনের প্রথম শিক্ষা হচ্ছে তাওহীদ এবং দ্বিতীয় শিক্ষা হচ্ছে সুবিচার ও ইনসাফ। এভাবে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি বাক্যে মানুষকে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, 'রাহমান' বা পরম দয়াবান আল্লাহ পথ প্রদর্শনের জন্য যে কুরআন পাঠিয়েছেন তা কি ধরনের শিক্ষা নিয়ে এসেছে।

وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ ﴿١٠﴾ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ﴿١١﴾ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ﴿١٢﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٣﴾

পৃথিবীকে[৯] তিনি সমস্ত সৃষ্টির জন্য বানিয়েছেন।[১০] এখানে সব ধরনের সুস্বাদু ফল প্রচুর পরিমাণে আছে। খেজুর গাছ আছে যার ফল পাতলা আবরণে ঢাকা। নানা রকমের শস্য আছে যার মধ্যে আছে দানা ও ভূষি উভয়ই।[১১] অতএব, হে জিন ও মানব জতি, তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ নিয়ামতকে[১২] অস্বীকার করবে[১৩]?

৯. এখান থেকে ২৫ আয়াত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার সেসব নিয়ামত, অনুগ্রহ এবং তার অসীম শক্তির সেসব বিস্ময়কর দিকের উল্লেখ করা হচ্ছে যা মানুষ ও জিন উভয়েই উপভোগ করছে এবং যার স্বাভাবিক ও নৈতিক দাবী হলো, কুফরী বা ঈমান গ্রহণের স্বাধীনতা থাকা সত্ত্বেও তারা যেন নিজেদের ঐকান্তিক আগ্রহ ও ইচ্ছায় তাদের রবের বন্দেগী ও আনুগত্যের পথ অনুসরণ করে।

১০. মূল কথাটি হলো পৃথিবীকে তিনি انام এর জন্য وضع (সংস্থাপিত) করেছেন। এখানে وضع বা সংস্থাপন করা বলতে বুঝানো হয়েছে সংযোজন করা, নির্মাণ করা, তৈরি করা, রাখা এবং স্থাপিত করা বা সেঁটে দেয়া। আর আরবী ভাষায় انام শব্দ দ্বারা সব সৃষ্টিকেই বুঝায়। এর মধ্যে মানুষ ও অন্যান্য সব প্রাণীকূল অন্তরভুক্ত। ইবনে আব্বাস বলেন ঃ كُلُّ شَيْءٍ مَا فِيهِ الروح প্রাণধারি সব সত্তাই انام হিসেবে গণ্য। মুজাহিদের মতে এর অর্থ সমস্ত সৃষ্টিকূল। কাতাদা, ইবনে যায়েদ ও শা'বীর মতে সমস্ত প্রাণীই انام (আনাম)। হাসান বাসারী বলেন ঃ মানুষ ও জিন উভয়েই এর মধ্যে অন্তরভুক্ত। সমস্ত ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত এ অর্থই বর্ণনা করেছেন। এ থেকে জানা যায়, যারা এ আয়াতের সাহায্যে ভূমিকে রাষ্ট্রের মালিকানাধীন করার নির্দেশ দিতে চান তারা অর্থহীন কথা বলেন। এটা বাইরের মতবাদ এনে জোরপূর্বক কুরআনের ওপর চাপিয়ে দেয়ার একটি কদর্য্য প্রচেষ্টা। আয়াতে ব্যবহৃত শব্দাবলী থেকে যেমন তা প্রমাণিত হয় না, তেমনি পূর্বাপর প্রসংগ দ্বারাও তা সমর্থিত হয় না। শুধু মানব সমাজকেই আনাম বলা হয় না, বরং পৃথিবীর অন্যান্য সৃষ্টিও এর মধ্যে শামিল। পৃথিবীকে আনামের জন্য সংস্থাপিত করার অর্থ এ নয় যে, তা সবার সাধারণ মালিকানা। বাক্যের ভাবধারা থেকেও প্রকাশ পায় না যে, এখানে কোন অর্থনৈতিক নিয়ম-বিধি বর্ণনা করা এর উদ্দেশ্য। প্রকৃতপক্ষে এখানে এ কথা বলাই উদ্দেশ্য যে, আল্লাহ তা'আলা এ পৃথিবীকে এমনভাবে সৃষ্টি ও প্রস্তুত করে দিয়েছেন যে, তা নানা প্রকারের প্রাণীকূলের বসবাস ও জীবন যাপনের উপযোগী হয়ে গিয়েছে। এ পৃথিবী আপনা থেকেই এরূপ হয়ে যায়নি, বরং স্রষ্টার বানানোর কারণেই এরূপ হয়েছে। তিনি নিজের জ্ঞান ও সৃষ্টি কৌশলের আলোকে এ পৃথিবীকে এ অবস্থানে সংস্থাপন করছেন এবং তার পৃষ্ঠদেশে এমন পরিবেশ ও অবস্থা সৃষ্টি করেছেন যার ফলশ্রুতিতে প্রাণধারী প্রজাতিসমূহের পক্ষে এখানে টিকে থাকা সম্ভব হয়েছে। (ব্যাখ্যার জন্য দেখুন,

তাফহীমুল কুরআন, আন নামল, টীকা ৭৩–৭৪; ইয়াসীন, টীকা ২৯–৩২; আল মু'মিন, টীকা ৯০–৯১; হা মীম আস সাজদা, টীকা ১১ থেকে ১৩ পর্যন্ত; আয যুখরুফ, টীকা ৭ থেকে ১০ পর্যন্ত; আল জাসিয়া, টীকা ৭)।

১১. অর্থাৎ মানুষের জন্য খাদ্য শস্য এবং পশুর ভুষিখাদ্য।

১২. মূল আয়াতে آلاء শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এবং পরবর্তী আয়াতসমূহে এ শব্দটি বার বার উল্লেখ করা হয়েছে। আমরাও বিভিন্নস্থানে এর অর্থ বিভিন্ন শব্দে ব্যক্ত করেছি। তাই এ শব্দটি কতটা ব্যাপক অর্থবোধক এবং কত গভীর তাৎপর্যপূর্ণ, তা শুরুতেই বুঝে নেয়া দরকার। ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত ও তাফসীর বিশারদগণ آلاء শব্দের অর্থ করেছেন সাধারণত "নিয়ামতসমূহ"। সমস্ত অনুবাদক এ শব্দের অনুবাদও করেছন তাই। ইবনে আব্বাস, কাতাদা, হাসান বাসরী থেকে এর এই অর্থই বর্ণিত হয়েছে। এটি যে এ শব্দের সঠিক অর্থ তার বড় প্রমাণ হলো নবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে জিনদের এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, এ আয়াত শুনে তারা বারবার বলছিল ঃ لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ বর্তমান যুগের কোন কোন গবেষকের এ সিদ্ধান্তের সাথে আমরা একমত নই যে, آلاء শব্দটি নিয়ামত অর্থে আদৌ ব্যবহৃত হয় না।

এ শব্দের আরেকটি অর্থ হচ্ছে, অসীম ক্ষমতা, অসীম ক্ষমতার বিস্ময়কর দিকসমূহ অসীম ক্ষমতার পরিপূর্ণতাসমূহ। ইবনে জারীর তাবারী ইবনে যায়েদের এ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন যে, فَبِاَىِّ الاٰءِ رَبِّكُمَا অর্থ فَبِاَىِّ قُدْرَةِ اللّٰه । ইবনে জারীর নিজেও ৩৭ ও ৩৮ আয়াতের ব্যাখ্যায় آلاء শব্দটিকে অসীম ক্ষমতা অর্থে গ্রহণ করেছেন। ইমাম রাযীও ১৪, ১৫ ও ১৬ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন "এ আয়াতগুলোতে নিয়ামতের বর্ণনা করা হয়নি, বরং অসীম ক্ষমতার বর্ণনা করা হয়েছে। তিনি ২২ ও ২৩ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন ঃ এ দু'টি আয়াতে আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতের বর্ণনা করা হয়নি। বরং তার অসীম ক্ষমতার বিস্ময়কর দিকসমূহ বর্ণনা করা হয়েছে।"

এর তৃতীয় অর্থ হচ্ছে গুণাবলী, মহত গুণাবলী এবং পরিপূর্ণ ও মর্যাদা। ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত ও তাফসীরকারগণ এ অর্থ বর্ণনা করেননি। কিন্তু আরবদের কাব্যে এ শব্দটি এ অর্থে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। কবি নাবেগাহ বলেছেন ঃ

هم الملوك وابناء الملوك لهم : فضل على الناس فى الالاء والنعم

"তারা বাদশাহ এবং বাদশাহজাদা। প্রশংসনীয় গুণাবলী ও নিয়ামতের দিক দিয়ে মানুষের কাছে তাদের মর্যাদা আছে।"

মুহালহিল তার ভাই কুলাইবের জন্য রচিত শোকগাথায় বলেছেন ঃ

الحزم والعزم كانا من طبائعه : ما كل الائه ياقوم احصيها

"পরিণাম দর্শিতা ও দৃঢ়সংকল্প ছিল তার মহত গুণাবলীর অন্তরভুক্ত। হে লোকেরা, আমি তার সব মহত গুণ এখানে তুলে ধরছি না।"

ফাদালা ইবনে যায়েদ আল–আদওয়ানী দারিদ্র্যের মন্দ দিকসমূহ বর্ণনা প্রসংগে বলছেন যে, দরিদ্র মানুষ ভাল কাজ করলেও মন্দ বিবেচিত হয়। কিন্তু

وتحمد الاء البخيل المدرهم

সম্পদশালী কৃপণের অনেক গুণ–বৈশিষ্ট ও পরিপূর্ণতার প্রশংসা করা হয়।

আজদা' হামদানী তার "কুমাইত" নামের ঘোড়ার প্রশংসা প্রসংগে বলেন ঃ

ورضيت الاء الكميت فمن يبع : فرسا فليس جوادنا بمباع

"আমি 'কুমাইতে'র উত্তম গুণাবলী পছন্দ করি। কেউ কোন ঘোড়া বিক্রি করতে চাইলে করুক। আমাদের ঘোড়া বিক্রি করা হবে না।"

হাম্মাসার এক কবি আবু তামাম যার নাম উল্লেখ করেনি তার শ্রদ্ধেয় ও প্রশংসনীয় ব্যক্তি ওয়ালীদ ইবনে আদহামের ক্ষমতা ও কতৃত্বের শোকগাথায় বলেছেন ঃ

اذا ما امرؤ اثنى بالاء ميت : فلا يبعد الله الوليدبن ادهما

"যখনই কেউ কোন মৃত ব্যক্তির গুণাবলীর প্রশংসা করবে আল্লাহ না করুন, সে যেন ওয়ালীদ ইবনে আদহামকে ভুলে না যায়।"

فما كان مفراحا اذا الخير مسه : ولا كان منانا اذا هو انعما

"সুদিন আসলে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ো না এবং কারো প্রতি অনুগ্রহ করে থাকলে কখনো খোঁটা দিয়ো না।"

কবি তারাফা এক ব্যক্তির প্রশংসা উপলক্ষে বলেন ঃ

كامل يجمع الاء الفتى : نبه سيد سادات خضم

"সে পূর্ণাঙ্গ ও নিষ্কলুষ, সাহসিকতার সমস্ত গুণাবলীর সমাহার, অভিজাত, নেতাদের নেতা এবং উদারমনা।"

এসব প্রমাণাদি ও দৃষ্টান্তাবলী সামনে রেখে آلاء শব্দটিকে আমরা তার ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করেছি এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে স্থান–কাল–পাত্র ভেদে যে অর্থটি যথোপযুক্ত মনে হয়েছে অনুবাদে সেটিই লিপিবদ্ধ করেছি। তা সত্ত্বেও কোন কোন জায়গায় একই স্থানে آلاء শব্দটির কয়েকটি অর্থ হতে পারে। অনুবাদের বাধ্যবাধকতার কারণে আমাকে তার একটি অর্থই গ্রহণ করতে হয়েছে। কেননা, যুগপত সবগুলো অর্থই ধারণ করতে পারে আরবী ছাড়া অন্য ভাষায় এরূপ ব্যাপক অর্থবোধক কোন শব্দ নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, আলোচ্য আয়াতটিতে পৃথিবী সৃষ্টি এবং সেখানকার সমস্ত সৃষ্টির রিযিক সরবরাহের সর্বোত্তম ব্যবস্থাপনার উল্লেখ করার পর বলা হয়েছে, তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ آلاء কে অস্বীকার করবে? এক্ষেত্রে آلاء শব্দটি শুধুমাত্র নিয়ামত অর্থেই ব্যবহৃত হয়নি, বরং মহান আল্লাহর অসীম ক্ষমতার পরিপূর্ণতা এবং তাঁর মহৎ গুণাবলীর অর্থেও ব্যবহৃত হয়েছে। এটা তাঁর অসীম ক্ষমতার পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ যে, তিনি এই মাটির পৃথিবীকে এমন বিস্ময়কর পন্থায় তৈরী করেছেন যেখানে অসংখ্য প্রজাতির প্রাণীকূল বাস করে এবং নানা রকমের ফল ও শস্য উৎপন্ন হয়। এটাও তাঁর প্রশংসনীয় গুণ যে, তিনি এসব প্রাণীকূলকে

সৃষ্টি করার সাথে সাথে এখানে তাদের লালন-পালন এবং রিযিক সরবরাহেরও ব্যবস্থা করেছেন। ব্যবস্থাপনাও এমন ব্যাপক ও নিখুঁত যে, তাদের খাদ্যে কেবল খাদ্য গুণ ও পুষ্টিই নয়, বরং তার মধ্যে প্রবৃত্তি ও রসনার তৃপ্তি আছে এবং আছে অগণিত দৃষ্টিলোভা দিক। এক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলার কারিগরী ও নৈপুন্যের চরম পূর্ণতার একটি মাত্র দিকের প্রতি নমুনা হিসেবে ইংগিত দিয়ে দেখানো হয়েছে কিভাবে খেজুর গাছে পাতলা আবরণে আচ্ছাদিত করে ফল সৃষ্টি করা হয়। এই একটি মাত্র উদাহরণকে সামনে রেখে একটু লক্ষ করুন, কলা, দাড়িম্ব, কমলালেবু, নারিকেল এবং অন্যান্য ফলের প্যাকিংয়ে কি রকম নৈপুন্য ও শৈল্পিক কারুকার্যের পরাকাষ্ঠা ও উৎকর্ষতা দেখানো হয়েছে। তাছাড়া নানা রকমের খাদ্য শস্য, ডাল এবং বীজ যা আমরা পরিতুষ্টির সাথে অবলীলাক্রমে রান্না করে খাই তার প্রত্যেকটিকে উৎকৃষ্ট ও পরিচ্ছন্ন আঁশ ও ছালের আকারে প্যাক করে এবং অতি সূক্ষ্ম আবরণে জড়িয়ে সৃষ্টি করা হয়।

১৩. অস্বীকার করার অর্থ আল্লাহ তা'আলার নিয়ামতসমূহ, তাঁর অসীম ক্ষমতার বিস্ময়কর কার্যাবলী এবং মহৎ গুণাবলীর ক্ষেত্রে মানুষের কতিপয় আচরণ। যেমন ঃ

এসব জিনিসের সৃষ্টিকর্তা যে মহান আল্লাহ, অনেকে তা আদৌ স্বীকার করে না। তাদের ধারণা, এসবই বস্তুর আকস্মিক বিশৃংখলার কিংবা একটা দুর্ঘটনার ফল যার মধ্যে জ্ঞান ও সৃষ্টিশীলতার কোন হাত নেই। এ ধরনের উক্তি একেবারে খোলাখুলি অস্বীকৃতির নামান্তর।

কিছু সংখ্যক লোক এ কথা স্বীকার করে যে, এসব জিনিসের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ। তবে তারা এর সাথে সাথে অন্যদেরকেও খোদায়ীতে শরীক মনে করে, তাঁর নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অন্যদের কাছে এবং তাঁর দেয়া রিযিক খেয়ে অন্যের গুণ গায়। এটা অস্বীকৃতির আরেকটি রূপ। কোন লোক যখন স্বীকার করে যে, আপনি তার প্রতি অমুক অনুগ্রহ করেছেন এবং তখনি আপনার সামনেই সেজন্য অন্য কোন লোকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে শুরু করে—অথচ প্রকৃত পক্ষে সে তার প্রতি আদৌ অনুগ্রহ করেনি—তাহলে আপনি নিজেই বলবেন যে, সে জঘন্য অকৃতজ্ঞতা দেখিয়েছে। কারণ তার এ আচরণ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, সে আপনাকে নয় বরং সে ব্যক্তিকেই অনুগ্রহকারী স্বীকার করে যার প্রতি সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছে।

আরো কিছু লোক আছে যারা আল্লাহকেই সমস্ত জিনিসের সৃষ্টিকর্তা স্বীকার করে, কিন্তু তাদেরকে নিজেদের সৃষ্টি ও পালনকর্তার আদেশ নিষেধের আনুগত্য এবং তাঁর হিদায়াতসমূহের অনুসরণ করতে হবে তা মানে না। এটা অকৃতজ্ঞতা ও নিয়ামত অস্বীকার করার আরো একটি রূপ। কারণ, যে ব্যক্তি এরূপ আচরণ করে সে নিয়ামতসমূহ স্বীকার করা সত্ত্বেও নিয়ামত দাতার অধিকারকে অস্বীকার করে।

আরো এক শ্রেণীর মানুষ মুখে নিয়ামতকে অস্বীকার করে না কিংবা নিয়ামত দানকারীর অধিকারকেও অস্বীকার করে না। কিন্তু কার্যত তাদের এবং একজন অস্বীকৃতি জ্ঞাপনকারী ও মিথ্যানুসারীর জীবনে উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য থাকে না। এটা মৌখিক অস্বীকৃতি নয়, কার্যত অস্বীকৃতি।

خَلَقَ الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ﴿١٤﴾ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَّارِجٍ مِّن نَّارٍ ﴿١٥﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٦﴾ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ﴿١٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿١٨﴾

মাটির শুকনো ঢিলের মত পচা কাদা থেকে তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন।[১৪] আর জিনদের সৃষ্টি করেছেন আগুনের শিখা থেকে[১৫]। হে জিন ও মানব জাতি, তোমরা তোমাদের রবের অসীম ক্ষমতার কোন্ কোন্ বিস্ময়কর দিক অস্বীকার করবে?[১৬]

দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচল— সব কিছুর মালিক ও পালনকর্তা তিনিই।[১৭] হে জিন ও মানবজাতি, তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ কুদরতকে[১৮] অস্বীকার করবে?

১৪. কুরআন মজীদে মানুষ সৃষ্টির যে প্রাথমিক পর্যায়সমূহ বর্ণনা করা হয়েছে, কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানের বক্তব্য একত্রিত করে তার নিম্নবর্ণিত ক্রমিক বিন্যাস অবগত হওয়া যায় (১) তুরাব অর্থাৎ মাটি। (২) ত্বীন অর্থাৎ পচা কর্দম যা মাটিতে পানি মিশিয়ে বানানো হয়। (৩) ত্বীন লাযেব-আঠালো কাদামাটি। অর্থাৎ এমন কাদা, দীর্ঘদিন পড়ে থাকার কারণে যার মধ্যে আঠা সৃষ্টি হয়ে যায় (৪) حمإٍ مسنون যে কাদার মধ্যে গন্ধ সৃষ্টি হয়ে যায় (৫) صلصال من حماءٍ مسنون كالفخار অর্থাৎ পচা কাদা যা শুকিয়ে যাওয়ার পরে মাটির শুকনো ঢিলার মত হয়ে যায়। (৬) بشر মাটির এ শেষ পর্যায় থেকে যাকে বানানো হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা যার মধ্যে তাঁর বিশেষ রূহ ফুৎকার করেছেন, ফেরেশতাদের দিয়ে যাকে সিজদা করানো হয়েছিল এবং তার সমজাতীয় থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করা হয়েছিল (৭) ثم جعل نسله من سللة من ماء مهين তারপর পরবর্তী সময়ে নিকৃষ্ট পানির মত সংমিশ্রিত দেহ নির্যাস থেকে তার বংশ ধারা চালু করা হয়েছে। এ কথাটি বুঝাতে অন্য স্থানসমূহে نطفه (শুক্র) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

মানব সৃষ্টির এ পর্যায়সমূহ অবগত হওয়ার জন্য কুরআন মজীদের নিম্নবর্ণিত আয়াতসমূহ পর্যায়ক্রমে পাঠ করুন। كَمَثَلِ اٰدَمَ خَلَقَهٗ مِنْ تُرَابٍ (ال عمران : ٥٩) | بَدَاَ خَلْقَ الْاِنْسَانِ مِنْ طِيْنٍ (السجده : ٧) اِنَّا خَلَقْنٰهُمْ مِنْ طِيْنٍ لَازِبٍ (الصفات:١١) চতুর্থ ও পঞ্চম পর্যায় আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। তার পরের পর্যায়গুলো নীচের আয়াত সমূহে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

اِنِّىْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ طِيْنٍ فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سَاجِدِيْنَ (ص : ٧١-٧٢) خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَخَلَقَ

مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَآءً (النساء : ١) ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلْلَةٍ مِنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ (السجدة : ٨) فَاِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ (الحج : ٥)

১৫. মূল আয়াতে مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। نار অর্থ এক বিশেষ ধরনের আগুন। কাঠ বা কয়লা জ্বালালো যে আগুন সৃষ্টি হয় এটা সে আগুন নয়। আর مارج অর্থ ধোঁয়াবিহীন শিখা। এ কথার অর্থ হচ্ছে প্রথম মানুষকে যেভাবে মাটি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তারপর সৃষ্টির বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করার সময় তার মাটির সত্তা অস্থি–মাংসে তৈরী জীবন্ত মানুষের আকৃতি লাভ করেছে এবং পরবর্তী সময়ে শুক্রের সাহায্যে তার বংশধারা চালু আছে। অনুরূপ প্রথম জিনকে নিছক আগুনের শিখা থেকে সৃষ্টি করা হয়েছিল এবং তার বংশধরদের থেকে পরবর্তী সময়ে জিনদের অধস্তন বংশধররা সৃষ্টি হয়ে চলেছে। মানব জাতির জন্য আদমের মর্যাদা যা, জিন জাতির জন্য সেই প্রথম জিনের মর্যাদাও তাই। জীবন্ত মানুষ হয়ে যাওয়ার পর হযরত আদম এবং তার বংশ থেকে জন্ম লাভকারী মানুষের দেহের সেই মাটির সাথে যেমন কোন মিল থাকলো না যে মাটি দ্বারা তাকে সৃষ্টি করা হয়েছিল। যদিও এখনো আমাদের দেহ পুরোটাই মাটির অংশ দ্বারাই গঠিত। কিন্তু মাটির ঐ সব অংশ রক্ত–মাংসের দেহে রূপান্তরিত হয়েছে এবং প্রাণ সঞ্চারিত হওয়ার পর তা শুধু মাটির দেহ না থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিসে রূপান্তরিত হয়েছে। জিনদের ব্যাপারটাও তাই। তাদের সত্তাও মূলত আগুনের সত্তা। কিন্তু আমরা যেমন মাটির স্তূপ নই, অনুরূপ তারাও শুধু অগ্নি শিখা নয়।

এ আয়াত থেকে দু'টি বিষয় জানা যায় ঃ এক, জিনেরা নিছক আত্মিক সত্তা নয়, বরং তাদেরও এক ধরনের জড় দেহ আছে। তবে তা যেহেতু নিরেট আগুনের উপাদানে গঠিত, তাই তারা মাটির উপাদানে গঠিত মানুষের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। নীচে বর্ণিত এ আয়াতটি এ বিষয়ের প্রতিই ইংগিত করে ঃ

اِنَّهُ يَرٰكُمْ هُوَ وَقَبِيْلُهُ مِنْ حَيْثُ لاَ تَرَوْنَهُمْ

"শয়তান ও তার দলবল এমন অবস্থান থেকে তোমাদের দেখছে যেখানে তোমরা তাদের দেখতে পাও না" (আল–আ'রাফ–২৭)।

অনুরূপভাবে জিনদের দ্রুত গতিসম্পন্ন হওয়া, অতি সহজেই বিভিন্ন আকার–আকৃতি গ্রহণ করা এবং যেখানে মাটির উপাদানে গঠিত বস্তুসমূহ প্রবেশ করতে পারে না, কিংবা প্রবেশ করলেও তা অনুভূত হয় বা দৃষ্টি গোচর হয়, সেখানে তাদের প্রবেশ অনুভূত বা দৃষ্টিগোচর না হওয়া—এসবই এ কারণে সম্ভব ও বোধগম্য যে, প্রকৃতই তারা আগুনের সৃষ্টি।

এ থেকে দ্বিতীয় যে বিষয়টি জানা যায় তা হচ্ছে, জিনরা মানুষ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সৃষ্টিই শুধু নয়, বরং তাদের সৃষ্টি উপাদানই মানুষ, জীবজন্তু, উদ্ভিদরাজি এবং চেতন পদার্থসমূহ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। যারা জিনদেরকে মানুষেরই একটি শ্রেণী বলে মনে করে এ

আয়াত স্পষ্ট ভাষায় তাদের ভ্রান্তি প্রমাণ করছে। তারা এর ব্যাখ্যা করে বলেন, মাটি থেকে মানুষকে এবং আগুন থেকে জিনকে সৃষ্টি করার অর্থ প্রকৃত পক্ষে দুই শ্রেণীর মানুষের মেজাজের পার্থক্য বর্ণনা করা। এক প্রকারের মানুষ নম্র মেজাজের হয়ে থাকেন। সত্যিকার অর্থে তারাই মানুষ। আরেক প্রকারের মানুষের মেজাজ হয় অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত গরম। তাদের মানুষ না বলে শয়তান বলাটাই অধিক যুক্তিযুক্ত। তবে এ ধরনের ব্যাখ্যা প্রকৃতপক্ষে কুরআনের তাফসীর নয়, কুরআনের বিকৃতি সাধন করা। উপরে ১৪ নম্বর টীকায় আমরা দেখিয়েছি যে, কুরআন নিজেই মাটি দ্বারা মানুষের সৃষ্টির অর্থ কতটা স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে তুলে ধরে। বিস্তারিত এসব বিবরণ পড়ার পর কোন বিবেকবান ব্যক্তি কি এর এ অর্থ গ্রহণ করতে পারে যে, এসব কথার উদ্দেশ্য শুধু উত্তম মানুষদের নম্র মেজাজ হওয়ার প্রশংসা করা? তার পরেও সুস্থ বিবেক সম্পন্ন মানুষের মগজে একথা কি করে আসতে পারে যে, মানুষকে পঁচা আঠাল মাটির শুকনো ঢিলা থেকে সৃষ্টি করা এবং জিনদেরকে নিরেট অগ্নি শিখা থেকে সৃষ্টি করার অর্থ একই মানব জাতির দু'টি ভিন্ন ভিন্ন মেজাজের ব্যক্তিদের বা গোষ্ঠীর স্বতন্ত্র নৈতিক গুণাবলীর পার্থক্য বর্ণনা করা? (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা যারিয়াতের তাফসীর, টীকা-৫৩)।

১৬. এখানে ক্ষেত্র অনুসারে آلاء শব্দের অর্থ "অসীম ক্ষমতার বিস্ময়কর দিক সমূহই অধিক উপযোগী। তবে এর মধ্যে নিয়ামতের বিষয়টিও অন্তরভুক্ত। মাটি থেকে মানুষ এবং আগুনের শিখা থেকে জিনের মত বিস্ময়কর জীবকে অস্তিত্ব দান করা যেমন আল্লাহর অসীম ক্ষমতার বিস্ময়কর ব্যাপার। তেমনি এ দু'টি সৃষ্টির জন্য এটাও এক বিরাট নিয়ামত যে, আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে শুধু সৃষ্টিই করেননি, বরং প্রত্যেককে এমন আকার আকৃতি দান করেছেন, প্রত্যেকের মধ্যে এমন সব শক্তি ও যোগ্যতা দিয়েছেন যার সাহায্যে তারা পৃথিবীতে বড় বড় কাজ সম্পন্ন করার যোগ্য হয়েছে। জিনদের সম্পর্কে আমাদের কাছে বেশী তথ্য না থাকলেও মানুষ তো আমাদের সামনে বিদ্যমান। মানুষকে মানুষের মস্তিষ্ক দেয়ার পরে যদি মাছ, পাখি অথবা বানরের দেহ দান করা হতো তাহলে সেই দেহ নিয়ে কি সে ঐ মস্তিষ্কের উপযোগী কাজ করতে পারতো? তাহলে এটা কি আল্লাহর বিরাট নিয়ামত নয় যে, মানুষের মস্তিষ্কে তিনি যে সব শক্তি দিয়েছেন তা কাজে লাগানোর জন্য সর্বাধিক উপযোগী দেহও তাকে দান করেছেন? এক দিকে এ হাত, পা, চোখ, কান, জিহ্বা ও দীর্ঘ দেহ এবং অপরদিকে এ জ্ঞান-বুদ্ধি, চিন্তা ও ধ্যান-ধারণা, আবিষ্কার ও যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপনের ক্ষমতা, শৈল্পিক নৈপুন্য এবং কারিগরী যোগ্যতা পাশাপাশি রেখে বিচার করলে বুঝতে পারবেন এ সবের স্রষ্টা এসবের মধ্যে পূর্ণ মাত্রার যে সামঞ্জস্য বিধান করেছেন তা যদি না থাকতো তাহলে পৃথিবীতে মানুষের অস্তিত্বই অর্থহীন হয়ে পড়তো। এসব জিনিসই আবার আল্লাহ তা'আলার মহত গুণাবলীর প্রতি ইংগিত করে। জ্ঞান-বুদ্ধি, সৃষ্টি নৈপুন্য, অপরিসীম দয়া এবং পূর্ণমাত্রার সৃষ্টিক্ষমতা ছাড়া মানুষ ও জিনের মত এমন জীব কি করে সৃষ্টি হতে পারতো? আকস্মিক দুর্ঘটনা এবং স্বয়ংক্রিয়ভাবে কর্মতৎপর অন্ধ ও বধির প্রাকৃতিক নিয়ম এরূপ অনুপম ও বিস্ময়কর সৃষ্টিকর্ম কি করে সম্পন্ন করতে পারে?

১৭. দুই উদয়াচল ও দুই অস্তাচলের অর্থ শীত কালের সবচেয়ে ছোট দিন এবং গ্রীষ্মকালের সবচেয়ে বড় দিনের উদয়াচল ও আস্তাচলও হতে পারে। আবার পৃথিবীর দুই

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيٰنِ ﴿١٩﴾ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيٰنِ ﴿٢٠﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢١﴾ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٢٢﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٣﴾ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَئٰتُ فِى الْبَحْرِ كَالْاَعْلَامِ ﴿٢٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٢٥﴾

দু'টি সমুদ্রকে তিনি পরস্পর মিলিত হতে দিয়েছেন। তা সত্ত্বেও উভয়ের মধ্যে একটি পর্দা আড়াল হয়ে আছে যা তারা অতিক্রম করে না[১৯] হে জিন ও মানব জাতি, তোমরা তোমাদের রবের অসীম শক্তির কোন্ কোন্ বিস্ময়কর দিক অস্বীকার করবে?

এই উভয় সমুদ্র থেকেই মুক্তা ও প্রবাল[২০] পাওয়া যায়।[২১] হে জিন ও মানব জাতি, তোমরা তোমাদের রবের কুদরতের কোন্ কোন্ পরিপূর্ণতা অস্বীকার করবে?[২২]

সমুদ্রের বুকে পাহাড়ের মত উঁচু ভাসমান জাহাজসমূহ তাঁরই।[২৩] অতএব, হে জিন ও মানব জাতি, তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?[২৪]

গোলার্ধের উদয়াচল ও অস্তাচলও হতে পারে। শীত মৌসুমের সর্বাপেক্ষা ছোট দিনে সূর্য অত্যন্ত সংকীর্ণ একটি কোণ সৃষ্টি করে উদয় হয় এবং অস্ত যায়। অপর দিকে গ্রীষ্মের সর্বাপেক্ষা বড় দিনে অতি বিস্তৃত কোণ সৃষ্টি করে উদয় হয় এবং অস্ত যায়। প্রতি দিন এ উভয় কোণের মাঝে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের স্থান পরিবর্তিত হতে থাকে। এ কারণে কুরআনের অন্য এক স্থানে (المعارج : ٤٠) رَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ বলা হয়েছে। অনুরূপ পৃথিবীর এক গোলার্ধে যখন সূর্য উদয় হয় ঠিক সে সময় অন্য গোলার্ধে তা অস্ত যায়। এভাবেও পৃথিবীর দু'টি উদয়াচল ও অস্তাচল হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলাকে এ দু'টি উদয়াচল ও অস্তাচলের রব বলার কয়েকটি অর্থ আছে। এক, তাঁর হুকুমেই সূর্যের উদয় হওয়া ও অস্ত যাওয়া এবং সারা বছর ধরে তা ক্রমাগত পরিবর্তিত হতে থাকার এই ব্যবস্থা চালু আছে। দুই, পৃথিবী ও সূর্যের মালিক ও শাসক তিনি। এ দু'টির রব যদি ভিন্ন ভিন্ন হতো তাহলে ভূ-পৃষ্ঠে নিয়মতান্ত্রিকভাবে সূর্যের এ উদয়াস্তের ব্যবস্থা কিভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারতো এবং স্থায়ীভাবে কি করে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারতো। তিন, এ দুই উদয়াচল ও অস্তাচলের মালিক ও পালনকর্তাও তিনি। উভয়ের মধ্যবর্তী স্থানে বসবাসকারী সমস্ত সৃষ্টি তাঁরই মালিকানাভুক্ত, তিনিই তাদেরকে প্রতিপালন করছেন এবং প্রতিপালনের জন্যই তিনি ভূ-পৃষ্ঠে সূর্য অস্ত যাওয়ার এবং উদয় হওয়ার এ জ্ঞানগর্ভ ব্যবস্থা চালু রেখেছেন।

১৮. এখানেও পরিবেশ ও ক্ষেত্র অনুসারে آلاء শব্দের সর্বাধিক স্পষ্ট অর্থ বুঝা যায় "অসীম ক্ষমতা"। তবে তার সাথে এর অর্থ নিয়ামত ও মহৎ গুণাবলী হওয়ার দিকটাও বিদ্যমান। আল্লাহ তা'আলা সূর্যের উদয়াস্তের এই নিয়ম নির্ধারিত করে দিয়েছেন। এটা তাঁর একটা বড় নিয়ামত। কারণ, এর বদৌলতেই নিয়মিতভাবে মৌসুমের পরিবর্তন ঘটে থাকে। আর মৌসুমের পরিবর্তনের সাথে মানুষ, জীবজন্তু, ও উদ্ভিদরাজি সবকিছুর অসংখ্য স্বার্থ জড়িত। অনুরূপভাবে আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে যেসব সৃষ্টিকুলকে সৃজন করেছেন, তাদের প্রয়োজনের বিষয়ের প্রতি লক্ষ রেখে নিজের অসীম ক্ষমতায় এসব ব্যবস্থাপনা আঞ্জাম দিয়েছেন এটাও তাঁরই দয়া, রবুবিয়াত ও সৃষ্টি কুশলতা।

১৯. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা ফুরকান, টীকা–৬৮।

২০. মূল আয়াতে مرجان শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। ইবনে আব্বাস, কাতাদা, ইবনে যায়েদ ও দাহ্‌হাক (রা)–এর মতে এর অর্থ মুক্তা। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ আরবীতে এ শব্দটি প্রবাল অর্থে ব্যবহৃত হয়।

২১. মূল আয়াতের ব্যবহৃত শব্দ হচ্ছে يَخْرُجُ مِنْهُمَا "উভয় সমুদ্র থেকেই পাওয়া যায়"। কেউ কেউ এতে আপত্তি উথাপন করে বলেন, মুক্তা ও প্রবাল পাথর তো কেবল লবণাক্ত পানিতেই পাওয়া যায়। সুতরাং লবণাক্ত ও সুপেয় উভয় প্রকারের পানি থেকেই এ দু'টি পাওয়া যায় তা কি করে বলা হলো? এর জবাব হচ্ছে, মিঠা ও লবণাক্ত উভয় প্রকার পানিই সমুদ্রে জমা হয়। অতএব যদি বলা হয়, একত্রে সঞ্চিত এ পানি থেকে এ গুলো পাওয়া যায় কিংবা যদি বলা হয়, তা উভয় প্রকার পানি থেকেই পাওয়া যায় তাহলে কথা একই থেকে যায়। তাছাড়া আরো গবেষণা ও অনুসন্ধানের ফলে যদি প্রমাণিত হয় যে, মুক্তা ও প্রবাল পাথর সমুদ্র গর্ভে এমন স্থানে উৎপন্ন হয় যেখানে তার গভীর তলদেশে মিঠা পানির ধারা প্রবাহিত হচ্ছে এবং তার সৃষ্টি ও পরিণতি প্রাপ্তির ক্ষেত্রে যুগপৎ উভয় প্রকার পানির ভূমিকা ও অবদান আছে তাহলে তাতেও বিস্ময়ের কিছু নেই। বাহরাইনে যেখানে সুপ্রাচীন কাল থেকে মুক্তা আহরণ করা হয় সেখানে উপসাগরের তলদেশে মিঠা পানির ঝর্ণা প্রবাহিত আছে বলে প্রমাণিত হয়েছে।

২২. এখানেও آلاء শব্দের দ্বারা যদিও আল্লাহর অসীম ক্ষমতার' দিকটিই বেশী স্পষ্ট তা সত্ত্বেও নিয়ামত ও মহত গুণাবলী অর্থটাও অস্পষ্ট নয়।। এটা আল্লাহর নিয়ামত যে, এসব মূল্যবান বস্তু সমুদ্র থেকে পাওয়া যায়। তাছাড়া এটা তাঁর প্রতিপালক সুলভ মহত গুণ যে, তার যে সৃষ্টিকে তিনি রূপ ও সৌন্দর্যের পিপাসা দিয়েছেন সে পিপাসা নিবারণের জন্য তিনি তাঁর পৃথিবীতে নানা রকমের সুন্দর বস্তুও সৃষ্টি করেছেন।

২৩. অর্থাৎ এসব সমুদ্রগামী জাহাজ তাঁরই অসীম ক্ষমতায় সৃষ্টি হয়েছে। তিনিই মানুষকে সমুদ্র পাড়ি দেয়ার জন্য জাহাজ নির্মাণের যোগ্যতা দান করেছেন আর তিনিই পানিকে এমন নিয়ম–কানুনের অধীন করে দিয়েছেন যার কারণে বিক্ষুব্ধ সমুদ্র বক্ষ চিরে পাহাড়ের ন্যায় বড় বড় জাহাজের চলাচল সম্ভব হয়েছে।

২৪. এখানে آلاء শব্দের মধ্যে নিয়ামত ও অনুগ্রহ অর্থটি স্পষ্ট। তবে উপরের ব্যাখ্যা থেকে এ কথাও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এর অসীম ক্ষমতা ও উত্তম গুণাবলী প্রকাশের দিকটিও বর্তমান।

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ﴿٢٦﴾ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿٢٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٢٨﴾ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴿٢٩﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٠﴾

২ রুকূ'

এ ভূপৃষ্ঠের প্রতিটি জিনিসই[২৫] ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তোমার মহীয়ান ও দয়াবান রবের সত্তাই শুধু অবশিষ্ট থাকবে। অতএব, হে জিন ও মানুষ তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ পূর্ণতাকে অস্বীকার করবে?[২৬] পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডলে যা-ই আছে সবাই তাঁর কাছে নিজের প্রয়োজন প্রার্থনা করছে। প্রতি মুহূর্তে তিনি নতুন নতুন কর্মকাণ্ডে ব্যস্ত।[২৭] হে জিন ও মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ মহত গুণাবলী অস্বীকার করবে?[২৮]

২৫. এখান থেকে ৩০ আয়াত পর্যন্ত জিন ও মানুষকে দু'টি মহা সত্য সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে।

এক ঃ তোমরা নিজেরাও অবিনশ্বর নও, সেই সব সাজ-সরঞ্জামও চিরস্থায়ী নয়, যা তোমরা এ পৃথিবীতে ভোগ করছো। অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী শুধুমাত্র মহা সম্মানিত ও সুমহান আল্লাহর সত্তা, এ বিশাল বিশ্ব-জাহান যার সাক্ষ্য দিচ্ছে এবং যাঁর বদান্যতায় তোমাদের ভাগ্যে এসব নিয়ামত জুটেছে এখন যদি তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ "আমার চেয়ে কেউ বড় নেই" এই গর্বে গর্বিত হয় তাহলে এটা তার বুদ্ধির সংকীর্ণতা ছাড়া কিছুই নয়। কোন নির্বোধ যদি তার ক্ষমতার ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে নিজের শ্রেষ্ঠত্বের ডঙ্কা বাজায়, কিংবা কতিপয় মানুষ তার কর্তৃত্ব স্বীকার করায় সে তাদের খোদা হয়ে বসে, তাহলে তার এ মিথ্যার বেসাতী কত দিন চলতে পারে? মহাবিশ্বের বিশাল বিস্তৃতির মধ্যে পৃথিবীর অনুপাত যেখানে মটরশুটির দানার মতও নয় তার এক নিভৃত কোণে দশ বিশ কিংবা পঞ্চাশ ষাট বছর যে কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব চলে এবং তারপরই অতীত কাহিনীতে রূপান্তরিত হয় তা এমন কোন্ কর্তৃত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব যার জন্য কেউ গর্ব করতে পারে?

দুই ঃ যে গুরুত্বপূর্ণ মহাসত্য সম্পর্কে জিন ও মানুষ—এ দু'টি সৃষ্টিকে সাবধান করা হয়েছে তা হচ্ছে, মহান ও মহিমান্বিত আল্লাহ ছাড়া তোমরা আর যেসব সত্তাকেই উপাস্য, বিপদে রক্ষাকারী ও অভাব মোচনকারী হিসেবে গ্রহণ করে থাক তারা ফেরেশতা, নবী-রসূল, অলী-দরবেশ কিংবা চন্দ্র-সূর্য বা অন্য কোন সৃষ্টি যাই হোক না কেন তাদের কেউই তোমাদের কোন প্রয়োজন পূরণ করতে সক্ষম নয়। অভাব মোচন ও প্রয়োজন পূরণের জন্য ওরা নিজেরাই তো মহান আল্লাহর মুখাপেক্ষী। তাদের নিজেদের হাতই তার সামনে প্রসারিত। তারা নিজেদের ক্ষমতায় নিজেদের বিপদই যেখানে দূর করতে পারেন সেখানে সে তোমাদের বিপদ মোচন কি করে করবে? পৃথিবী থেকে আকাশ

سَنَفْرُغُ لَكُمْ اَيُّهَ الثَّقَلٰنِ ﴿٣١﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٢﴾ يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا ۭ لَا تَنْفُذُوْنَ اِلَّا بِسُلْطٰنٍ ﴿٣٣﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٤﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّنْ نَّارٍ ۙ وَّنُحَاسٌ فَلَا تَنْتَصِرٰنِ ﴿٣٥﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٣٦﴾

ওহে পৃথিবীর দুই বোঝা[২৯] তোমাদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আমি অতি শীঘ্রই তোমাদের প্রতি একাগ্রভাবে মনোনিবেশ করবো।[৩০] (তারপরে দেখবো) তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ অনুগ্রহকে অস্বীকার করো?[৩১] হে জিন ও মানব গোষ্ঠী, তোমরা যদি পৃথিবী ও আকাশ মণ্ডলের সীমা পেরিয়ে কোথাও পালিয়ে যেতে পার তাহলে গিয়ে দেখ। পালাতে পারবে না, এ জন্য বড় শক্তি প্রয়োজন।[৩২] তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ অসীম ক্ষমতাকে অস্বীকার করবে? (যদি পালানোর চেষ্টা করো তাহলে) তোমাদের প্রতি আগুনের শিখা এবং ধোঁয়া[৩৩] ছেড়ে দেয়া হবে তোমরা যার মোকাবিলা করতে পারবে না। হে জিন ও মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ ক্ষমতাকে অস্বীকার করবে?

মণ্ডল পর্যন্ত বিশাল বিস্তৃত এই মহাবিশ্বে যা কিছু হচ্ছে, শুধু এক আল্লাহর নির্দেশেই হচ্ছে। মহান এ কর্মকাণ্ডে আর কারো কোন কর্তৃত্ব ও আধিপত্য নেই। তাই কোন ব্যাপারেই সে কোন বান্দার ভাগ্যের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

২৬. পরিবেশ ও ক্ষেত্র থেকে স্পষ্ট যে, آلاء শব্দটি এখানে পরিপূর্ণতা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। নশ্বর সৃষ্টিকুলের মধ্যে যাকেই তার নিজের শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকায় পেয়ে বসে এবং নিজের ক্ষুদ্র ক্ষমতা ও কর্তৃত্বকে অবিনশ্বর মনে করে গর্বে স্ফীত হয়ে উঠে সে মুখে না বললেও নিজের কর্মকাণ্ড দ্বারা সে বিশ্বপালনকর্তা মহান আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্বকে অবশ্যই অস্বীকার করে। তার গর্ব আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের পরিপন্থী তথা অস্বীকৃতি। নিজের মুখে সে পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্বের যে দাবীই করে কিংবা মনের মধ্য যে দাবী সুপ্ত রাখে তা পূর্ণতা ও শ্রেষ্ঠত্বের প্রকৃত দাবীদারের পদমর্যাদা ও সম্মানকে অস্বীকার করার শামিল।

২৭. অর্থাৎ মহাবিশ্বের এ কর্মক্ষেত্রে প্রতি মুহূর্তে তাঁরই কর্মতৎপরতার এক সীমাহীন ধারাবাহিকতা চলছে। কাউকে তিনি মারছেন আবার কাউকে জীবন দান করছেন। কারো উত্থান ঘটাচ্ছেন আবার কারো পতন ঘটাচ্ছেন, কাউকে আরোগ্য দান করছেন আবার কাউকে রোগাক্রান্ত করছেন, কাউকে ডুবন্ত অবস্থা থেকে রক্ষা করছেন আবার সাতার

কেটে চলা কাউকে নিমজ্জিত করছেন। সীমা সংখ্যাহীন সৃষ্টিকে নানাভাবে রিযিক দান করছেন। অসংখ্য বস্তুকে নতুন নতুন স্টাইল, আকার–আকৃতি ও গুণ–বৈশিষ্ট দিয়ে সৃষ্টি করছেন। তাঁর পৃথিবী কখনো এক অবস্থায় অপরিবর্তিত থাকে না। তাঁর পরিবেশ ও অবস্থা প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হতে থাকে এবং তার স্রষ্টা তাকে প্রতিবারই একটি নতুন রূপে সজ্জিত করেন যা পূর্বের সব আকার–আকৃতি থেকে ভিন্ন হয়ে থাকে।

২৮. এখানে آلاء শব্দের 'গুণাবলী' অর্থটিই অধিক উপযুক্ত বলে মনে হয়। কোন ব্যক্তি যখনই কোন প্রকার শির্‌কে লিপ্ত হয় তখন সে প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তা'আলার কোন না কোন গুণকে অস্বীকার করে। কেউ যদি বলে অমুক ব্যক্তি আমাকে রোগমুক্ত করেছেন তাহলে প্রকৃতপক্ষে তার অর্থ দাঁড়ায়, আল্লাহ রোগ আরোগ্যকারী নন, বরং সেই ব্যক্তিই রোগ আরোগ্যকারী। কেউ যদি বলে, অমুক বুযুর্গ ব্যক্তির অনুগ্রহে আমি রুজি লাভ করেছি। তাহলে প্রকৃতপক্ষে সে যেন বললো, আল্লাহ তা'আলা রিযিকদাতা নন বরং সেই বুযুর্গ ব্যক্তি রিযিক দাতা। কেউ যদি বলে, অমুক আস্তানা থেকে আমার উদ্দেশ্য পূরণ হয়েছে, তাহলে সে যেন বললো, পৃথিবীতে আল্লাহর হুকুম চলছে না, বরং ঐ আস্তানার হুকুম চলছে। মোটকথা প্রতিটি শিরক্‌মূলক আকীদা ও শির্‌কমূলক কথাবার্তা চূড়ান্ত বিশ্লেষণে আল্লাহর গুণাবলীর অস্বীকৃতির পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে। শির্‌কের অর্থই হচ্ছে ব্যক্তি অন্যদের সর্বশ্রোতা, সর্বদর্শী, অদৃশ্য জ্ঞাতা, স্বাধীনভাবে কর্মসম্পাদনকারী, সর্বশক্তিমান এবং খোদায়ীর অন্য সব গুণে গুণান্বিত বলে আখ্যায়িত করছে এবং এককভাবে আল্লাহই যে এসব গুণে গুণান্বিত তা অস্বীকার করছে।

২৯. মূল আয়াতে ثَقَلَانِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। এর মূল ধাতু ثقل । ثقل অর্থ বোঝা। আর ثقل বলা হয় এমন বোঝাকে যা সওয়ারী বা বাহনের ওপর চাপানো হয়েছে। ثقلين শব্দের শাব্দিক অনুবাদ হবে "দুই বোঝা" এখানে এ শব্দটি জিন ও মানুষকে বুঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, এ দু'টি জাতিকেও পৃথিবী পৃষ্ঠে বোঝা হিসেবে চাপানো হয়েছে এবং পূর্ব থেকে সেই সব জিন ও মানুষকে উদ্দেশ করেই কথা বলা হচ্ছে যারা তাদের রবের আনুগত্য ও দাসত্ব থেকে বিচ্যুত হয়েছে। তাছাড়া পরবর্তী ৪৫ আয়াতেও তাদেরকেই সম্বোধন করা হয়েছে। সে জন্য তাদেরকে أَيُّهَا الثَّقَلَانِ বলে সম্বোধন করা হয়েছে। অর্থাৎ স্রষ্টা যেন তাঁর এই দু'টি অযোগ্য সৃষ্টিকে বলছেন ঃ তোমরা যারা আমার পৃথিবীর ওপর বোঝা হয়ে আছ, তোমাদের সাথে বুঝাপড়ার জন্য অবসর গ্রহণ করবো।

৩০. এখন আল্লাহ তা'আলা এমন ব্যস্ত যে এসব অবাধ্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করার অবকাশ তিনি পান না, একথার অর্থ তা নয়। প্রকৃতপক্ষে একথার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ একটি বিশেষ সময়সূচী নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। সেই সময়সূচী অনুসারে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তিনি এ পৃথিবীতে মানুষ ও জিনদের বংশের পর বংশ সৃষ্টি করতে থাকবেন এবং তাদেরকে পৃথিবীর এ পরীক্ষাগারে এনে কাজ করার সুযোগ দেবেন। তারপর একটা নির্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষার এ ধারা হঠাৎ বন্ধ করে দেয়া হবে এবং সে সময়ে বিদ্যমান সমস্ত জিন ও মানুষকে একই সময়ে হঠাৎ ধ্বংস করে দেয়া হবে। তারপর মানব ও জিন উভয়

জাতির জবাবদিহির জন্য তার কাছে আরো একটি সময় নির্দিষ্ট করা আছে। সেই সময় জিন ও মানব জাতির সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ লোকদেরকে পুনরায় জীবিত করে একই সময় একত্রিত করা হবে। এ সময়সূচীর প্রতি লক্ষ রেখে বলা হয়েছে, এখনো আমি প্রথম পর্যায়ের কাজ করছি। দ্বিতীয় পর্যায়ের সময় এখনো আসেনি। তাই তৃতীয় পর্যায়ের কাজ শুরু করার কোন প্রশ্নই আসে না। তবে ঘাবড়াবে না। খুব শীঘ্রই সে সময়টি এসে যাচ্ছে যখন আমি তোমাদের খবর নেয়ার জন্য অবসর নেব। এখানে অবসরহীনতার অর্থ এই নয় যে, এখন কোন কাজ আল্লাহ তা'আলাকে এমনভাবে ব্যস্ত রেখেছে যে, অন্য কাজ করার অবকাশই তিনি পাচ্ছেন না। বরং এর ধরন ও প্রকৃতি হচ্ছে, যেন কেউ বিভিন্ন কাজ সম্পাদনের জন্য একটি সময়সূচী প্রস্তুত করে রেখেছেন এবং সেই অনুসারে যে কাজের সময় এখনো আসেনি সে কাজ সম্পর্কে বলছেন, আমি সে কাজের জন্য আদৌ প্রস্তুত নই।

৩১. এখানে آلاء শব্দটিকে "অসীম ক্ষমতা" অর্থেও গ্রহণ করা যেতে পারে। বক্তব্যের ধারাবাহিকতার প্রতি লক্ষ করলে আলাদা আলাদা দৃষ্টিকোণ থেকে এ দু'টি অর্থই সঠিক বলে মনে হয়। একটি অর্থ গ্রহণ করলে তার সারকথা দাঁড়ায় এই যে, আজ তোমরা আমার নিয়ামতের নাশোকরী করছো এবং কুফর, শির্ক, নাস্তিকতা, পাপাচার ও নাফরমানীর বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করে নানা রকমের নেমকহারামী করে চলেছো। কিন্তু কাল যখন জবাবদিহির পালা আসবে তখন দেখবো আমার কোন্ কোন্ নিয়ামতকে তোমরা আকস্মিক দুর্ঘটনা কিংবা নিজেদের যোগ্যতার ফল বা কোন দেব-দেবী অথবা বুযুর্গের অনুগ্রহের দান বলে প্রমাণ করো। অন্য অর্থটি গ্রহণ করলে তার সারমর্ম দাঁড়ায় এই যে, আজ তোমরা কিয়ামত, হাশর-নাশর, হিসেব-নিকেশ এবং জান্নাত ও জাহান্নাম নিয়ে হাসি-তামাসা ও ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছো এবং নিজ থেকেই এ অমূলক ধারণা নিয়ে বসে আছ যে, এরূপ হওয়া সম্ভবই নয়। কিন্তু আমি যখন তোমাদেরকে পরিবেষ্টিত করে ধরে আনবো এবং আজ যা তোমরা অস্বীকার করছো তা সবই তোমাদের সামনে এসে হাজির হবে সে সময় আমি দেখে নেব তোমরা আমার কোন্ কোন্ অসীম ক্ষমতাকে অস্বীকার করে থাকো।

৩২. যমীন ও আসমান অর্থ গোটা সৃষ্টিজগত অথবা অন্য কথায় আল্লাহর প্রভুত্ব। আয়াতের অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাওয়ার সাধ্য তোমাদের নেই। যে জবাবদিহি সম্পর্কে তোমাদের অবহিত করা হচ্ছে তার সময় যখন আসবে তখন তোমরা যেখানেই থাক না কেন পাকড়াও করে আনা হবে। এ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য তোমাদেরকে আল্লাহর প্রভুত্বাধীন এলাকা থেকে চলে যেতে হবে। কিন্তু সে ক্ষমতা তোমাদের নেই। তোমরা যদি মনে এ ধরনের অহমিকা পোষণ করে থাক তাহলে সর্বশক্তি নিয়োগ করে দেখ।

৩৩. মূল আয়াতে شواظ ও نحاس শব্দ দু'টি ব্যবহৃত হয়েছে। এমন নিরেট অগ্নি-শিখাকে شواظ বলা হয় যার মধ্যে ধোঁয়া থাকে না আর এমন নিরেট ধোঁয়াকে نحاس বলা হয় যার মধ্যে অগ্নিশিখা থাকে না। জিন ও মানুষ যখন আল্লাহ তা'আলার সামনে জবাবদিহি থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা করবে তখন তাদের প্রতি একের পর এক এ দু'টি জিনিস নিক্ষেপ করা হবে।

فَإِذَا انْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿٣٧﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٣٨﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ﴿٣٩﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٠﴾ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ ﴿٤١﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٢﴾ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٤٣﴾ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ آنٍ ﴿٤٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٤٥﴾

অতপর (কি হবে সেই সময়) যখন আসমান ফেটে চৌচির হয়ে যাবে এবং লাল চামড়ার মত লোহিত বর্ণ ধারণ করবে?[৩৪] হে জিন ও মানুষ, তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ ক্ষমতা অস্বীকার করবে?[৩৫]

সে দিন কোন মানুষ ও কোন জিনকে তার গোনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন হবে না।[৩৬] তখন (দেখা যাবে) তোমরা দুই গোষ্ঠী তোমাদের রবের কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করো।[৩৭] সেখানে চেহারা দেখেই অপরাধীকে চেনা যাবে এবং তাদেরকে মাথার সম্মুখভাগের চুল ও পা ধরে হিঁচড়ে টেনে নেয়া হবে। সেই সময় তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ ক্ষমতাকে অস্বীকার করবে? সেই (সময় বলা হবে) এতো সেই জাহান্নাম অপরাধীরা যা মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করতো। তারা ঐ জাহান্নাম ও ফুটন্ত টগবগে পানির উৎসের মধ্যে যাতায়াত করতে থাকবে।[৩৮] তারপরেও তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ ক্ষমতাকে অস্বীকার করবে?[৩৯]

৩৪. এখানে কিয়ামতের দিনের কথা বলা হয়েছে। আসমান বিদীর্ণ হওয়ার অর্থ মহাকাশ বা মহাবিশ্বের মধ্যকার পারস্পরিক আকর্ষণ না থাকা, মহাকাশের সমস্ত সৌরজগতের বিক্ষিপ্ত হয়ে যাওয়া, মহাজগতের সমস্ত নিয়ম–শৃংখলা ধ্বংস হয়ে যাওয়া। আরো বলা হয়েছে, সে সময় আসমান লাল চামড়ার মত বর্ণধারণ করবে। অর্থাৎ সেই মহাপ্রলয়ের সময় যে ব্যক্তি পৃথিবী থেকে আসমানের দিকে তাকাবে তার মনে হবে গোটা উর্ধজগতে যেন আগুন লেগে গিয়েছে।

৩৫. অর্থাৎ আজ তোমরা বলছো কিয়ামত সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। এর অর্থ হচ্ছে, তোমাদের মতে আল্লাহ তা'আলা কিয়ামত সংঘটিত করতে সক্ষম নন। কিন্তু যখন তা

সংঘটিত হবে এবং আজ তোমাদেরকে যে খবর দেয়া হচ্ছে নিজের চোখে তা সংঘটিত হতে দেখবে তখন আল্লাহর কোন্ কোন্ ক্ষমতাকে অস্বীকার করবে?

৩৬. পরবর্তী আয়াতের অর্থাৎ "চেহারা দেখেই সেখানে অপরাধীদের চেনা যাবে" কথাটিই এর ব্যাখ্যা। অর্থাৎ সেই মহাসমাবেশে সমস্ত পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানুষকে একত্রিত করা হবে। অপরাধীদের চেনার জন্য সেখানে জনে জনে একথা জিজ্ঞেস করার দরকার হবে না যে, তারা কে কে অপরাধী কিংবা কোন জিন ও মানুষকে, সে অপরাধী কিনা একথা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন পড়বে না। অপরাধীদের শুষ্ক ম্লান মুখ ভীতি ভরা দু'টি চোখ, অস্থির অপ্রস্তুত ভাবভঙ্গি এবং ঘর্মসিক্ত হওয়াই তাদের অপরাধী হওয়ার গোপন রহস্য উদঘাটিত করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট হবে। অপরাধী ও নিরপরাধ এ উভয় শ্রেণীর লোকের একটি দল যদি পুলিশের কবলে পড়ে তাহলে নিরপরাধ লোকদের চেহারার প্রশান্তি ও নিরুদ্বিগ্নতা এবং অপরাধীদের চেহারার অস্থিরতা ও উদ্বিগ্নতা প্রথম দর্শনেই বলে দেবে ঐ দলে কে অপরাধী আর কে নিরপরাধ। দুনিয়াতে এ নিয়ম কোন কোন সময় ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। কারণ দুনিয়ার পুলিশের ন্যায়নিষ্ঠতার ব্যাপারে মানুষ আস্থা রাখতে পারে না। তাদের হাতে বরং অপরাধীদের চেয়ে নিরপরাধরাই বারবার বেশী করে হয়রানির শিকার হয়। তাই পৃথিবীতে পুলিশের কবলে পড়ে ভদ্র ও নিরপরাধ লোকদের অধিক ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়া সম্ভব। কিন্তু আখেরাতে আল্লাহ তা'আলার ন্যায়বিচারের প্রতি প্রতিটি ভদ্র ও নিরপরাধ ব্যক্তিরই পূর্ণ আস্থা থাকবে। এ ধরনের অস্থিরতা ও উদ্বেগ থাকবে কেবল তাদেরই যাদের নিজের বিবেকই তাদের অপরাধী হওয়া সম্পর্কে অবহিত থাকবে। হাশরের ময়দানে উপস্থিত হওয়া মাত্র তারা এ ব্যাপারে স্থির নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, এখন তাদের সেই দুর্ভাগ্য এসে গিয়েছে যাকে তারা অসম্ভব ও সন্দেহজনক মনে করে দুনিয়াতে অপরাধ করে বেড়িয়েছে।

৩৭. কুরআনের দৃষ্টিতে অপরাধের প্রকৃত ভিত্তি হলো, বান্দা আল্লাহর দেয়া যেসব নিয়ামত ভোগ করছে সেসব নিয়ামত সম্পর্কে তার এ ধারণা পোষণ যে, তা কারো দেয়া নয়, বরং সে এমনিই তা লাভ করেছে। কিংবা এসব নিয়ামত আল্লাহর দান নয়, বরং নিজের যোগ্যতা ও সৌভাগ্যের ফল। অথবা একথা মনে করা যে, এসব নিয়ামত আল্লাহর দান বটে, কিন্তু সেই আল্লাহর তাঁর বান্দার ওপর কোন অধিকার নেই। অথবা আল্লাহ নিজে তার প্রতি এসব অনুগ্রহ দেখাননি। বরং অন্য কোন সত্তা তাকে দিয়ে তা করিয়েছেন। এসব ভ্রান্ত ধ্যান-ধারণার ভিত্তিতে মানুষ আল্লাহ বিমুখ এবং তাঁর আনুগত্য ও দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে পৃথিবীতে এমন সব কাজ-কর্ম করে আল্লাহ যা করতে নিষেধ করেছেন এবং সেসব কাজ করে না আল্লাহ যা করতে আদেশ দিয়েছেন। এ বিচারের প্রতিটি অপরাধ ও প্রতিটি গোনাহর মূলগতভাবে আল্লাহ তা'আলার দান ও অনুগ্রহের অস্বীকৃতি ও অবমাননা। এ ক্ষেত্রে কেউ মুখে তা মানুক বা অস্বীকার করুক তাতে কিছু এসে যায় না। কিন্তু প্রকৃতই যে ব্যক্তি অস্বীকৃতি ও অবমাননার ইচ্ছা ও মনোবৃত্তি পোষণ করে না, বরং তার মনের গভীরে তার সত্য হওয়ার বিশ্বাস সদা বর্তমান, মানবিক দুর্বলতার কারণে কোন সময় তার দ্বারা ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়ে গেলে সে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং তা থেকে নিজেকে রক্ষা

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٰنِ ﴿٤٦﴾ فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٧﴾ ذَوَاتَاۤ اَفْنَانٍ ﴿٤٨﴾ فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٤٩﴾ فِيْهِمَا عَيْنٰنِ تَجْرِيٰنِ ﴿٥٠﴾ فَبِاَىِّ اٰلَاۤءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٥١﴾ فِيْهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٰنِ ﴿٥٢﴾

৩ রুকূ'

আর যারা তাদের প্রভুর সামনে হাজির হওয়ার ব্যাপারে ভয় পায়[৪০] তাদের প্রত্যেকের জন্য আছে দু'টি করে বাগান।[৪১] তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দানকে তোমরা অস্বীকার করবে?[৪২] তরুতাজা লতাপাতা ও ডালপালায় ভরা। তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দানকে তোমরা অস্বীকার করবে? উভয় বাগানে দু'টি ঝর্ণা প্রবাহিত থাকবে। তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দানকে তোমরা অস্বীকার করবে? উভয় বাগানের প্রতিটি ফলই হবে দু' রকমের।[৪৩]

করার চেষ্টা করে। এ জিনিসটি তাকে অস্বীকারকারীদের অন্তরভুক্ত হওয়া থেকে রক্ষা করে। এ ছাড়া আর সব অপরাধীই প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর নিয়ামতসমূহ অবিশ্বাসকারী এবং তাঁর দয়া ও অনুগ্রহসমূহ অস্বীকারকারী। এ কারণে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ যখন তোমরা অপরাধী হিসেবে ধরা পড়বে তখন আমি দেখবো তোমরা আমার কোন্ কোন্ অনুগ্রহ অস্বীকার করছো। একথাটিই সূরা "তাকাসূরে" এভাবে বলা হয়েছে ঃ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ তোমাদেরকে যেসব নিয়ামত দেয়া হয়েছিল সেদিন ঐ গুলো সম্পর্কে তোমাদেরকে অবশ্যই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অর্থাৎ জিজ্ঞেস করা হবে, আমিই তোমাদেরকে এসব নিয়ামত দিয়েছিলাম কিনা! ঐ সব নিয়ামত লাভ করার পর তোমরা তোমাদের অনুগ্রহকারীর প্রতি কি আচরণ করেছিলে, আর ঐ সব নিয়ামতকে কিভাবে কাজে লাগিয়েছিলে?

৩৮. অর্থাৎ জাহান্নামের মধ্যে বারবার পিপাসার্ত হওয়ার কারণে তাদের অবস্থা হবে অত্যন্ত করুণ। দৌড়িয়ে দৌড়িয়ে পানির ঝর্ণার দিকে যাবে। কিন্তু সেখানে পাবে টগবগে গরম পানি যা পান করে পিপাসা মিটবে না। এভাবে জাহান্নাম ও পানির ঝর্ণাসমূহের মাঝে যাতায়াত করেই তাদের জীবন কাটতে থাকবে।

৩৯. অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা যে কিয়ামত সংঘটিত করতে পারেন, মৃত্যুর পর তোমাদেরকে আরেকটি জীবন দিতে পারেন, তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারেন এবং যে জাহান্নামে আজ তোমরা শাস্তি ভোগ করছো তাও বানাতে পারেন, তখনও কি তোমরা একথা অস্বীকার করতে পারবে?

৪০. অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে পৃথিবীতে জীবন যাপন করেছে, সবসময় যার এ উপলব্ধি ছিল যে, পৃথিবীতে আমাকে দায়িত্বহীন এবং লাগাম বিহীন উটের মত মুক্ত স্বাধীন করে ছেড়ে দেয়া হয়নি। আমাকে একদিন আমার রবের সামনে দাঁড়াতে হবে

এবং নিজের সব কাজ–কর্মের হিসেব দিতে হবে। এ আকীদা–বিশ্বাস যার মধ্যে থাকবে অনিবার্যভাবেই সে প্রবৃত্তির দাসত্ব থেকে রক্ষা পাবে, এলোপাথাড়ি যে কোন পথ ধরেই চলতে শুরু করবে না। ন্যায় ও অন্যায়, জুলুম ও ইনসাফ পাক ও না–পাক এবং হালাল ও হারামের মধ্যে পার্থক্য করবে। আর জেনে বুঝে আল্লাহর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে না। পরে যে প্রতিদানের কথা বলা হচ্ছে এটাই তার প্রকৃত কারণ।

৪১. জান্নাত শব্দের শাব্দিক অর্থ বাগান। আখেরাতের জীবনে সৎমানুষদেরকে যেখানে রাখা হবে কুরআন মজীদের কোথাও সেই পুরো স্থানটাকে জান্নাত বলা হয়েছে। অর্থাৎ তা যেন সবটাই একটা বাগান। কোথাও বলা হয়েছে তাদের জন্য থাকবে বাগানসমূহ যার পাদদেশ দিয়ে নদী ও ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হতে থাকবে। এর অর্থ সেই বিশাল বাগানের মধ্যে ছোট ছোট অনেক বাগান হবে। আর এখানে নির্দিষ্ট করে বলা হয়েছে যে, সেই বিশাল বাগানের মধ্যে প্রত্যেক নেক্‌কার ব্যক্তিকে দু'টি করে বাগান দেয়া হবে। ঐ দু'টি বাগান কেবল তার জন্যই নির্দিষ্ট হবে। তার মধ্যে থাকবে তার প্রাসাদ। সেখানে সে তার চাকর–বাকর ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে নিয়ে বাদশাহী ঠাটবাট ও জাঁকজমকের সাথে অবস্থান করবে। তাকে যেসব সাজ–সরঞ্জাম দেয়ার কথা পরে বলা হয়েছে সেখানেই তাকে তা সরবরাহ করা হবে।

৪২. এখান থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত آلاء শব্দটি নিয়ামতরাজি ও অসীম ক্ষমতা উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাছাড়া এর মধ্যে মহত গুণাবলীর দিকটিও প্রতিভাত হয়েছে। প্রথম অর্থটি গ্রহণ করা হলে বর্ণনার এ ধারাবাহিকতার মধ্যে এ বাক্যাংশটি বারবার উল্লেখ করার অর্থ হবে তোমরা অস্বীকার করতে চাইলে করতে থাক। আল্লাহভীরু লোকেরা তাদের রবের পক্ষ থেকে এসব নিয়ামত অবশ্যই লাভ করবেন। দ্বিতীয় অর্থ গ্রহণ করা হলে তার সারকথা হবে, তোমাদের মতে আল্লাহ তা'আলার জান্নাত তৈরী করা এবং সেখানে তাঁর নেক বান্দাহদেরকে এসব নিয়ামত দান করা অসম্ভব হয়ে থাকলে হোক। কিন্তু আল্লাহ নিশ্চিতভাবে তা করতে সক্ষম এবং তিনি অবশ্যই তা করবেন। তৃতীয় অর্থ অনুসারে এর তাৎপর্য হচ্ছে, তোমরা মনে কর আল্লাহ তা'আলা ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করেন না। তোমাদের কথা অনুসারে এর অর্থ দাঁড়ায়, তিনি এ বিশাল পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ঠিকই। কিন্তু এখানে কেউ জুলুম করলো না ইনসাফ, ন্যায় ও সত্যের জন্য কাজ করলো না বাতিলের জন্য এবং অকল্যাণের প্রসার ঘটালো না কল্যাণের তার কোন পরোয়াই তিনি করেন না। তিনি জালেমকেও শাস্তি দেন না, মজলুমের ফরিয়াদও শোনেন না। ভালো কাজের মূল্যও বুঝেন না, মন্দ কাজকেও ঘৃণা করেন না। তোমাদের ধারণা অনুসারে তিনি অক্ষমও বটে। তিনি যমীন ও আসমান ঠিকই বানাতে পারেন, কিন্তু জালেমদেরকে শাস্তি দেয়ার জন্য দোজখ এবং ন্যায় ও সত্যের অনুসারীদের প্রতিদান দেয়ার জন্য জান্নাত নির্মাণ করতে সক্ষম নন। তাঁর এসব মহত গুণাবলীকে আজ যত ইচ্ছা তোমরা অস্বীকার করতে থাকো। কাল যখন তিনি সত্যি সত্যি জালেমদেরকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন এবং ন্যায় ও সত্যের অনুসারীদেরকে জান্নাতে এসব নিয়ামত দান করবেন, সে সময়ও কি তোমরা তার এসব গুণাবলী অস্বীকার করতে পারবে?

৪৩. একথার একটা অর্থ হতে পারে এই যে, উভয় বাগানের ফলই হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের এবং স্বতন্ত্র বৈশিষ্টপূর্ণ। এক বাগানে গেলে গাছের শাখা প্রশাখায় প্রচুর ফল দেখতে

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٣﴾ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ ۚ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿٥٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٥﴾ فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ ﴿٥٦﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٧﴾ كَأَنَّهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿٥٨﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿٥٩﴾

তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দানকে তোমরা অস্বীকার করবে? জান্নাতের বাসিন্দারা এমন সব ফরাশের ওপর হেলান দিয়ে বসবে যার আবরণ হবে পুরু রেশমের[৪৪] এবং বাগানের ছোট ছোট শাখা-প্রশাখা ফলভারে নুয়ে পড়তে থাকবে। তোমরা তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান অস্বীকার করবে? এসব নিয়ামতের মধ্যে থাকবে লজ্জাবনত চক্ষু বিশিষ্টা ললনারা[৪৫] যাদেরকে এসব জান্নাতবাসীদের আগে কোন মানুষ বা জিন স্পর্শ করেনি।[৪৬] তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দানকে তোমরা অস্বীকার করবে? এমন সুদর্শনা, যেমন হীরা এবং মুক্তা। তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান তোমরা অস্বীকার করবে?

পাবে। অপর বাগানে গেলে সেখানকার ফলের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন দেখতে পাবে। দ্বিতীয় অর্থ হতে পারে এর প্রতিটি বাগানের এক প্রকারের ফল হবে তার পরিচিত। তার সাথে সে দুনিয়াতেও পরিচিত ছিল—যদিও তা স্বাদে দুনিয়ার ফল থেকে অনেক শ্রেষ্ঠ হবে। আর আরেক প্রকার ফল হবে বিরল ও অভিনব জাতের—দুনিয়ায় যা সে কোন সময় কল্পনাও করতে পারেনি।

৪৪. অর্থাৎ তার আবরণই যেখানে এরূপ সেখানে তার ওপরের আচ্ছাদনকারী চাদর কেমন হবে তা অনুমান করে দেখ।

৪৫. নারীর প্রকৃত সৌন্দর্য হচ্ছে লজ্জাহীনা ও বাচাল না হওয়া এবং সলজ্জ দৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া। এ কারণে জান্নাতের নিয়ামতসমূহের অন্যতম নিয়ামত নারী সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা সর্বপ্রথম তার রূপ ও সৌন্দর্যের কথা না বলে তার লজ্জাশীলতা ও সতীত্বের প্রশংসা করেছেন। সুন্দরী মেয়েরা তো নারী ও পুরুষের যৌথ ক্লাব-সমূহে এবং চলচ্চিত্র নির্মাণ কেন্দ্র চিত্রপুরীতেও সমবেত হয়ে থাকে। আর সুন্দরী প্রতিযোগিতায় বেছে বেছে সুন্দরী নারীদের নিয়ে আসা হয়। কিন্তু শুধু বিকৃত রুচিবোধ সম্পন্ন ও দুশ্চরিত্র লোকেরাই এদের ব্যাপারে আগ্রহী হতে পারে। যে সুন্দরী নারী যে কোন কাম দৃষ্টিকে তার সৌন্দর্য ভোগের আহবান জানায় এবং যে কোন বাহু বন্ধনে আবদ্ধ হতে প্রস্তুত হয় তা কোন ভদ্র ও রুচিবান মানুষকে আকৃষ্ট করতে পারে না।

সদাচারের প্রতিদান সদাচার ছাড়া আর কি হতে পারে?[৪৭] *হে জিন ও মানুষ, এরপরও তোমরা তোমাদের রবের মহত গুণাবলীর কোন্ কোন্‌টি অস্বীকার করবে?*[৪৮]

ঐ দু'টি বাগান ছাড়া আরো দু'টি বাগান থাকবে।[৪৯] *তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান তোমরা অস্বীকার করবে? নিবিড়, শ্যামল–সবুজ ও তরুতাজা বাগান।*[৫০] *তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান তোমরা অস্বীকার করবে। উভয় বাগানের মধ্যে দু'টি ঝর্ণাধারা ফোয়ারার মত উৎক্ষিপ্ত হতে থাকবে। তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান তোমরা অস্বীকার করবে। সেখানে থাকবে প্রচুর পরিমাণে ফল, খেজুর ও আনার। তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান তোমরা অস্বীকার করবে? এসব নিয়ামতের মধ্যে থাকবে সচ্চরিত্রের অধিকারীনী সুন্দরী স্ত্রীগণ।*

৪৬. এর অর্থ, পার্থিব জীবনে কোন নারী কুমারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে থাকুক কিংবা কারো স্ত্রী থেকে থাকুক যৌবনে মৃত্যুবরণ করে থাকুক কিংবা বৃদ্ধাবস্থায় দুনিয়া ছেড়ে যেয়ে থাকুক, এসব নেক্‌কার নারীরা আখেরাতে যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তাদেরকে যুবতী ও কুমারী বানিয়ে দেয়া হবে। সেখানে তাদের মধ্য থেকে যাকেই কোন নেক্‌কার পুরুষের জীবন সঙ্গিনী বানানো হবে জান্নাতে সে তার জান্নাতী স্বামীর পূর্বে আর কারো সাহচর্য লাভ করবে না।

এ আয়াত থেকে একথাটিও জানা যায় যে, নেক্‌কার মানুষের মত নেক্‌কার জিনরাও জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং সেখানে মানুষ পুরুষের জন্য যেমন মানুষ নারী থাকবে তেমনি জিন পুরুষদের জন্য জিন নারীও থাকবে। উভয়ের সাথে বন্ধনের জন্য উভয়ের নিজ প্রজাতির জোড়া বাঁধা হবে। কোন ভিন্ন প্রজাতির সৃষ্ট জীবের সাথে তাদের জোড়া বাঁধা হবে না। কারণ প্রকৃতিগতভাবেই তারা তাদের সাথে নিজেদের খাপ খাওয়াতে সক্ষম নয়। "তাদের পূর্বে কোন মানুষ বা জিন তাদের স্পর্শ করবে না" আয়াতে উল্লেখিত একথার অর্থ এ নয় যে, সেখানে নারীরা সবাই হবে মানুষ এবং তাদের জান্নাতী স্বামী স্পর্শ করার

পূর্বে তারা কোন মানুষ বা জিনের স্পর্শ লাভ করবে না। একথার প্রকৃত অর্থ হলো সেখানে জিন ও মানুষ উভয় প্রজাতির নারী থাকবে। তারা সবাই হবে লজ্জাশীলা ও অস্পর্শিতা। কোন জিন নারীও তার জান্নাতী স্বামীর পূর্বে অন্য কোন জিন পুরুষ কর্তৃক স্পর্শিতা হবে না, কোন মানুষ নারীও তার জান্নাতী স্বামীর পূর্বে অন্য কোন মানুষ পুরুষ কর্তৃক স্পর্শিতা ও অপবিত্রা হবে না।

৪৭. অর্থাৎ যেসব মানুষ আল্লাহ তা'আলার জন্য সারা জীবন পৃথিবীতে নিজেদের প্রবৃত্তির ওপর বিধি–নিষেধ ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে রেখেছিল, হারাম থেকে আত্মরক্ষা করে হালালের ওপর সন্তুষ্ট থেকেছে, ফরযকে ফরয মনে করে নিজের দায়িত্ব ও কর্তব্যসমূহ পালন করেছে, ন্যায় ও সত্যকে ন্যায় ও সত্য মনে করে হকদারদের হক–সমূহ আদায় করেছে এবং সর্বপ্রকার দুঃখ–কষ্ট বরদাশত করে অন্যায় ও অকল্যাণের বিরুদ্ধে ন্যায় ও কল্যাণকে সমর্থন করেছে। আল্লাহ তাদের এসব ত্যাগ ও কুরবানীকে ধ্বংস ও ব্যর্থ করে দেবেন এবং কখনো এর কোন প্রতিদান তাদেব দেবেন না তা কি করে সম্ভব?

৪৮. একথা স্পষ্ট, যে ব্যক্তি জান্নাত ও সেখানকার প্রতিদান ও পুরস্কার অস্বীকার করে প্রকৃতপক্ষে সে আল্লাহ তা'আলার বহুসংখ্যক উত্তম গুণাবলী অস্বীকার করে। সে আল্লাহকে মানলেও তাঁর সম্পর্কে অনেক খারাপ ধারণা পোষণ করে। তার মতে, আল্লাহ একজন অবিবেচক রাজা যার আইন–কানুন বিহীন রাজত্বে ভাল কাজ করা কোন কিছু পানিতে নিক্ষেপ করার শামিল। সে তাঁকে অন্ধ ও বধির বলে মনে করে। তাঁর বিশাল রাজ্যে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে কে প্রাণ, সম্পদ, প্রবৃত্তির কামনা–বাসনা এবং শ্রমের কুরবানী পেশ করছে সে খবর তিনি আদৌ রাখেন না। কিংবা সে মনে করে, তিনি অনুভূতিহীন ও কোন কিছুর যথাযথ মূল্যায়ণে অক্ষম—যার কাছে ভাল–মন্দের কোন পার্থক্য নেই। অথবা তার মতে, তিনি অক্ষম ও অপদার্থ। তাঁর কাছে নেক কাজের যতই মূল্য থাক না কেন, তার প্রতিদান দেয়ার সাধ্য তাঁর নেই। এ কারণে বলা হয়েছে, আখেরাতে তোমাদের চোখের সামনে যখন নেক কাজের উত্তম প্রতিদান দেয়া হবে, তখনও কি তোমরা তোমাদের রবের মহত গুণাবলী অস্বীকার করতে পারবে?

৪৯. মূল আয়াতে ব্যবহৃত বাক্যাংশ হলো ঃ مِنْ دُونِهِمَا جَنَّتَٰنِ আরবী ভাষায় دُونَ শব্দটি তিনটি ভিন্ন ভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। এক, কোন উঁচু জিনিসের তুলনায় নীচু হওয়া অর্থে। দুই, কোন উত্তম ও উৎকৃষ্ট জিনিসের তুলনায় নিম্নমানের হওয়া অর্থে। তিন, কোন জিনিসের চেয়ে অতিরিক্ত হওয়া অর্থে। অর্থের এ ভিন্নতার কারণে বাক্যাংশের এ অর্থেরও সম্ভাবনা বিদ্যমান যে, এ দু'টি বাগান ছাড়াও প্রত্যেক জান্নাতীকে আরো দু'টি বাগান দেয়া হবে। দ্বিতীয় সম্ভাবনা হচ্ছে, এ দু'টি বাগান ওপরে উল্লেখিত বাগান দু'টির তুলনায় অবস্থান ও মর্যাদায় নীচু মানের হবে। অর্থাৎ পূর্বোক্ত দু'টি বাগান হয়তো উচ্চস্থানে অবস্থিত হবে এবং এ দু'টি তার নীচে অবস্থিত হবে কিংবা প্রথমোক্ত বাগান দু'টি অতি উন্নতমানের হবে এবং তার তুলনায় এ দু'টি নিম্নমানের হবে। প্রথম সম্ভাবনা মেনে নিলে তার অর্থ হবে, ওপরে যেসব জান্নাতীদের কথা বলা হয়েছে অতিরিক্ত এ দু'টি বাগানও হবে তাদেরই। আর দ্বিতীয় অর্থের সম্ভাবনা মেনে নেয়ার ক্ষেত্রে অর্থ হবে প্রথমোক্ত দু'টি বাগান হবে "মুকাররাবীন" বা আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী

فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧١﴾ حُوْرٌ مَّقْصُوْرٰتٌ فِي الْخِيَامِ ﴿٧٢﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٣﴾ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ اِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَاۗنٌّ ﴿٧٤﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٥﴾ مُتَّكِـــِٕيْنَ عَلٰي رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَّعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿٧٦﴾ فَبِاَيِّ اٰلَاۗءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبٰنِ ﴿٧٧﴾ تَبٰرَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلٰلِ وَالْاِكْرَامِ ﴿٧٨﴾

তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান তোমরা অস্বীকার করবে? তাঁবুতে অবস্থানরত হুরগণ।[৫১] তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান তোমরা অস্বীকার করবে? এসব জান্নাতবাসীদের পূর্বে কখনো কোন মানুষ বা জিন তাদের স্পর্শও করেনি। তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান তোমরা অস্বীকার করবে। ঐ সব জান্নাতবাসী সবুজ গালিচা ও সূক্ষ্ম পরিমার্জিত অনুপম ফরাশের[৫২] ওপর হেলান দিয়ে বসবে। তোমাদের রবের কোন্ কোন্ দান তোমরা অস্বীকার করবে? তোমার মহিমান্বিত ও দাতা রবের নাম অত্যন্ত কল্যাণময়।

বান্দাদের জন্য এবং এ দু'টি বাগান হবে "আসহাবুল ইয়ামীন"–দের জন্য। দ্বিতীয় অর্থের সম্ভাবনাটি যে কারণে দৃঢ় ভিত্তি লাভ করছে তা হলো, সূরা ওয়াকি'আয় সৎকর্মশীল মানুষদের দু'টি শ্রেণীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। একটি "সাবেকীন" বা অগ্রবর্তীগণ। তাদেরকে "মুকাররাবীন" বা নৈকট্য লাভকারীও বলা হয়েছে। অপরটি "আসহাবুল ইয়ামীন"। তাদেরকে "আসহাবুল মায়মানা" নামেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুতরাং তাদের উভয় শ্রেণীর জন্য দু'টি আলাদা বৈশিষ্টের জান্নাতের কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া আবু মূসা আশ'আরী থেকে তাঁর পুত্র আবু বকর যে হাদীস বর্ণনা করেছে সে হাদীসটিও এ সম্ভাবনাকে জোরদার করছে। আবু মূসা আশ'আরী বর্ণিত উক্ত হাদীসে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সাবেকীন অগ্রগামী বা "মুকাররাবীন"—নৈকট্য লাভকারীদের জন্য যে দু'টি জান্নাত হবে তার পাত্র ও আসবাবপত্রসমূহের প্রতিটি জিনিস হবে স্বর্ণের। আর 'তাবেয়ীন' বা "আসহাবুল ইয়ামীন"দের জন্য যে দু'টি জান্নাত হবে তার পাত্র ও আসবাবপত্রসমূহ হবে রৌপ্যের (ফাতহুল বারী, কিতাবুত তাফসীর, তাফসীরে সূরা আর রাহমান)।

৫০. এসব বাগানের পরিচয় দানের জন্য مُدْهَآمَّتٰنِ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। مُدْهَامَّة বলা হয় এমন ঘন নিবিড় শ্যামলতাকে যা মাত্রাতিরিক্ত হওয়ার কারণে অনেকটা কাল বর্ণ ধারণ করেছে।

৫১. 'হুর' শব্দের ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাফ্ফাতের তাফসীর, টীকা ২৮–২৯ এবং সূরা দুখানের তাফসীর টীকা ৪২। রাজা বাদশাহ ও আমীর উমরাদের

জন্য প্রমোদ কেন্দ্রসমূহে যে ধরনের তাঁবু খাটানো হয়ে থাকে এখানে তাঁবু বলতে সম্ভবত সেই ধরনের তাঁবু বুঝানো হয়েছে। জান্নাতবাসীদের স্ত্রীগণ সম্ভবত তাদের সাথে প্রাসাদে বাস করবে এবং তাদের জন্য বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত প্রমোদ কেন্দ্রসমূহের তাঁবুতে হুরগণ তাদের জন্য আনন্দ স্ফূর্তি ও আরাম-আয়েশের উপকরণ সরবরাহ করবে। আমাদের এ ধারণার ভিত্তি হচ্ছে, প্রথমে উত্তম চরিত্র ও সুদর্শনা স্ত্রীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তারপর স্বতন্ত্রভাবে আবার হুরদের কথা উল্লেখ করার অর্থই হচ্ছে, এরা হবে স্ত্রীদের থেকে ভিন্ন প্রকৃতির নারী। উম্মে সালামা কর্তৃক বর্ণিত হাদীস থেকে এ ধারণা আরো দৃঢ় ভিত্তি লাভ করে। তিনি বলেছেন, "আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম ঃ হে আল্লাহর রসূল পৃথিবীর নারীরাই উত্তম না হুরেরা? রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জবাব দিলেন ঃ হুরদের তুলনায় পৃথিবীর নারীদের মর্যাদা ঠিক ততটা বেশী যতটা বেশী মর্যাদা আবরণের চেয়ে তার ভিতরের বস্তুর। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এর কারণ কি? তিনি বললেন ঃ কারণ, পৃথিবীর নারী নামায পড়েছে, রোযা রেখেছে এবং ইবাদাত-বন্দেগী করেছে।" (তাবারানী) এ থেকে জানা যায়, যেসব নারীরা দুনিয়াতে ঈমান এনেছিল এবং নেক কাজের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকেই দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছিলো তারাই হবে জান্নাতবাসীদের স্ত্রী। তারা নিজেদের ঈমান ও নেক আমলের ফলশ্রুতিতে জান্নাতে যাবে এবং একান্ত নিজস্বভাবেই জান্নাতের নিয়ামত লাভের অধিকারিনী হবে। তারা নিজেদের ইচ্ছা ও পছন্দ অনুসারে হয় নিজেদের পূর্বতন স্বামীদের স্ত্রী হবে—যদি তারাও জান্নাতবাসী হয়। নয়তো আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে অন্য কোন জান্নাতবাসী পুরুষের সাথে বিয়ে দিয়ে দেবেন যদি তারা উভয়েই পরস্পরে সাহচর্য ও বন্ধুত্ব পছন্দ করে। এরপর থাকে হুরদের বিষয়টি। তারা নিজেদের কোন নেক কাজের ফলশ্রুতিতে নিজ অধিকারের ভিত্তিতে জান্নাতবাসিনী হবে না। বরং জান্নাতের অন্যান্য নিয়ামতের মত একটি নিয়ামত হিসেবে আল্লাহ তাদেরকে যুবতী, সুন্দরী ও রূপবতী নারীর আকৃতি দিয়ে জান্নাতবাসীদেরকে নিয়ামত হিসেবে দান করবেন যাতে তারা তাদের সাহচর্য উপভোগ করতে পারে। তবে কোন অবস্থাতেই তারা জিন বা পরী শ্রেণীর কোন সৃষ্ট জীব হবে না। কারণ, মানুষ কখনো ভিন্ন প্রজাতির সান্নিধ্যে ও সাহচর্যে অভ্যস্ত ও তৃপ্ত হতে পারে না। এ কারণে খুব সম্ভব তারা হবে সেই সব নিষ্পাপ মেয়ে যারা প্রাপ্ত বয়স্কা হওয়ার আগেই মৃত্যুবরণ করেছিল। তাদের পিতা-মাতাও জান্নাত লাভ করেনি যে, সন্তান হিসেবে পিতা-মাতার সাথে জান্নাতে থাকার সুযোগ পাবে।

৫২. মূল আয়াতে عبقرى শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। জাহেলী যুগের আরবীয় কিচ্ছা-কাহিনীতে জিনদের রাজধানীর নাম ছিল عبقر (আবকার)। বাংলা ভাষায় আমরা যাকে পরীস্থান বলে থাকি। এ কারণে আরবের লোকেরা প্রতিটি উৎকৃষ্ট ও দুষ্প্রাপ্য বস্তুকে عبقرى আবকারী বলতো। অর্থাৎ তা যেন পরীস্থানের বস্তু, দুনিয়ার সাধারণ কোন বস্তু তার সমকক্ষ নয়। এমনকি যে ব্যক্তি অসাধারণ যোগ্যতার অধিকারী, যার দ্বারা অদ্ভুত ও বিস্ময়কর কার্যাদি সম্পন্ন হয় তাদের পরিভাষায় তাকেও (عبقرى) আবকারী বলতো। ইংরেজী (Genius) শব্দটিও এ অর্থেই বলা হয়ে থাকে এ শব্দটিও আবার Geni শব্দ থেকে গৃহীত যা জিন শব্দের সমার্থক। এ কারণে আরববাসীদেরকে জান্নাতের সাজ-সরঞ্জাম ও আসবাবপত্রের অস্বাভাবিক উৎকৃষ্ট ও সুন্দর হওয়ার ধারণা দেয়ার জন্য عبقرى আবকারী শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

আল ওয়াকি'আ

৫৬

নামকরণ

সূরার সর্বপ্রথম আয়াতে اَلْوَاقِعَةُ শব্দটিকে এর নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে।

নাযিলের সময়-কাল

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস সূরাসমূহ নাযিলের যে পরম্পরা বর্ণনা করেছেন তাতে তিনি বলেছেন ঃ প্রথমে সূরা ত্বাহা নাযিল হয়, তারপর আল ওয়াকি'আ এবং তারও পরে আশ শু'আরা (الاتقان للسيوطى)। ইকরিমাও এ পরম্পরা বর্ণনা করেছেন (بيهقى دلائل النبوة)।

হযরত উমর রাদ্বিয়াল্লাহ আনহুর ইসলাম গ্রহণ সম্পর্কে ইবনে হিশাম ইবনে ইসহাক থেকে যে কাহিনী বর্ণনা করেছেন তা থেকেও এ মতের সমর্থন পাওয়া যায়। কাহিনীতে বলা হয়েছে হযরত উমর (রা) যখন তাঁর বোনের ঘরে প্রবেশ করলেন তখন সূরা ত্বাহা তেলাওয়াত করা হচ্ছিলো। তাঁর উপস্থিতির আভাস পেয়ে সবাই কুরআনের আয়াত লিখিত পাতাসমূহ লুকিয়ে ফেললো। হযরত উমর (রা) প্রথমেই ভগ্নিপতির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু তাকে রক্ষা করার জন্য বোন এগিয়ে আসলে তাকেও এমন প্রহার করলেন যে, তাঁর মাথা ফেটে গেল। বোনের শরীর থেকে রক্ত ঝরতে দেখে হযরত উমর (রা) অত্যন্ত লজ্জিত হলেন। তিনি বললেন, তোমরা যে সহীফা লুকিয়েছো তা আমাকে দেখাও। তাতে কি লেখা আছে দেখতে চাই। তাঁর বোন বললেন, শিরকে লিপ্ত থাকার কারণে আপনি অপবিত্র وانه لايمسها الا الطاهر "কেবল পবিত্র লোকেরাই ঐ সহীফা হাতে নিতে পারে।" একথা শুনে হযরত উমর (রা) গিয়ে গোসল করলেন এবং তারপর সহীফা নিয়ে পাঠ করলেন। এ ঘটনা থেকে জানা যায় যে, তখন সূরা ওয়াকি'আ নাযিল হয়েছিল। কারণ ঐ সূরার মধ্যেই لَا يَمَسُّهُ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ আয়াতাংশ আছে। আর একথা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত যে, হযরত উমর (রা) হাবশায় হিজরতের পর নবুওয়াতের ৫ম বছরে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরার বিষয়বস্তু হচ্ছে আখেরাত, তাওহীদ ও কুরআন সম্পর্কে মক্কার কাফেরদের সন্দেহ-সংশয়ের প্রতিবাদ। এক দিন যে কিয়ামত হবে, পৃথিবী ও নভোমণ্ডলের সমস্ত ব্যবস্থা ধ্বংস ও লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে। তারপর সমস্ত মৃত মানুষকে পুনরায় জীবিত করে

তাদের হিসেব–নিকেশ নেয়া হবে এবং সৎকর্মশীল মানুষদেরকে জান্নাতের বাগানসমূহে রাখা হবে আর গোনাহগারদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে—এসব কথাকে তারা সর্বাধিক অবিশ্বাস্য বলে মনে করতো। তারা বলতো ঃ এসব কল্পনা মাত্র। এসব বাস্তবে সংঘটিত হওয়া অসম্ভব। এর জবাবে আল্লাহ বলছেন ঃ এ ঘটনা প্রকৃতই যখন সংঘটিত হবে তখন এসব মিথ্যা কথকদের কেউ–ই বলবে না যে, তা সংঘটিত হয়নি তার আগমন রুখে দেয়ার কিংবা তার বাস্তবতাকে অবাস্তব বানিয়ে দেয়ার সাধ্যও কারো হবে না। সে সময় সমস্ত মানুষ অনিবার্যরূপে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যাবে। এক, সাবেকীন বা অগ্রগামীদের শ্রেণী। দুই, সালেহীন বা সাধারণ নেক্‌কারদের শ্রেণী। এবং তিন, সেই সব মানুষ যারা আখেরাতকে অস্বীকার করতো এবং আমৃত্যু কুফরী, শিরক ও কবীরা গোনাহর ওপর অবিচল ছিল। এ তিনটি শ্রেণীর সাথে যে আচরণ করা হবে ৭ থেকে ৫৬ আয়াত পর্যন্ত তা সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।

এরপর ৫৭ থেকে ৭৪ আয়াত পর্যন্ত তাওহীদ ও আখেরাত ইসলামের এ দু'টি মৌলিক আকীদার সত্যতা সম্পর্কে পর পর যুক্তি–প্রমান পেশ করা হয়েছে। এ দু'টি বিষয়কেই কাফেররা অস্বীকার করে আসছিলো। এ ক্ষেত্রে যুক্তি–প্রমাণ হিসেবে পৃথিবী ও নভোমণ্ডলের অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে মানুষকে তার নিজের সত্তার প্রতি যে খাবার সে খায় সে খাবারের প্রতি, যে পানি সে পান করে সে পানির প্রতি এবং যে আগুনের সাহায্যে সে নিজের খাবার তৈরী করে সে আগুনের প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। তাকে এ প্রশ্নটি নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা–ভাবনা করার আহবান জানানো হয়েছে যে, যে আল্লাহর সৃষ্টি করার কারণে তুমি সৃষ্টি হয়েছো যার দেয়া জীবন যাপনের সামগ্রীতে তুমি প্রতিপালিত হচ্ছো, তাঁর মোকাবিলায় তুমি স্বাধীন স্বেচ্ছাচারী হওয়ার কিংবা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব করার কি অধিকার তোমার আছে? তাঁর সম্পর্কে তুমি এ ধারণা করে বসলে কি করে যে, তিনি একবার তোমাকে অস্তিত্ব দান করার পর এমন অক্ষম ও অথর্ব হয়ে পড়েছেন যে, পুনরায় তোমাকে অস্তিত্ব দান করতে চাইলেও তা পারবেন না?

তারপর ৭৫ থেকে ৮২ আয়াত পর্যন্ত কুরআন সম্পর্কে তাদের নানা রকম সন্দেহ–সংশয় নিরসন করা হয়েছে। তাদের মধ্যে এ উপলব্ধি সৃষ্টিরও চেষ্টা করা হয়েছে যে, হতভাগারা তোমাদের কাছে এ তো এক বিরাট নিয়ামত এসেছে। অথচ এ নিয়ামতের সাথে তোমাদের আচরণ হলো, তোমরা তা প্রত্যাখ্যান করছো এবং তা থেকে উপকৃত হওয়ার পরিবর্তে তার প্রতি কোন ভ্রূক্ষেপই করছো না। কুরআনের সত্যতা সম্পর্কে দু'টি সংক্ষিপ্ত বাক্যে অনুপম যুক্তি পেশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে যদি কুরআন নিয়ে কেউ গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখে তাহলে তার মধ্যেও ঠিক তেমনি মজবুত ও সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা দেখতে পাবে যেমন মজবুত ও সুশৃংখল ব্যবস্থাপনা আছে মহাবিশ্বের তারকা ও গ্রহরাজির মধ্যে। আর এসব একথাই প্রমাণ করে যে, যিনি এই মহাবিশ্বের নিয়ম–শৃংখলা ও বিধান সৃষ্টি করেছেন কুরআনের রচয়িতাও তিনিই। তারপর কাফেরদের বলা হয়েছে, এ গ্রন্থ সেই ভাগ্যলিপিতে উৎকীর্ণ আছে যা সমস্ত সৃষ্টির নাগালের বাইরে। তোমরা মনে করো শয়তান মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এ গ্রন্থের কথাগুলো নিয়ে আসে। অথচ 'লাওহে মাহফুজ' থেকে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত যে মাধ্যমে এ কুরআন পৌছায় তাতে পবিত্র আত্মা ফেরেশতারা ছাড়া আর কারো সামান্যতম হাতও থাকে না।

সর্বশেষে মানুষকে বলা হয়েছে, তুমি যতই গর্ব ও অহংকার করো না কেন এবং নিজের স্বেচ্ছাচারিতার অহমিকায় বাস্তব সম্পর্কে যতই অন্ধ হয়ে থাক না কেন, মৃত্যুর মুহূর্তটি তোমার চোখ খুলে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। সে সময় তুমি একান্তই অসহায় হয়ে পড়ো। নিজের পিতা-মাতাকে বাঁচাতে পার না। নিজের সন্তান-সন্ততিকে বাঁচাতে পার না। নিজের পীর ও মুর্শিদ এবং অতি প্রিয় নেতাদেরকে বাঁচাতে পার না। সবাই তোমার চোখের সামনে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে আর তুমি অসহায়ের মত দেখতে থাক। তোমার ওপরে যদি কোন উচ্চতর ক্ষমতার অধিকারী ও শাসক না-ই থেকে থাকে এবং পৃথিবীতে কেবল তুমিই থেকে থাক, কোন আল্লাহ না থেকে থাকে, তোমার এ ধারণা যদি ঠিক হয় তাহলে কোন মৃত্যুপথযাত্রীর বেরিয়ে যাওয়া প্রাণ ফিরিয়ে আনতে পার না কেন? এ ব্যাপারে তুমি যেমন অসহায় ঠিক তেমনি আল্লাহর সামনে জবাবদিহি এবং তার প্রতিদান ও শাস্তি প্রতিহত করাও তোমার সাধ্যের বাইরে। তুমি বিশ্বাস কর আর নাই কর, মৃত্যুর পর প্রত্যেক মৃত ব্যক্তিকে তার পরিণাম অবশ্যই ভোগ করতে হবে। "মুকাররাবীন" বা নৈকট্য লাভকারীদের অন্তরভুক্ত হলে 'মুকাররাবীনদের' পরিণাম ভোগ করবে। 'সালেহীন' বা সৎকর্মশীল হলে সালেহীনদের পরিণাম ভোগ করবে এবং অস্বীকারকারী পথভ্রষ্টদের অন্তরভুক্ত হলে সেই পরিণাম লাভ করবে যা এ ধরনের পাপীদের জন্য নির্ধারিত আছে।

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ﴿١﴾ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ﴿٢﴾ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ﴿٣﴾
إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا ﴿٤﴾ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ﴿٥﴾ فَكَانَتْ هَبَاءً مُّنْبَثًّا ﴿٦﴾
وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ﴿٧﴾ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ﴿٨﴾
وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۙ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ﴿٩﴾

যখন সেই মহা ঘটনা সংঘটিত হবে তখন তার সংঘটিত হওয়াকে কেউ–ই মিথ্যা বলতে পারবে না।[১] তা হবে উলট–পালটকারী মহা প্রলয়।[২] পৃথিবীকে সে সময় অকস্মাত ভীষণভাবে আলোড়িত করা হবে[৩] এবং পাহাড়কে এমন টুকরো টুকরো করে দেয়া হবে যে, তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে।

সে সময় তোমরা তিনটি দলে বিভক্ত হয়ে যাবে।[৪]

ডান দিকের লোক।[৫] ডান দিকের লোকদের (সৌভাগ্যের) কথা আর কতটা বলা যাবে।

বাম দিকের লোক[৬] বাম দিকের লোকদের (দুর্ভাগ্যের) পরিণতি আর কি বলা যাবে।

১. এ আয়াতাংশ দ্বারা বক্তব্য শুরু করা স্বতসিদ্ধভাবেই প্রমাণ করে যে, সে সময় কাফেরদের মজলিস–সমূহে কিয়ামতের বিরুদ্ধে যেসব কাহিনী ফাঁদা হতো এবং গালগল্প করা হতো, এটা তার জবাব। যখন মক্কার লোক রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে সবেমাত্র ইসলামের দাওয়াত শুনছে এটা ঠিক সে সময়ের কথা। এর মধ্যে তাদের কাছে যে জিনিসটি সবচেয়ে বেশী অদ্ভুত, অযৌক্তিক ও অসম্ভব বলে মনে হতো তা হচ্ছে, এক দিন আসমান যমীনের এ ব্যবস্থাপনা ধ্বংস হয়ে যাবে এবং তারপর অন্য একটি জগত সৃষ্টি হবে যেখানে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীকালের সমস্ত মৃত মানুষকে পুনরায় জীবিত করা হবে। একথা শুনে তাদের চোখ বিস্ময়ে বিস্ফারিত হয়ে যেতো। তারা বলতো : এটা হওয়া একেবারেই অসম্ভব। তাহলে এ পৃথিবী, পাহাড় পর্বত, সমুদ্র, চন্দ্র এবং সূর্য কোথায় যাবে। শত শত হাজার হাজার বছরের কবরস্থ মৃতরা কিভাবে জীবিত হয়ে উঠবে? মৃত্যুর পরে পুনরায় জীবনলাভ, তারপর সেখানে থাকবে বেহেশতের বাগান ও

দোযখের আগুন এসব স্বপ্নচারিতা ও আকাশ কুসুম কল্পনা মাত্র। বুদ্ধিবিবেক ও সুস্থ মস্তিষ্কে আমরা এসব কি করে মেনে নিতে পারি? মক্কার সর্বত্র তখন এই গালগল্পকে কেন্দ্র করে আসর জমছিলো। এ পটভূমিতে বলা হয়েছে, যখন সে মহা ঘটনা সংঘটিত হবে তখন তা অস্বীকার করার মত কেউ থাকবে না।

এ বাণীর মধ্যে কিয়ামত বুঝাতে وَاقِعَةٌ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে এর অর্থ যা অনিবার্য ও অবধারিত। অর্থাৎ তা এমন জিনিস যা অনিবার্যরূপেই সংঘটিত হতে হবে। এর সংঘটিত হওয়াকে আবার وقعة শব্দ দিয়ে বুঝানো হয়েছে। আরবী ভাষায় এ শব্দটি আকস্মিকভাবে কোন বড় দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়া বুঝাতে ব্যবহৃত হয়। لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ কথাটির দু'টি অর্থ হতে পারে। এক, এর সংঘটিত হওয়ার সম্ভাবনা তিরোহিত হওয়া, আগমন থেমে যাওয়া কিংবা এর আগমন ফিরিয়ে দেয়া সম্ভব হবে না। অন্য কথায়, এ বাস্তব ঘটনাকে অবাস্তব ও অস্তিত্বহীন বানিয়ে দেয়ার মত কেউ থাকবে না। দুই, কোন জীবন্ত সত্তাই তখন এ মিথ্যা কথা বলবে না যে, এ ঘটনা আদৌ সংঘটিত হয়নি।

২. মূল আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ হচ্ছে خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ "নীচুকারী ও উঁচুকারী" এর একটি অর্থ হতে পারে সেই মহা ঘটনা সব কিছু উলট–পালট করে দেবে। নীচের জিনিস উপরে উঠে যাবে এবং উপরের জিনিস নীচে নেমে যাবে। আরেকটি অর্থ এও হতে পারে যে, তা নীচে পতিত মানুষদেরকে উপরে উঠিয়ে দেবে এবং উপরের মানুষদেরকে নীচে নামিয়ে দেবে। অর্থাৎ তা আসার পর মানুষের মধ্যে মর্যাদা ও অমার্যাদার ফায়সালা হবে সম্পূর্ণ আলাদা ভিত্তি ও দৃষ্টিকোণ থেকে। যারা পৃথিবীতে নিজেদেরকে অতি সম্মানিত বলে দাবী করে বেড়াতো তারা লাঞ্ছিত হবে আর যাদের নীচ ও হীন মনে করা হতো তারা মর্যাদা লাভ করবে।

৩. অর্থাৎ তা কোন আঞ্চলিক সীমিত মাত্রার ভূমিকম্প হবে না। বরং যুগপৎ সমগ্র পৃথিবীকে গভীর আলোড়নে প্রকম্পিত করবে। পৃথিবী হঠাৎ করে এমন বিরাট ঝাঁকুনি খাবে যার ফলে তা লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে।

৪. যাদেরকে এ বক্তব্য শুনানো হচ্ছিলো কিংবা এখন যারা তা পড়বে বা শুনবে, বাহ্যত কেবল তাদেরকে সম্বোধন করা হলেও প্রকৃতপক্ষে গোটা মানব জাতিকেই সম্বোধন করা হয়েছে। সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষ সৃষ্টি হয়েছে তারা সবাই কিয়ামতের দিন তিন ভাগে বিভক্ত হবে।

৫. মূল আয়াতে أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ব্যাকরণ অনুসারে ميمنة শব্দটি يمين শব্দ থেকে গৃহিত হতে পারে—যার অর্থ ডান হাত। আবার يمن শব্দ থেকেও গৃহিত হতে পারে যার অর্থ শুভ লক্ষণ। যদি ধরে নেয়া যায় যে, এ শব্দটির উৎপত্তি يمين শব্দ থেকে হয়েছে তাহলে أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ এর অর্থ হবে "ডান হাতের অধিকারী।" কিন্তু এখানে এর আভিধানিক অর্থ অভিপ্রেত নয়। এর দ্বারা বুঝানো হয়েছে উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন লোক ডান হাতকে আরবের লোকেরা শক্তি, মহত্ব ও মর্যাদার প্রতীক বলে মনে করতো। যাকে মর্যাদা প্রদর্শন উদ্দেশ্য হতো মজলিসের মধ্যে তাকে ডান হাতের দিকে বসাতো। আমার কাছে অমুক ব্যক্তির অনেক সম্মান ও মর্যাদা একথা বুঝানোর প্রয়োজন হলে বলতো ঃ فُلَانٌ مِنِّي بِالْيَمِينِ সে তো আমার

وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ﴿١٠﴾ اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ﴿١١﴾ فِيْ جَنّٰتِ النَّعِيْمِ ﴿١٢﴾ ثُلَّةٌ
مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٣﴾ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ﴿١٤﴾ عَلٰى سُرُرٍ مَّوْضُوْنَةٍ ﴿١٥﴾ مُّتَّكِـِٕيْنَ
عَلَيْهَا مُتَقٰبِلِيْنَ ﴿١٦﴾ يَطُوْفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُوْنَ ﴿١٧﴾ بِاَكْوَابٍ
وَّاَبَارِيْقَ ۙ وَكَاْسٍ مِّنْ مَّعِيْنٍ ﴿١٨﴾ لَّا يُصَدَّعُوْنَ عَنْهَا وَلَا يُنْزِفُوْنَ ﴿١٩﴾
وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُوْنَ ﴿٢٠﴾ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُوْنَ ﴿٢١﴾

আর অগ্রগামীরা তো অগ্রগামীই।[৭] তারাই তো নৈকট্য লাভকারী। তারা নিয়ামতে ভরা জান্নাতে থাকবে। পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে হবে বেশী এবং পরবর্তীদের মধ্য থেকে হবে কম।[৮] তারা মণিমুক্তা খচিত আসনসমূহে হেলান দিয়ে সামনা সামনি বসবে। তাদের মজলিসে চির কিশোররা[৯] বহমান ঝর্ণার সুরায় ভরা পান পাত্র, হাতল বিশিষ্ট সুরা পাত্র এবং হাতলবিহীন বড় সুরা পাত্র নিয়ে সদা ব্যস্ত থাকবে—যা পান করে মাথা ঘুরবে না কিংবা বুদ্ধিবিবেক লোপ পাবে না।[১০] তারা তাদের সামনে নানা রকমের সুস্বাদু ফল পরিবেশন করবে যাতে পছন্দ মত বেছে নিতে পারে। পাখীর গোশত পরিবেশন করবে, যে পাখীর গোশত ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারবে।[১১]

ডান হাতের পাশে। আমাদের ভাষাতেও কাউকে কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির 'দক্ষিণ হস্ত' বলার অর্থ সে তার ঘনিষ্ঠ জন। আর যদি ধরে নেয়া যায় যে, এর উৎপত্তি يمن শব্দ থেকে হয়েছে তাহলে اصحاب الميمنة এর অর্থ হবে 'খোশ নসীব' ও সৌভাগ্যবান।

৬. মূল ইবারতে "أَصْحَابُ الْمَشْئَمَةِ" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। مشئمة শব্দের উৎপত্তি হয়েছে شئوم থেকে। এর অর্থ, দুর্ভাগ্য, কুলক্ষণ, অশুভ লক্ষণ। আরবী ভাষায় বাঁ হাতকেও شومى বলা হয়। আরবরা شمال (বাঁ হাত) এবং شوم অশুভ লক্ষণ, শব্দ দু'টিকে সমার্থক বলে মনে করতো। তাদের কাছে বাঁ হাত দুর্বলতা ও লাঞ্ছনার প্রতীক। সফরে রওয়ানা হওয়ার সময় যদি পাখী তাদের বাঁ হাতের দিক দিয়ে উড়ে যেতো তাহলে তারা একে অশুভ লক্ষণ বলে মনে করতো। কাউকে বাঁ পাশে বসালে তার অর্থ হতো সে তাকে নীচু মর্যাদার লোক মনে করে। আমার কাছে তার কোন মর্যাদা নেই কারো সম্পর্কে যদি একথা বলতে হয় তাহলে বলা হয় فلان منى بالشمال সে আমার বাঁ পাশের লোক। বাংলা ভাষাতেও খুব হালকা ও সহজ কাজ বুঝাতে বলা হয়, এটা আমার বাঁ হাতের খেলা। অতএব اصحاب المشئمة অর্থ দুর্ভাগা লোক অথবা এমন লোক যারা আল্লাহর কাছে লাঞ্ছনার শিকার হবে এবং আল্লাহর দরবারে তাদেরকে বাঁ দিকে দাঁড় করানো।

৭. سابقين (অগ্রগামীগণ) অর্থ যারা সৎকাজ ও ন্যায়পরায়ণতায় সবাইকে অতিক্রম করেছে, প্রতিটি কল্যাণকর কাজে সবার আগে থেকেছে। আল্লাহ ও রসূলের আহবানে সবার আগে সাড়া দিয়েছে, জিহাদের ব্যাপারে হোক কিংবা আল্লাহর পথে খরচের ব্যাপারে হোক কিংবা জনসেবার কাজ হোক কিংবা কল্যাণের পথে দাওয়াত কিংবা সত্যের পথে দাওয়াতের কাজ হোক মোট কথা পৃথিবীতে কল্যাণের প্রসার এবং অকল্যাণের উচ্ছেদের জন্য ত্যাগ ও কুরবানী এবং শ্রমদান জীবনপনের যে সুযোগই এসেছে তাতে সে-ই অগ্রগামী হয়ে কাজ করেছে। এ কারণে আখেরাতেও তাদেরকেই সবার আগে রাখা হবে। অর্থাৎ আখেরাতে আল্লাহ তা'আলার দরবারের চিত্র হবে এই যে, ডানে থাকবে 'সালেহীন' বা (নেককারগণ, বাঁয়ে থাকবে ফাসেক বা পাপীরা এবং সবার আগে আল্লাহ তা'আলার দরবারের নিকটে থাকবেন 'সাবেকীন'গণ। হাদীসে হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদের জিজ্ঞেস করলেন? তোমরা কি জান কিয়ামতের দিন কারা সর্বপ্রথম পৌছবে এবং আল্লাহর ছায়ায় স্থান লাভ করবে? সবাই বললেন। আল্লাহ এবং আল্লাহর রসূলই ভাল জানেন। তিনি বললেনঃ

الذين اذا اعطو الحق قبلوه ، واذا سئلوه بذلوه ، وحكموا الناس كحكمهم لانفسهم -

"যাদের অবস্থা ছিল এই যে, তাদের সামনে যখনই সত্য পেশ করা হয়েছে, তা গ্রহণ করেছে। যখনই তাদের কাছে প্রাপ্য চাওয়া হয়েছে, তখনই তা দিয়ে দিয়েছে। আর তারা নিজেদের ব্যাপারে যে ফায়সালা করেছে অন্যদের ব্যাপারেও সেই ফায়সালা করেছে। "(মুসনাদে আহমদ)।"

৮. 'আওয়ালীন' ও আখেরীন' অর্থাৎ অগ্রবর্তী ও পরবর্তী বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে সে ব্যাপারে তাফসীরকারদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। এক দলের মতে আদম আলাইহিস সালাম থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত প্রাপ্তি পর্যন্ত যত উম্মত অতিক্রান্ত হয়েছে তারা 'আওয়ালীন' আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত যত মানুষের আগমন ঘটবে তারা সবাই আখেরীন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে আয়াতের অর্থ হবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত পূর্ববর্তী হাজার হাজার বছরে যত মানুষ চলে গিয়েছে তাদের মধ্য থেকে 'সাবেকীন'দের সংখ্যা বেশী হবে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াত লাভের পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আগমনকারী মানুষদের মধ্যে যারা 'সাবেকীন'দের মর্যাদা লাভ করবে তাদের সংখ্যা হবে কম। দ্বিতীয় দল বলেন, এখানে 'আওয়ালীন' ও 'আখেরীন' অর্থ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মতের 'আওয়ালীন' ও 'আখেরীন'। অর্থাৎ তাঁর উম্মতের প্রাথমিক যুগের লোকেরা হচ্ছে 'আওয়ালীন'। তাদের মধ্যে 'সাবেকীনদের সংখ্যা হবে বেশী। পরবর্তী যুগের লোকেরা হচ্ছে 'আখেরীন'। তাদের মধ্যে সাবেকীনদের সংখ্যা হবে কম। তৃতীয় দল বলেন ঃ এর অর্থ প্রত্যেক নবীর উম্মতের 'আওয়ালীন' ও 'আখেরীন'। অর্থাৎ প্রত্যেক নবীর প্রাথমিক যুগের অনুসারীদের মধ্যে আওয়ালীনদের সংখ্যা বেশী হবে এবং পরবর্তীকালের অনুসারীদের মধ্যে তাদের সংখ্যা কম হবে। আয়াতের শব্দাবলী এ তিনটি অর্থই ধারণ করছে। এখানে

তাদের জন্য থাকবে সুনয়না হুর এমন অনুপম সুন্দরী যেন লুকিয়ে রাখা মুক্তা।[১২] দুনিয়াতে তারা যেসব কাজ করেছে তার প্রতিদান হিসেবে এসব লাভ করবে। সেখানে তারা কোন অর্থহীন বা গোনাহর কথা শুনতে পাবে না।[১৩] বরং যে কথাই শুনবে তা হবে যথাযথ ও ঠিকঠাক।[১৪]

আর ডান দিকের লোকেরা। ডান দিকের লোকদের সৌভাগ্যের কথা আর কতটা বলা যাবে। তারা কাঁটাহীন কুল গাছের কুল,[১৫] থরে বিথরে সজ্জিত কলা, দীর্ঘ বিস্তৃত ছায়া, সদা বহমান পানি, অবাধ লভ্য অনিশেষ যোগ্য প্রচুর ফলমূল[১৬] এবং সুউচ্চ আসনসমূহে অবস্থান করবে। তাদের স্ত্রীদেরকে আমি বিশেষভাবে নতুন করে সৃষ্টি করবো এবং কুমারী বানিয়ে দেব।[১৭] তারা হবে নিজের স্বামীর প্রতি আসক্ত[১৮] ও তাদের সমবয়স্কা।[১৯] এসব হবে ডান দিকের লোকদের জন্য।

এ তিনটি অর্থই প্রযোজ্য হওয়াটা বিচিত্র নয়। কারণ, প্রকৃত পক্ষে এসব অর্থের মধ্যে কোন বৈপরীত্য নেই। এছাড়াও এসব শব্দ থেকে আরো একটি অর্থ পাওয়া যায়। সেটিও নির্ভুল অর্থ। অর্থাৎ প্রতিটি প্রাথমিক যুগে মানব গোষ্ঠীর মধ্যে 'সাবেকীন'দের অনুপাত থাকবে বেশী এবং পরবর্তী যুগে সে অনুপাত থাকবে কম। তাই মানুষের সংখ্যা যত দ্রুত বৃদ্ধি পায় নেক কাজে অগ্রগামী মানুষের সংখ্যা সে গতিতে বৃদ্ধি পায় না। গণনার দিক দিয়ে তাদের সংখ্যা প্রথম যুগের সাবেকীনদের চেয়ে অধিক হলেও পৃথিবীর সমস্ত জনবসতির বিচারে তাদের অনুপাত ক্রমান্বয়ে হ্রাস পেতে থাকে।

৯. অর্থাৎ এমন সব বালক যারা চিরদিনই বালক থাকবে। তাদের বয়স সব সময় একই অবস্থায় থেমে থাকবে। হযরত আলী (রা) ও হযরত হাসান বাসরী (র) বলেন : এরা দুনিয়ার মানুষের সেসব শিশু সন্তান যারা বয়োপ্রাপ্ত হওযার আগেই মৃত্যুবরণ

করেছিলো। সূতরাং তাদের এমন কোন নেকী থাকবে না যার প্রতিদান দেয়া যেতে পারে এবং এমন কোন বদ কাজও থাকবে না যার শাস্তি দেয়া যেতে পারে। তবে একথা সুস্পষ্ট যে, তারা হবে পৃথিবীর এমন লোকদের সন্তান যাদের ভাগ্যে জান্নাত জোটেনি। অন্যথায় নেক্কার মু'মিনদের মৃত অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা কুরআন মজীদে নিশ্চয়তা দিয়েছেন যে, তাদের সন্তানদেরকেও জান্নাতে তাদের সাথে একত্রিত করে দেয়া হবে। (আত্ তূর, আয়াত ২১) আবু দাউদ তায়ালেসী, তাবারানী ও বায্যার কর্তৃক হযরত আনাস (রা) ও হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব হতে বর্ণিত হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। উক্ত হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, মুশরিকদের সন্তানরা জান্নাতবাসীদের খাদেম হবে। (অধিক ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাফ্ফাতের তাফসীর, টীকা ২৬, আত তূর, টীকা ১৯)।

১০. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাফ্ফাতের তাফসীর। টীকা ২৭; সূরা মুহাম্মাদ, টীকা ২২, আত তূর, টীকা ১৮।

১১. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা তূর এর তাফসীর, টীকা ১৭।

১২. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা সাফফাতের তাফসীর, টীকা ২৮ ও ২৯ আদ দুখান, টীকা ৪২, আর রাহমান, টীকা ৫১।

১৩. এটি জান্নাতের বড় বড় নিয়ামতের একটি। এসব নিয়ামত সম্পর্কে কুরআন মজীদের কয়েকটি স্থানে বর্ণনা করা হয়েছে যে, মানুষের কান সেখানে কোন অনর্থক ও বাজে কথা, মিথ্যা, গীবত, চোগলখুরী, অপবাদ, গালি, অহংকার ও বাজে গালগপ্প বিদ্রূপ ও উপহাস, তিরস্কার ও বদনামমূলক কথাবার্তা শোনা থেকে রক্ষা পাবে। সেটা কটুভাষী ও অভদ্র লোকদের সমাজ হবে না যে, পরস্পরে কাদা ছুঁড়াছুঁড়ি করবে। সেটা হবে সভ্য ও ভদ্র লোকদের সমাজ যেখানে এসব অর্থহীন ও বেহুদা কথাবার্তার নামগন্ধ পর্যন্ত থাকবে না। আল্লাহ তা'আলা কাউকে যদি সামান্য কিছু শিষ্টতা বোধ ও সুরুচির অধিকারী করে থাকেন তাহলে তিনি ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পারবেন যে পার্থিব জীবনে এটা কত বড় কষ্টদায়ক ব্যাপার। জান্নাতে মানুষকে এ থেকে মুক্তির আশ্বাস দেয়া হয়েছে।

১৪. মূল আয়াতটি হচ্ছে اِلَّا قِيْلًا سَلٰمًا سَلٰمًا কিছুসংখ্যক মুফাসসির ও অনুবাদক এর অর্থ করেছেন সেখানে সব দিক থেকেই কেবল 'সালাম' 'সালাম' শব্দ শুনা যাবে। কিন্তু এর সঠিক অর্থ হচ্ছে সঠিক, সুস্থ ও যথাযথ কথা। অর্থাৎ এমন কথাবার্তা যা দোষ–ত্রুটি মুক্ত, যার মধ্যে পূর্ববর্তী বাক্যে উল্লেখিত মন্দ দিকগুলো নেই। ইংরেজীতে Safe শব্দটি যে অর্থে ব্যবহৃত এখানে সালাম শব্দটি প্রায় সেই একই অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

১৫. অর্থাৎ কাঁটাবিহীন কুল বৃক্ষের কুল। কেউ এ কথা ভেবে বিস্ময় প্রকাশ করতে পারেন যে, কুল আবার এমন কি উৎকৃষ্ট ফল যা জান্নাতে থাকবে বলে সুখবর দেয়া যেতে পারে। কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো, জান্নাতের কুল নয়, এ পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে এ ফলটি এমন সুস্বাদু, খোশবুদার ও মিষ্টি হয় যে, একবার মুখে দিলে রেখে দেয়া কঠিন হয়ে যায়। তাছাড়া কুল যত উন্নতমানের হবে তার গাছ তত কম কাঁটাযুক্ত হবে। তাই

জান্নাতের কুল বৃক্ষের পরিচয় দেয়া হয়েছে এই বলে যে, তাতে মোটেই কাঁটা থাকবে না। অর্থাৎ তা হবে এমন উন্নত জাতের কুল যা এই পৃথিবীতে নেই।

১৬. মূল আয়াত হচ্ছে لَا مَقْطُوعَةٍ وَلَا مَمْنُوعَةٍ । لَا مَقْطُوعَةٍ অর্থ তা কোন মওসুমী ফল হবে না যে, মওসুম শেষ হওয়ার পর আর পাওয়া যাবে না। তার উৎপাদন কোন সময় বন্ধ হবে না যে, কোন বাগানের সমস্ত ফল সংগ্রহ করে নেয়ার পর একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বাগান ফলশূন্য থাকবে। বরং যতই খাওয়া হোক না কেন সেখানে প্রতিটি মওসুমে প্রতিটি ফল পাওয়া যাবে এবং লাগাতার উৎপন্ন হতে থাকবে। আর لَا مَمْنُوعَةٍ অর্থ দুনিয়ার ফল বাগানসমূহের মত সেখানে কোন বাধা বিঘ্ন থাকবে না। ফল আহরণ ও খাওয়ার ব্যাপারে যেমন কোন বাধা থাকবে না তেমনি গাছে কাঁটা না থাকা এবং ফল অধিক উচ্চতায় না থাকার কারণে আহরণ করতেও কোন কষ্ট হবে না।

১৭. অর্থাৎ দুনিয়ার সেসব সৎকর্মশীলা নারী যারা তাদের ঈমান ও নেক আমলের ভিত্তিতে জান্নাত লাভ করবে। পৃথিবীতে তারা যত বৃদ্ধাবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করুক না কেন সেখানে আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে যুবতী বানিয়ে দেবেন। পৃথিবীতে তারা সুন্দরী থাক বা না থাক সেখানে আল্লাহ তাদের পরমা সুন্দরী বানিয়ে দেবেন। পৃথিবীতে তারা কুমারী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে বা সন্তানবতী হয়ে মৃত্যুবরণ করে থাকুক, আল্লাহ তাদের কুমারী বানিয়ে দেবেন। তাদের সাথে তাদের স্বামীরাও যদি জান্নাত লাভ করে থাকে তাহলে তাদেরকে একত্রিত করা হবে। অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা জান্নাতবাসী অন্য কারো সাথে তাদের বিয়ে দিয়ে দেবেন। এ আয়াতের এ ব্যাখ্যা কতিপয় হাদীসের মাধ্যমে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে উদ্ধৃত হয়েছে। 'শামায়েলে তিরমিযী' গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, এক বৃদ্ধা নবীর (সা) কাছে এসে বললো ঃ আমি যেন জান্নাতে যেতে পারি সেজন্য দোয়া করুন। নবী (সা) বললেন ঃ কোন বৃদ্ধা জান্নাতে যাবে না। সে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে যেতে থাকলে তিনি উপস্থিত সবাইকে বললেন ঃ তাকে বলে দাও, সে বৃদ্ধাবস্থায় জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ "আমি তাদেরকে বিশেষভাবে পুনরায় সৃষ্টি করবো এবং কুমারী বানিয়ে দেবো।" ইবনে আবী হাতেম হযরত সালামা ইবনে ইয়াযীদ থেকে হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এর দ্বারা পৃথিবীর মেয়েদের বুঝানো হয়েছে—তারা কুমারী বা বিবাহিতা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে থাকুক তাতে কিছু যায় আসে না। তাবারানীতে হযরত উম্মে সালামা থেকে একটি দীর্ঘ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। উক্ত হাদীসে তিনি নবীর (সা) কাছে জান্নাতের মেয়েদের সম্পর্কে কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানের আয়াতসমূহের অর্থ জিজ্ঞেস করছেন। এক্ষেত্রে এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে নবী (সা) বলেন ঃ

هن اللواتى قبضن فى دار الدنيا عجائز رمصا شمطا خلقهن

الله بعد الكبر فجعلهن عذارى –

"এরা সেসব মেয়ে যারা দুনিয়ার জীবনে খুন খুনে বুড়ী, পিচুটি গলা চোখ ও পাকা সাদা চুল নিয়ে মৃত্যুবরণ করেছিলো। এ বার্ধক্যের পরে আল্লাহ তা'আলা পুনরায় তাদেরকে কুমারী বানিয়ে সৃষ্টি করবেন।"

ثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ ﴿٣٩﴾ وَثُلَّةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ ﴿٤٠﴾ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ ﴿٤١﴾ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٢﴾ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ ﴿٤٣﴾ لَّا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ ﴿٤٤﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُتْرَفِينَ ﴿٤٥﴾ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ ﴿٤٦﴾

২ রুকূ'

তাদের সংখ্যা পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকেও হবে অনেক এবং পরবর্তীদের মধ্য থেকেও হবে অনেক।

বাঁ দিকের লোক। বাঁ দিকের লোকদের দুর্ভাগ্যের কথা আর কি বলা যাবে। তারা লু হাওয়ার হলকা, ফুটন্ত পানি এবং কালো ধোঁয়ার ছায়ার নীচে থাকবে। তা না হবে ঠাণ্ডা, না হবে আরামদায়ক। এরা সেসব লোক যারা এ পরিণতিলাভের পূর্বে সুখী ছিল এবং বারবার বড় বড় গোনাহ করতো।[২০]

হযরত উম্মে সালামা জিজ্ঞেস করেন, পৃথিবীতে কোন মেয়ের যদি একাধিক স্বামী থেকে থাকে তাহলে কে তাকে লাভ করবে? নবী (সা) বলেন ঃ

انها تخير فتختارا حسنهم خلقا فتقول يارب ان هذا كان احسن خلقا معى فزوجنيها - يام سلمة ، ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والاخرة -

"তাকে যাকে ইচ্ছা বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দেয়া হবে। যার আখলাক ও আচরণ সবার চেয়ে ভাল ছিলো সে তাকেই বেছে নেবে। সে আল্লাহ তা'আলাকে বলবে ঃ "হে আমার রব, আমার সাথে তার আচরণ ছিলো সবচেয়ে ভাল। অতএব আমাকে তার স্ত্রী বানিয়ে দিন। হে উম্মে সালামা, উত্তম আচরণ দুনিয়ার সমস্ত কল্যাণ অর্জন করলো।" (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন, সূরা আর রাহমানের তাফসীর, টীকা ৫১)।

১৮. মূল আয়াতে عُرُبًا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় এ শব্দটি মেয়েদের সর্বোত্তম মেয়েসুলভ গুণাবলী বুঝাতে বলা হয়। এ শব্দ দ্বারা এমন মেয়েদের বুঝানো হয় যারা কমনীয় স্বভাব ও বিনীত আচরণের অধিকারিনী, সদালাপী, নারীসুলভ আবেগ অনুভূতি সমৃদ্ধ, মনে প্রাণে স্বামীগত প্রাণ এবং স্বামীও যার প্রতি অনুরাগী।

১৯. এর দুটি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে তারা তাদের স্বামীদের সমবয়সী হবে। অন্য অর্থটি হচ্ছে, তারা পরস্পর সমবয়স্কা হবে। অর্থাৎ জান্নাতের সমস্ত মেয়েদের একই

وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿٤٧﴾ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ ﴿٤٨﴾ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿٤٩﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿٥٠﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ ﴿٥١﴾ لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ ﴿٥٢﴾ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿٥٣﴾ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿٥٤﴾ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ﴿٥٥﴾ هَٰذَا نُزُلُهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿٥٦﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ ﴿٥٧﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تُمْنُونَ ﴿٥٨﴾ أَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿٥٩﴾

বলতো ঃ আমরা যখন মরে মাটিতে মিশে যাবো এবং নিরেট হাড্ডি অবশিষ্ট থাকবো তখন কি আমাদেরকে জীবিত করে তোলা হবে? আমাদের বাপ দাদাদেরকেও কি উঠানো হবে যারা ইতিপূর্বে অতিবাহিত হয়েছে? হে নবী, এদের বলে দাও, নিশ্চিতভাবেই পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের সব মানুষকে একদিন অবশ্যই একত্রিত করা হবে। সে জন্য সময় নির্দিষ্ট করে রাখা হয়েছে। তারপর হে পথভ্রষ্ট ও অস্বীকারকারীরা তোমাদেরকে 'যাক্কূম'[২১] বৃক্ষজাত খাদ্য খেতে হবে। তোমরা ঐ খাদ্য দিয়েই পেট পূর্ণ করবে এবং তার পরই পিপাসার্ত উটের মত ফুটন্ত পানি পান করবে। প্রতিদান দিবসে বাঁ দিকের লোকদের আপ্যায়নের উপকরণ।

আমি তোমাদের[২২] সৃষ্টি করেছি। এরপরও কেন তোমরা মানছো না?[২৩] তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, যে শুক্র তোমরা নিক্ষেপ করো তা দ্বারা সন্তান সৃষ্টি তোমরা করো, না তার স্রষ্টা আমি?[২৪]

বয়স হবে এবং চিরদিন সেই বয়সেরই থাকবে। যুগপৎ এ দু'টি অর্থই সঠিক হওয়া অসম্ভব নয়। অর্থাৎ এসব জান্নাতী নারী পরস্পরও সমবয়সী হবে এবং তাদের স্বামীদেরকেও তাদের সমবয়সী বানিয়ে দেয়া হবে। একটি হাদীসে বলা হয়েছে ঃ

يدخل اهل الجنة الجنة جردا مردا بيضا جعادا مكحلين ابناء ثلاث وثلاثين –

"জান্নাতবাসীরা জান্নাতে প্রবেশ করলে তাদের শরীরে কোন পশম থাকবে না। মোচ ভেজা ভেজা মনে হবে। কিন্তু দাড়ি থাকবে না। ফর্সা শ্বেত বর্ণ হবে। কুঞ্চিত কেশ হবে। কাজল কাল চোখ হবে এবং সবার বয়স ৩৩ বছর হবে" (মুসনাদে আহমদ, আবু হুরায়রার বর্ণিত হাদীস)।

২০. অর্থাৎ তাদের ওপর সুখ-স্বাচ্ছন্দের উল্টা প্রভাব পড়েছিলো। আল্লাহ তা'আলার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়ার পরিবর্তে তারা তাঁর নিয়ামতের অস্বীকারকারী হয়ে গিয়েছিলো। নিজেদের প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তি সাধনে নিমগ্ন হয়ে তারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিলো এবং একের পর এক বড় বড় গোনাহর কাজে লিপ্ত হয়েছিলো। বড় গোনাহ শব্দটি ব্যাপক অর্থ ব্যঞ্জক। এর দ্বারা যেমন কুফর, শিরক ও নাস্তিকতা বড় গোনাহ বুঝানো হয়েছে তেমনি নৈতিকতা ও আমলের ক্ষেত্রে বড় গোনাহও বুঝানো হয়েছে।

২১. যাক্কূমের ব্যাখ্যার জন্য দেখুন তাফহীমুল কুরআন সূরা সাফ্ফাতের তাফসীর, টীকা-৩৪।

২২. এখান থেকে ৭৪ আয়াতে যে যুক্তিপ্রমাণ পেশ করা হয়েছে তাতে একই সাথে আখেরাত ও তাওহীদ উভয় বিষয়েই যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। মক্কার মানুষেরা যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষার এ দু'টি মৌলিক বিষয়ের প্রতিবাদ করছিলো তাই এখানে এমনভাবে যুক্তিপ্রমাণ পেশ করা হয়েছে যা দ্বারা আখেরাত প্রমাণিত হয় এবং তাওহীদের সত্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

২৩. অর্থাৎ আমিই যে তোমাদের রব ও উপাস্য এবং আমি পুনরায় তোমাদের সৃষ্টি করতে পারি এ কথা মেনে নেয়া।

২৪. ছোট্ট এ বাক্যে মানুষের সামনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রশ্ন রাখা হয়েছে। পৃথিবীর অন্য সব জিনিস বাদ দিয়ে মানুষ যদি শুধু এই একটি বিষয় সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করতো যে, সে নিজে কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে তাহলে কুরআনের একত্ববাদী শিক্ষায়ও তার কোন সন্দেহ-সংশয় থাকতো না, তার আখেরাত সম্পর্কিত শিক্ষায়ও কোন সন্দেহ-সংশয় থাকতো না। মানুষের জন্ম পদ্ধতি তো এছাড়া আর কিছুই নয় যে, পুরুষ তার শুক্র নারীর গর্ভাশয়ে পৌঁছে দেয় মাত্র। কিন্তু ঐ শুক্রের মধ্যে কি সন্তান সৃষ্টি করার এবং নিশ্চিত রূপে মানুষের সন্তান সৃষ্টি করার যোগ্যতা আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়েছে? অথবা মানুষ নিজে সৃষ্টি করেছে? কিংবা আল্লাহ তা'আলা ছাড়া অন্য কেউ সৃষ্টি করেছে? অথবা এই শুক্র দ্বারা গর্ভে মানুষ সৃষ্টি করে দেয়া কি কোন পুরুষ অথবা কোন নারী কিংবা দুনিয়ার কোন শক্তির ইখতিয়ারে? তারপর গর্ভের সূচনা থেকে সন্তান প্রসব পর্যন্ত মায়ের পেটে ক্রমান্বয়ে সৃষ্টি ও লালন করা এবং প্রতিটি শিশুকে স্বতন্ত্র আকৃতি দান করা, প্রতিটি শিশুর মধ্যে একটি বিশেষ অনুপাতে মানসিক ও দৈহিক শক্তি দান করা যার সাহায্যে সে একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে উঠে—এটা কি এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাজ? এতে কি আর কারো সামান্যতম দখলও আছে? পিতা-মাতা নিজে কি একাজ করে থাকে? না কোন ডাক্তার এ কাজ করে? নাকি নবী-রসূল ও আওলিয়াগণ এ কাজ করে থাকেন—যারা এই একই পন্থায় জন্মলাভ করেছেন? না কি সূর্য, চাঁদ, তারকারাজি এ কাজ করে থাকে—যারা নিজেরাই একটি নিয়ম-নীতির নিগড়ে বাঁধা? নাকি সেই প্রকৃতি (Nature) একাজ করে যা নিজে কোন

نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَكُمُ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٧﴾

আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যুকে বন্টন করেছি।[২৫] তোমাদের আকার আকৃতি পাল্টে দিতে এবং তোমাদের অজানা কোন আকার–আকৃতিতে সৃষ্টি করতে আমি অক্ষম নই।[২৬] নিজেদের প্রথমবার সৃষ্টি সম্পর্কে তোমরা জান। তবুও কেন শিক্ষা গ্রহণ করোনা।[২৭]

তোমরা কি কখনো ভেবে দেখেছো, যে বীজ তোমরা বপন করে থাকো তা থেকে ফসল উৎপন্ন তোমরা করো, না আমি?[২৮] আমি চাইলে এসব ফসলকে দানাবিহীন ভূষি বানিয়ে দিতে পারি। তখন তোমরা নানা রকমের কথা বলতে থাকবে। বলবে আমাদেরকে তো উল্টা জরিমানা দিতে হলো। আমাদের ভাগ্যটাই মন্দ।

জ্ঞান কলাকৌশল, ইচ্ছা ও ইখতিয়ার রাখে না? তাছাড়া সন্তান ছেলে হবে, না মেয়ে, সুশ্রী হবে না কদাকার, শক্তিশালী হবে না দুর্বল, অন্ধ, কালা, খোঁড়া ও প্রতিবন্ধী হবে, না সুস্থ অংগ–প্রত্যঙ্গ বিশিষ্ট এবং মেধাবী হবে, না মেধাহীন—সে সিদ্ধান্ত কি আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইখতিয়ারে? তাছাড়া জাতিসমূহের ইতিহাসে কখন কোন জাতির মধ্যে কোন কোন ভাল বা মন্দ গুণের অধিকারী লোক সৃষ্টি করতে হবে যারা সে জাতিকে উন্নতির শীর্ষ বিন্দুতে পৌছিয়ে দেবে কিংবা অধপতনের অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করবে, আল্লাহ ছাড়া আর কেউ কি সে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে? কেউ যদি এক গুঁয়েমি ও হঠকারিতায় লিপ্ত না হয় তাহলে সে উপলব্ধি করতে পারবে যে, শিরক ও নাস্তিকতার ভিত্তিতে এসব প্রশ্নের যুক্তি সংগত জওয়াব দেয়া সম্ভব নয়। এর যুক্তি সংগত জওয়াব একটিই। তা হচ্ছে, মানুষ পুরোপুরি আল্লাহর সৃষ্টি। আর প্রকৃত সত্য যখন এই তখন আল্লাহর সৃষ্টি এই মানুষের তার আল্লাহর মোকাবেলায় স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী হওয়ার দাবী করার কিংবা তাঁর ছাড়া অন্য কারো বন্দেগী করার কি অধিকার আছে?

তাওহীদের মত আখেরাতের ব্যাপারেও এ প্রশ্ন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদানকারী। এমন একটি ক্ষুদ্র কীট থেকে মানুষের জন্মের সূচনা হয় যা শক্তিশালী অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখাই যায়

না। এক সময় এই কীট নারী দেহের গভীর অন্ধকারে নারীর ডিম্বানুর সাথে মিলিত হয় ঐ ডিম্বানুও আবার অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দৃষ্টিগোচর হওয়ার মত নয়। এ দু'য়ের সংযুক্তি দ্বারা একটি অতি ক্ষুদ্র জীবন্ত কোষ (cell) সৃষ্টি হয়। এটিই মানব জীবনের সূচনা বিন্দু। এ কোষটিও এত ক্ষুদ্র হয় যে, অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া তা দেখা যায় না। মাতৃগর্ভে অতি ক্ষুদ্র এ কোষের প্রবৃদ্ধি ঘটিয়ে আল্লাহ তায়ালা ৯ মাসের কিছু বেশী সময়ের মধ্যে তাকে একটি পূর্ণ মানুষে রূপ দান করেন। তার গঠন ও নির্মাণ পূর্ণতা প্রাপ্ত হলে হৈ চৈ করে দুনিয়া মাতিয়া তোলার জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে মায়ের দেহই তাকে ঠেলে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দেয়। সমস্ত মানুষ এভাবেই পৃথিবীতে এসেছে এবং তাদের মত মানুষের জন্ম গ্রহণের এ দৃশ্যই রাত দিন দেখছে। তা সত্ত্বেও কোন বিবেকহীন ব্যক্তিই শুধু বলতে পারে, যে আল্লাহ বর্তমানে এভাবে মানুষকে সৃষ্টি করছেন তিনি তাঁর সৃষ্ট এসব মানুষকে পুনরায় অন্য কোন পদ্ধতিতে সৃষ্টি করতে পারবেন না।

২৫. অর্থাৎ তোমাদেরকে সৃষ্টি করা যেমন আমার ইখতিয়ারে। তেমনি তোমাদের মৃত্যুও আমার ইখতিয়ারে। কে মাতৃগর্ভে মারা যাবে, কে ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র মারা যাবে এবং কে কোন্ বয়সে উপনীত হয়ে মারা যাবে সে সিদ্ধান্ত আমিই নিয়ে থাকি। যার মৃত্যুর জন্য আমি যে সময় ঠিক করে দিয়েছি তার পূর্বে দুনিয়ার কোন শক্তিই তাকে মারতে পারে না এবং সে সময়ের পর কেউ তাকে এক মুহূর্ত জীবিত রাখতেও পারে না। যাদের মৃত্যুর সময় হাজির হয় তারা বড় বড় হাসপাতালে বড় বড় ডাক্তারের চোখের সামনে মৃত্যুবরণ করে। এমনকি ডাক্তার নিজেও তার মৃত্যুর সময় মরে যায়। কেউ কখনো মৃত্যুর সময় জানতে পারেনি, ঘনিয়ে আসা মৃত্যুকে প্রতিরোধ করতে পারেনি, কার মৃত্যু কিসের মাধ্যমে কখন কোথায় কিভাবে সংঘটিত হবে তাও কেউ জানে না।

২৬. অর্থাৎ বর্তমান আকার–আকৃতিতে তোমাদেরকে সৃষ্টি করতে আমি যেমন অক্ষম হই নাই। তেমনি তোমাদের সৃষ্টি পদ্ধতি পরিবর্তন করে অন্য আকার–আকৃতিতে ভিন্ন প্রকৃতির গুণাবলী ও বৈশিষ্ট দিয়ে তোমাদের সৃষ্টি করতেও আমি অক্ষম নই। বর্তমানে আমি তোমাদের সৃষ্টি করি এভাবে যে, তোমাদের শুক্র নারীর গর্ভাশয়ে স্থিতি লাভ করে এবং সেখানে ক্রমান্বয়ে প্রবৃদ্ধি লাভ করে একটি শিশুর আকারে তা বেরিয়ে আসে। সৃষ্টির এই পদ্ধতিও আমার নির্ধারিত। সৃষ্টির ধরাবাঁধা এই একটা নিয়মই শুধু আমার কাছে নেই যে, এটি ছাড়া অন্য কোন নিয়ম–পদ্ধতি আমি জানি না বা কার্যকরী করতে পারি না। যে বয়সে তোমাদের মৃত্যু হয়েছিল কিয়ামতের দিন ঠিক সেই বয়সের মানুষের আকৃতি দিয়েই আমি তোমাদের সৃষ্টি করতে পারি। বর্তমানে আমি তোমাদের দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণ শক্তি ও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের এক রকমের পরিমাপ রেখেছি। কিন্তু আমার কাছে মানুষের জন্য এই একটি মাত্র পরিমাপই নেই যে, আমি তা পরিবর্তন করতে পারি না। আমি কিয়ামতের দিন তা পরিবর্তন করে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের কিছু করে দেব। ফলে তোমরা এখানে যা দেখতে ও শুনতে পাও না তা দেখতে ও শুনতে পাবে। এখন তোমাদের শরীরের চামড়া, তোমাদের হাত পা এবং তোমাদের চোখের কোন বাক শক্তি নেই। কিন্তু মুখকে বলার শক্তি তো আমিই দিয়েছি। কিয়ামতের দিন তোমাদের প্রতিটি অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ এবং তোমাদের গাত্র চর্মের প্রতিটি অংশ আমার আদেশে কথা বলবে। এ ব্যবস্থা করতে আমি অক্ষম নই। বর্তমানে তোমরা একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাক এবং তারপর মৃত্যুবরণ কর।

তোমাদের এ জীবন মৃত্যুও আমার নির্ধারিত একটি বিধানের অধীনে হয়ে থাকে। তোমাদের জীবনের জন্য ভবিষ্যতে আমি অন্য আরেকটি বিধান বানাতে সক্ষম যার অধীনে তোমাদের কখনো মৃত্যু হবে না। বর্তমানে তোমরা একটা বিশেষ মাত্রা পর্যন্ত আযাব সহ্য করতে পার। তার চেয়ে অধিক আযাব দেয়া হলে তোমরা জীবিত থাকতে পার না। এ নিয়ম বিধানও আমারই তৈরী। ভবিষ্যতে আমি তোমাদের জন্য আর একটি আইন–বিধান তৈরী করতে পারি যার অধীনে তোমরা এত দীর্ঘকাল পর্যন্ত এরকম আযাব ভোগ করতে সক্ষম হবে যে, তার কল্পনাও তোমরা করতে পার না। কঠোর থেকে কঠোরতর আযাব ভোগ করেও তোমাদের মৃত্যু হবে না। আজ তোমরা ভাবতেও পার না যে, কোন বৃদ্ধ যুবক হয়ে যেতে পারে, কেউ রোগব্যাধি থেকে নিরাপদ থাকতে পারে কিংবা কেউ মোটেই বার্ধক্যে উপনীত হবে না এবং চিরদিন একই বয়সের যুবক থাকবে। কিন্তু এখানে যৌবনের পরে বার্ধক্য আসে আমার দেয়া নিয়ম বিধান অনুসারেই। ভবিষ্যতে তোমাদের জীবনের জন্য আমি এমন ভিন্ন নিয়ম–বিধান বানাতে সক্ষম, যার আওতায় জান্নাতে প্রবেশ মাত্র প্রত্যেক বৃদ্ধ যুবকে পরিণত হবে এবং তার যৌবন ও সুস্থতা অটুট ও অবিনশ্বর হবে।

২৭. অর্থাৎ কিভাবে তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিল তা তোমরা অবশ্যই জান। যে শুক্র দ্বারা তোমাদের অস্তিত্বের সূচনা হয়েছে তা পিতার মেরুদণ্ড থেকে কিভাবে স্থানান্তরিত হয়েছিল, মায়ের গর্ভাশয় যা কবরের অন্ধকার থেকে কোন অংশে কম অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল না তার মধ্যে কিভাবে পর্যায়ক্রমে তোমাদের বিকাশ ঘটিয়ে জীবিত মানুষে রূপান্তরিত করা হয়েছে, কিভাবে একটি অতি ক্ষুদ্র পরমাণু সদৃশ কোষের প্রবৃদ্ধি ও বিকাশ সাধন করে এই মন–মগজ, এই চোখ কান ও এই হাত পা সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বুদ্ধি ও অনুভূতি, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা, শিল্প জ্ঞান ও উদ্ভাবনী শক্তি, ব্যবস্থাপনা ও অধীনস্ত করে নেয়ার মত বিস্ময়কর যোগ্যতাসমূহ দান করা হয়েছে। এটা কি মৃতদের জীবিত করে উঠানোর চেয়ে কম অলৌকিক ও কম বিস্ময়কর? এসব বিস্ময়কর ব্যাপার তোমরা যখন নিজের চোখেই দেখছো এবং নিজেরাই তার জ্বলন্ত সাক্ষী হিসেবে বর্তমান আছ, তখন তা থেকে এ শিক্ষা কেন গ্রহণ করছো না যে, আল্লাহর যে অসীম শক্তিতে দিন রাত এসব মু'জিযা সংঘটিত হচ্ছে তাঁর ক্ষমতায়ই মৃত্যুর পরের জীবন, হাশর নাশর এবং জান্নাত ও জাহান্নামের মত মু'জিযাও সংঘটিত হতে পারে?

২৮. উপরে উল্লেখিত প্রশ্ন এ সত্যের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল যে, তোমরা তো আল্লাহ তা'আলার গড়া। তিনি সৃষ্টি করেছেন বলে তোমরা অস্তিত্ব লাভ করেছো। এখন এই দ্বিতীয় প্রশ্নটি দ্বিতীয় যে গুরুত্বপূর্ণ সত্যের প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে তাহচ্ছে যে রিযিকে তোমরা প্রতিপালিত হচ্ছো তাও আল্লাহই সৃষ্টি করে থাকেন। তোমাদের সৃষ্টির ক্ষেত্রে মানুষের কর্তৃত্ব ও প্রচেষ্টা এর অধিক আর কিছুই নয় যে, তোমাদের পিতা তোমাদের মায়ের দেহাভ্যন্তরে এক ফোঁটা শুক্র নিক্ষেপ করে। অনুরূপ তোমাদের রিযিক উৎপাদনের ক্ষেত্রেও মানুষের প্রচেষ্টা জমিতে বীজ বপনের বেশী আর কিছুই নয়। যে জমিতে এই চাষাবাদ করা হয় তাও তোমাদের তৈরী নয়। এই জমিতে উর্বরা শক্তি তোমরা দান কর নাই। ভূমির যে উপাদান দ্বারা তোমাদের খাদ্য সামগ্রীর ব্যবস্থা হয় তা তোমরা সরবরাহ কর নাই। তোমরা জমিতে যে বীজ বপন কর তাকে

أَفَرَءَيْتُمُ الْمَآءَ الَّذِىْ تَشْرَبُوْنَ ﴿٦٨﴾ ءَاَنْتُمْ اَنْزَلْتُمُوْهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُوْنَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَآءُ جَعَلْنٰهُ اُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُوْنَ ﴿٧٠﴾ اَفَرَءَيْتُمُ النَّارَ الَّتِىْ تُوْرُوْنَ ﴿٧١﴾ ءَاَنْتُمْ اَنْشَاْتُمْ شَجَرَتَهَآ اَمْ نَحْنُ الْمُنْشِـُٔوْنَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنٰهَا تَذْكِرَةً وَّمَتَاعًا لِّلْمُقْوِيْنَ ﴿٧٣﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿٧٤﴾

তোমরা কি চোখ মেলে কখনো দেখেছো, যে পানি তোমরা পান করো, মেঘ থেকে তা তোমরা বর্ষণ করো, না তার বর্ষণকারী আমি?[২৯] আমি চাইলে তা লবণাক্ত বানিয়ে দিতে পারি।[৩০] তা সত্ত্বেও তোমরা শোকরগোজার হও না কেন?[৩১]

তোমরা কি কখনো লক্ষ করেছো,—এই যে আগুন তোমরা জ্বালাও তার গাছ[৩২] তোমরা সৃষ্টি করো, না তার সৃষ্টিকর্তা আমি? আমি সেটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার উপকরণ[৩৩] এবং মুখাপেক্ষীদের[৩৪] জন্য জীবনোপকরণ বানিয়েছি।

অতএব হে নবী, তোমার মহান রবের পবিত্রতা বর্ণনা করো।[৩৫]

প্রবৃদ্ধির উপযুক্ত তোমরা বানাও নাই। ঐ গুলো যে গাছের বীজ তার প্রতিটি থেকে ঐ একই প্রজাতির গাছ ফুটে বের হওয়ার যোগ্যতা ও বৈশিষ্ট তোমরা সৃষ্টি কর নাই। সেই ভূমিকে বাতাসে ঢেউ খেলা শ্যামল শস্য ক্ষেত্রে পরিণত করার জন্য ভূমির অভ্যন্তরে যে ক্রিয়া প্রক্রিয়া এবং ভূমির উপরিভাগে যে বাতাস, পানি, উষ্ণতা, আর্দ্রতা ও মৌসূমী পরিবেশ প্রয়োজন তার কোনটিই তোমাদের কোন তদবীর বা ব্যবস্থাপনার ফল নয়। এর সব কিছুই আল্লাহর অসীম ক্ষমতা ও প্রতিপালক হওয়ার বিস্ময়কর কীর্তি। অতএব তোমরা যখন তার সৃষ্টি করার করণে অস্তিত্ব লাভ করেছো এবং তাঁরই দেয়া রিযিকে প্রতিপালিত হচ্ছো তখন তাঁর নির্দেশের বাইরে স্বাধীনভাবে জীবন যাপন করার কিংবা তাঁকে ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব ও আনুগত্য করার অধিকার তোমরা কি করে লাভ করো?

এ আয়াতের যুক্তি প্রমাণ বাহ্যিকভাবে তাওহীদের স্বপক্ষে। তবে এতে যে বিষয় উপস্থাপন করা হয়েছে সে বিষয়ে কেউ আরেকটু গভীরভাবে চিন্তা ভাবনা করলেই এর মধ্যে আখেরাতের প্রমাণও পেয়ে যাবে। জমিতে যে বীজ বপন করা হয় তা মৃত বস্তু ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু কৃষক তাকে মাটির কবরে দাফন করার পর আল্লাহ তা'আলা তার মধ্যে জীবন সৃষ্টি করেন। তা থেকে অঙ্কুরোদগম হয় এবং সবুজ–শ্যামল শষ্য ক্ষেত্রের

মনোমুগ্ধকর দৃশ্য পরিদৃষ্ট হয়। আমাদের চোখের সামনে প্রতিদিন হাজার হাজার মৃত এভাবে কবর থেকে জীবিত হয়ে উঠছে। এটা কি কোন অংশে কম বিস্ময়কর মু'জিযা যে, মানুষের মৃত্যুর পর জীবিত হওয়া সম্পর্কে কুরআন আমাদেরকে যে খবর দিচ্ছে সে মু'জিযাকে অসম্ভব মনে করবো?

২৯. অর্থাৎ শুধু তোমাদের ক্ষুধা নিবারণের ব্যবস্থাই নয় তোমাদের পিপাসা মেটানোর ব্যবস্থাও আমিই করেছি। তোমাদের জীবন ধারণের জন্য যে পানি খাদ্যের চেয়েও অধিক প্রয়োজনীয় তার ব্যবস্থা তোমরা নিজেরা কর নাই। আমিই তা সরবরাহ করে থাকি। পৃথিবীর সমুদ্রসমূহ আমি সৃষ্টি করেছি। আমারই সৃষ্টি করা সূর্যের তাপে সমুদ্রের পানি বাষ্পে পরিণত হয়। আমি পানির মধ্যে এমন বৈশিষ্ট দিয়েছি যে, একটি বিশেষ মাত্রার তাপে তা বাষ্পে পরিণত হয়। আমার সৃষ্ট বাতাস তা বহন করে নিয়ে যায়। আমার অসীম ক্ষমতা ও কৌশলে বাষ্পরাশি একত্রিত হয়ে মেঘে পরিণত হয়। আমার নির্দেশে এই মেঘরাশি একটি বিশেষ অনুপাত অনুসারে বিভক্ত হয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে যাতে পৃথিবীর যে অঞ্চলের জন্য যে পরিমাণ পানি বরাদ্দ করা হয়েছে তা সেখানে পৌঁছে যায়। তারপর আমি উর্ধাকাশে এমন এক মাত্রার ঠাণ্ডা সৃষ্টি করে রেখেছি যার ফলে বাষ্প পুনরায় পানিতে পরিণত হয়। আমি তোমাদেরকে শুধু অস্তিত্ব দান করেই বসে নাই। তোমাদের প্রতিপালনের এত সব ব্যবস্থাও আমি করছি যা না থাকলে তোমরা বেঁচেই থাকতে পারতে না। আমি সৃষ্টি করার ফলে অস্তিত্বলাভ করে, আমার দেয়া রিযিক খেয়ে এবং আমার দেয়া পানি পান করে আমার মোকাবিলায় স্বাধীন ও স্বেচ্ছাচারী হবে কিংবা আমার ছাড়া অন্য কারো দাসত্ব করবে এ অধিকার তোমরা কোথা থেকে লাভ করেছো?

৩০. এ আয়াতাংশে আল্লাহ তা'আলার অসীম ক্ষমতা ও কর্মকৌশলের এক অতি বিস্ময়কর দিকের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা পানির মধ্যে যে সব অতি বিস্ময়কর বৈশিষ্ট রেখেছেন তার একটি হচ্ছে, পানির মধ্যে যত বস্তুই মিশে থাকুক না কেন, তাপের প্রভাবে যখন তা বাষ্পে পরিণত তখন সমস্ত মিশে যাওয়া বস্তু নীচে পড়ে থাকে এবং শুধু জলীয় অংশই বাতাসে উড়ে যায়। পানির যদি এই বিশেষত্ব না থাকতো তাহলে পানি অবস্থায় তার মধ্যে মিশে থাকা বস্তুসমূহ বাষ্পে পরিণত হওয়ার সময়ও তার মধ্যে থেকে যেতো। সুতরাং এমতাবস্থায় সমুদ্র থেকে যে বাষ্প উথিত হতো তার মধ্যে সমুদ্রের লবণও মিশে থাকতো এবং ঐ পানি বৃষ্টির আকারে বর্ষিত হয়ে গোটা ভূপৃষ্ঠকে লবণাক্ত ভূমিতে পরিণত করতো। সে পানি পান করে মানুষ যেমন বেঁচে থাকতে পারতো না, তেমনি তা দ্বারা কোন প্রকারের উদ্ভিদও উৎপন্ন হতে পারতো না। এখন যে ব্যক্তির মস্তিষ্কে কিছুমাত্র মগজ আছে সে কি এ দাবী করতে পারে যে, অন্ধ ও বধির প্রকৃতিতে আপনা থেকেই পানির মধ্যে এ জ্ঞানগর্ভ বৈশিষ্ট সৃষ্টি হয়ে গিয়েছে? পানির যে বৈশিষ্টের কারণে লবণাক্ত সমুদ্র থেকে পরিষ্কার সুপেয় পানি উথিত হয়ে বৃষ্টির আকারে বর্ষিত হয় এবং নদী, খাল, ঝর্ণা ও কূপের আকারে পানি সরবরাহ ও সেচের কাজ আঞ্জাম দেয় তা স্পষ্টভাবে প্রমাণ করে যে, যিনি পানির মধ্যে এই বৈশিষ্ট সৃষ্টি করেছেন তিনি বুঝে শুনেই তা করেছেন যেন পানি তাঁর সৃষ্টিকূলের প্রতিপালনের সহায়ক হয়। যেসব জীবজন্তুর পক্ষে লবণাক্ত পানিতে বেঁচে থাকা ও জীবন যাপন করা সম্ভব তাদেরকে সমুদ্রে সৃষ্টি করেছেন। সেখানে তারা স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপন করছে। কিন্তু স্থলভাগ ও বায়ু মন্ডলের বসবাসের জন্য

যেসব জীবজন্তু সৃষ্টি করেছেন তাদের জীবন ধারণ ও জীবন যাপনের জন্য সুপেয় মিঠা পানির প্রয়োজন ছিল। সে উদ্দেশে বৃষ্টির ব্যবস্থা করার পূর্বে তিনি পানির মধ্যে এই বৈশিষ্ট দিলেন যে, তাপে বাষ্পে পরিণত হওয়ার সময় তা যেন পানিতে মিশ্রিত কোন জিনিস সাথে নিয়ে উত্থিত না হয়।

৩১. অন্য কথায় তোমাদের মধ্যে কেউ এ বৃষ্টিকে দেবতাদের কীর্তি বলে মনে করে। আবার কেউ মনে করে, সমুদ্রের পানি থেকে মেঘমালার সৃষ্টি এবং পুনরায় তা পানি হয়ে আসমান থেকে বর্ষিত হওয়াটা একটি প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই চলছে। আবার কেউ এটাকে আল্লাহর রহমত মনে করলেও আল্লাহর সামনেই আনুগত্যের মাথা নোয়াতে হবে এতটা অধিকার আল্লাহর আছে বলে মনে করে না। তোমরা আল্লাহর নিয়ামতের এত বড় না-শুকরী কেন করছো? আল্লাহর এত বড় নিয়ামত কাজে লাগিয়ে উপকৃত হচ্ছো এবং তার বিনিময়ে কুফর, শির্‌ক, পাপাচার ও অবাধ্যতায় লিপ্ত হচ্ছো।

৩২. গাছ বলতে যেসব গাছ থেকে জ্বালানী কাঠ সংগৃহীত হয় সে গাছের কথা বলা হয়েছে কিংবা মারখ ও আফার নামে পরিচিত গাছের কথা বলা হয়েছে যার তাজা কাঁচা ডাল পরস্পর রগড়িয়ে প্রাচীনকালে আরবের অধিবাসীরা আগুন জ্বালাতো।

৩৩. আগুনকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার উপকরণ বানানোর অর্থ হচ্ছে, আগুন এমন জিনিস যা প্রয়োজনের মুহূর্তে প্রজ্বলিত হয়ে মানুষকে তার ভুলে যাওয়া শিক্ষা স্মরণ করিয়ে দেয়। আগুন যদি না থাকতো তাহলে মানুষের জীবন পশুর জীবন থেকে ভিন্ন হতো না। মানুষ পশুর মতো কাঁচা খাদ্য খাওয়ার পরিবর্তে আগুনের সাহায্যে তা রান্না করে খাওয়া শুরু করেছে এবং আগুনের কারণেই মানুষের জন্য একের পর এক শিল্প ও আবিষ্কারের নতুন নতুন দরজা উদঘাটিত হয়েছে। এ কথা সুস্পষ্ট, যেসব উপকরণের সাহায্যে আগুন জ্বালানো যায় আল্লাহ যদি তা সৃষ্টি না করতেন এবং আগুনে যে সব বস্তু জ্বলে তাও যদি তিনি সৃষ্টি না করতেন তাহলে মানুষের উদ্ভাবনী যোগ্যতার তালা কোন দিনই খুলতো না। কিন্তু মানুষের স্রষ্টা যে একজন বিজ্ঞ পালনকর্তা যিনি একদিকে তাকে মানবিক যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করেছেন এবং অন্যদিকে পৃথিবীতে সেসব উপকরণ ও সাজ-সরঞ্জামও সৃষ্টি করেছেন যার সাহায্যে তার এসব যোগ্যতা বাস্তব রূপ লাভ করতে পারে সে কথা মানুষ একদম ভুলে বসে আছে। মানুষ যদি গাফিলতি ও অমনযোগিতায় নিমগ্ন না হয় তাহলে সে দুনিয়াতে যা যা ভোগ করছে তা কার অনুগ্রহ ও নিয়ামত সে কথা স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য এক আগুনই যথেষ্ট।

৩৪. মূল আয়াতে مقوين শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। ভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিতগণ এর বিভিন্ন অর্থ বর্ণনা করেছেন। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন মরুভূমিতে উপনীত মুসাফির বা পথচারী। কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন ক্ষুধার্ত মানুষ। কারো কারো মতে এর অর্থ হচ্ছে সেসব মানুষ যারা খাবার পাকানো, আলো পাওয়া কিংবা তাপ গ্রহণ করার কাজে আগুন ব্যবহার করে।

৩৫. অর্থাৎ সে পবিত্র নাম নিয়ে ঘোষণা করে দাও যে, কাফের ও মুশরিকরা যেসব দোষত্রুটি, অপূর্ণতা ও দুর্বলতা তাঁর ওপর আরোপ করে তা থেকে এবং কুফর ও শির্‌কমূলক সমস্ত আকীদা ও আখেরাত অস্বীকারকারীদের প্রতিটি যুক্তি তর্কে যা প্রচ্ছন্ন আছে তা থেকে তিনি সম্পূর্ণরূপে পবিত্র।

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوٰقِعِ النُّجُوْمِ ﴿٧٥﴾ وَاِنَّهٗ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُوْنَ عَظِيْمٌ ﴿٧٦﴾ اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ﴿٧٧﴾ فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ﴿٧٨﴾ لَّا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ﴿٧٩﴾ تَنْزِيْلٌ مِّنْ رَّبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٨٠﴾ اَفَبِهٰذَا الْحَدِيْثِ اَنْتُمْ مُّدْهِنُوْنَ ﴿٨١﴾ وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ اَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ ﴿٨٢﴾

৩ রুকূ'

অতএব না,[৩৬] আমি শপথ করছি তারকাসমূহের ভ্রমণ পথের। এটা এক অতি বড় শপথ যদি তোমরা বুঝতে পার। এ তো মহা সম্মানিত কুরআন।[৩৭] একখানা সুরক্ষিত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ।[৩৮] পবিত্র সত্তাগণ ছাড়া আর কেউ তা স্পর্শ করতে পারে না।[৩৯] এটা বিশ্ব–জাহানের রবের নাযিলকৃত। এরপরও কি তোমরা এ বাণীর প্রতি উপেক্ষার ভাব প্রদর্শন করছো?[৪০] এ নিয়ামতে তোমরা নিজেদের অংশ রেখেছো এই যে, তোমরা তা অস্বীকার করছো?[৪১]

৩৬ . অর্থাৎ তোমরা যা মনে করে বসে আছো ব্যাপার তা নয়। কুরআন যে আল্লাহর পক্ষ থেকে সে বিষয়ে কসম খাওয়ার আগে এখানে لا শব্দের ব্যবহার করায় আপনা থেকেই একথা প্রকাশ পায় যে, এই পবিত্র গ্রন্থ সম্পর্কে মানুষ মনগড়া কিছু কথাবার্তা বলছিলো। সেসব কথার প্রতিবাদ করার জন্যই এ কসম খাওয়া হচ্ছে।

৩৭. তারকারাজি ও গ্রহসমূহের 'অবস্থান স্থল' অর্থ তাদের স্থান, তাদের মনযিল ও তাদের কক্ষপথসমূহ। আর কুরআনের মহা সম্মানিত গ্রন্থ হওয়া সম্পর্কে ঐগুলোর শপথ করার অর্থ হচ্ছে উর্ধ জগতে সৌরজগতের ব্যবস্থাপনা যত সুসংবদ্ধ ও মজবুত এই বাণীও ততটাই সুসংবদ্ধ ও মজবুত। যে আল্লাহ ঐ ব্যবস্থা তৈরী করেছেন সে আল্লাহ এই বাণীও নাযিল করেছেন। মহাবিশ্বের অসংখ্য ছায়াপথ (Galaxies) ঐ সব ছায়াপথের মধ্যে সীমা সংখ্যাহীন নক্ষত্র (Stars) এবং গ্রহরাজি (Planets) বাহ্যত ছড়ানো ছিটানো দেখা গেলেও তাদের মধ্যে পূর্ণ মাত্রার যে সুসংবদ্ধতা বিরাজমান এ মহাগ্রন্থও ঠিক অনুরূপ পূর্ণ মাত্রার সুসংবদ্ধ ও সুবিন্যস্ত জীবন বিধান পেশ করে। যার মধ্যে আকিদা–বিশ্বাসের ভিত্তিতে নৈতিক চরিত্র, ইবাদাত, তাহযীব তামাদ্দুন, অর্থ ও সমাজ ব্যবস্থা, আইন ও আদালত, যুদ্ধ ও সন্ধি মোট কথা মানব জীবনের সকল বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত পথ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে এবং এর কোন একটি দিকই আরেকটি দিকের সাথে সামঞ্জস্যহীন ও বেখাপ্পা নয়। অথচ এই ব্যবস্থা বিভিন্ন আয়াত ও ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে প্রদত্ত ভাষণে বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া উর্ধজগতের জন্য আল্লাহর নির্ধারিত নিয়ম–শৃঙ্খলা যেমন অপরিবর্তনীয়, তাতে কোন সময় সামান্য পরিমাণ পার্থক্যও সূচিত হয় না, ঠিক তেমনি এই গ্রন্থে যেসব সত্য ও পথ নির্দেশনা পেশ করা হচ্ছে তাও অটল ও অপরিবর্তনীয় তার একটি বিন্দুকেও স্ব–স্থান থেকে বিচ্যুত করা যেতে পারে না।

৩৮. এর অর্থ 'লাওহে মাহফুজ'। এটি বুঝাতে كِتَابٍ مَّكْنُونٍ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ এমন লিখিত বস্তু যা গোপন করে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ যা কারো ধরা ছোঁয়ার বাইরে। সুরক্ষিত ঐ লিপিতে কুরআন মজীদ লিখিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপরে কুরআন নাযিল হওয়ার পূর্বে আল্লাহ তা'আলার কাছে তা সেই ভাগ্যলিপিতে লিপিবদ্ধ হয়ে গিয়েছে যাতে কোন রকম পরিবর্তন পরিবর্ধন সম্ভব নয়। কারণ, তা যে কোন সৃষ্টির ধরা ছোঁয়ার উর্ধে।

৩৯. কাফেররা কুরআনের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ আরোপ করতো এটা তার জবাব। তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামকে গণক আখ্যায়িত করে বলতো, জিন ও শয়তানরা তাঁকে এসব কথা শিখিয়ে দেয়। কুরআন মজীদের কয়েকটি স্থানে এর জবাব দেয়া হয়েছে। যেমন ঃ সূরা শূ'আরাতে বলা হয়েছে ঃ

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ وَمَا يَنْبَغِىْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ –

"শয়তান এ বাণী নিয়ে আসেনি। এটা তার জন্য সাজেও না। আর সে এটা করতেও পারে না। এ বাণী শোনার সুযোগ থেকেও তাকে দূরে রাখা হয়েছে।"

(আয়াত ২১০ থেকে ২১২)

এ বিষয়টিই এখানে এ ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, "পবিত্র সত্তা ছাড়া কেউ তা স্পর্শ করতে পারে না।" অর্থাৎ শয়তান কর্তৃক এ বাণী নিয়ে আসা কিংবা নাযিল হওয়ার সময় এতে কর্তৃত্ব খাটানো বা হস্তক্ষেপ করা তো দূরের কথা যে সময় 'লাওহে মাহফুজ' থেকে তা নবীর (সা) ওপর নাযিল করা হয় সে সময় পবিত্র সত্তাসমূহ অর্থাৎ পবিত্র ফেরেশতারা ছাড়া কেউ তার ধারে কাছেও ঘেঁষতে পারে না। ফেরেশতাদের জন্য পবিত্র কথাটি ব্যবহার করার তাৎপর্য হলো মহান আল্লাহ তাদেরকে সব রকমের অপবিত্র আবেগ অনুভূতি এবং ইচ্ছা আকাংখা থেকে পবিত্র রেখেছেন।

আনাস (রা) ইবনে মালেক, ইবনে আব্বাস (রা), সাঈদ ইবনে জুবাইর, ইকরিমা, মুজাহিদ, কাতাদা, আবুল আলীয়া, সুদ্দী, দাহ্হাক এবং ইবনে যায়েদ এ আয়াতের এ ব্যাখ্যাই বর্ণনা করেছেন। বাক্য বিন্যাসের সাথেও এটি সামঞ্জস্যপূর্ণ। কারণ, বাক্যের ধারাবাহিকতা থেকে এ কথাই বুঝা যায় যে, তাওহীদ ও আখেরাত সম্পর্কে মক্কার কাফেরদের ভ্রান্ত ধ্যান–ধারণার প্রতিবাদ করার পর কুরআন মজীদ সম্পর্কে তাদের ভ্রান্ত ধারণা প্রত্যাখ্যান করে তারকা ও গ্রহরাজির "অবস্থান ক্ষেত্র"সমূহের শপথ করে বলা হচ্ছে, এটি একটি অতি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন গ্রন্থ, আল্লাহর সুরক্ষিত লিপিতে তা লিপিবদ্ধ আছে কোন সৃষ্টির পক্ষে তাতে হস্তক্ষেপ করার কোন সম্ভাবনা নেই এবং তা এমন পদ্ধতিতে নবীর ওপর নাযিল হয় যে, পবিত্র ফেরেশতাগণ ছাড়া কেউ তা স্পর্শও করতে পারে না।

মুফাস্সিরদের মধ্যে কেউ কেউ এ আয়াতের لا শব্দটিকে 'না' অর্থে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা আয়াতের অর্থ করেছেন "পাক পবিত্র নয় এমন কোন ব্যক্তি যেন তা স্পর্শ না করে।" "কিংবা এমন কোন ব্যক্তির তা স্পর্শ করা উচিত—নয়, যে না পাক।" আরো

কতিপয় মুফাসসির যদিও لا শব্দটিকে 'না' অর্থেই গ্রহণ করেছেন এবং আয়াতের অর্থ করেছেন এই গ্রন্থ পবিত্র সত্তাগণ ছাড়া আর কেউ স্পর্শ করে না। কিন্তু তাদের বক্তব্য হচ্ছে, এখানে 'না' শব্দটি ঠিক তেমনি নির্দেশ সূচক যেমন রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী اَلْمُسْلِمُ اَخُوا الْمُسْلِمِ لاَيَظْلِمُه (মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার ওপর জুলুম করে না) এর মধ্যে উল্লেখিত 'না' শব্দটি নির্দেশসূচক। এখানে যদিও বর্ণনামূলকভাবে বলা হয়েছে যে, মুসলমান মুসলমানের ওপর জুলুম করে না। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে মুসলমান যেন মুসলমানের ওপর জুলুম না করে। অনুরূপ এ আয়াতে যদিও বলা হয়েছে যে, পবিত্র লোক ছাড়া কুরআনকে কেউ স্পর্শ করে না। কিন্তু তা থেকে যে নির্দেশ পাওয়া যায় তা হচ্ছে, পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তি যেন তা স্পর্শ না করে।

তবে প্রকৃতপক্ষে এ ব্যাখা আয়াতের পূর্বাপর প্রসংগের সাথে খাপ খায় না। পূর্বাপর বিষয়বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে এ বাক্যের এরূপ অর্থ করা যেতে পারে। কিন্তু যে বর্ণনাধারার মধ্যে কথাটি বলা হয়েছে সে প্রেক্ষিতে রেখে একে বিচার করলে এ কথা বলার আর কোন সুযোগই থাকে না যে, "পবিত্র লোকেরা ছাড়া কেউ যেন এ গ্রন্থ স্পর্শ না করে।" কারণ, এখানে সম্বোধন করা হয়েছে কাফেরদেরকে। তাদের বলা হচ্ছে, এটি আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কিতাব। এ কিতাব সম্পর্কে তোমাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত যে, শয়তানরা নবীকে তা শিখিয়ে দেয়। কোন ব্যক্তি পবিত্রতা ছাড়া এ গ্রন্থ স্পর্শ করতে পারবে না শরীয়াতের এই নির্দেশটি এখানে বর্ণনা করার কি যুক্তি ও অবকাশ থাকতে পারে? বড় জোর যা বলা যেতে পারে তা হচ্ছে, এ নির্দেশ দেয়ার জন্য যদিও আয়াতটি নাযিল হয়নি। কিন্তু বাক্যের ভঙ্গি থেকে ইংগিত পাওয়া যায় যে, আল্লাহর দরবারে যেমন কেবল পবিত্র সত্তারাই এ গ্রন্থ স্পর্শ করতে পারে অনুরূপ দুনিয়াতেও অন্তত সেসব ব্যক্তি নাপাক অবস্থায় এ গ্রন্থ স্পর্শ করা থেকে বিরত থাকুক। যারা এ গ্রন্থের আল্লাহর বাণী হওয়া সম্পর্কে বিশ্বাস পোষণ করে।

এ মাসয়ালা সম্পর্কে যেসব হাদীস বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ ইমাম মালেক (র) মুয়াত্তা গ্রন্থে আবদুল্লাহ ইবনে আবী বকর মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযম বর্ণিত এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইয়ামানের নেতৃবৃন্দের কাছে আমর ইবনে হাযমের মাধ্যমে যে লিখিত নির্দেশনামা পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে এ নির্দেশটিও ছিল যে, لاَ يَمَسُّ الْقُرْاٰنَ الاطاهر (পাক-পবিত্র লোক ছাড়া কেউ যেন কুরআন স্পর্শ না করে)। আবু দাউদ তাঁর 'মারাসীল' গ্রন্থে ইমাম যুহরী থেকে একথাটি উদ্ধৃত করেছেন। অর্থাৎ তিনি আবু মুহাম্মাদ ইবনে আমর ইবনে হাযমের কাছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের লিখিত যে নির্দেশনামা দেখেছিলেন তার মধ্যে এ নির্দেশটিও ছিল।

দুই ঃ হযরত আলী থেকে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাতে তিনি বলেছেন ঃ

ان رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم لم يكن يحجزه عن القران شيئ ليس الجنابة –

"অপবিত্র অবস্থা ছাড়া অন্য কিছুই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কুরআন তিলাওয়াত থেকে বিরত রাখতে পারতো না" (আবু দাউদ, নাসায়ী, তিরমিযি)।

তিন ঃ ইবনে উমর (রা) বর্ণনা করেছেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

لا تقرأ الحائض والجنب شيئا من القران

"ঋতুবতী নারী ও নাপাক কোন ব্যক্তি যেন কুরআনের কোন অংশ না পড়ে"।

(অবু দাউদ, তিরমিযী)

চার ঃ বুখারীর একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে যে পত্র দিয়েছিলেন তাতে পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটিও লিখিত ছিল ঃ

يَا أَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ ....

সাহাবা কিরাম (রা) ও তাবেয়ীনদের থেকে এ মাসয়ালাটি সম্পর্কে যেসব মতামত বর্ণিত হয়েছে তা নিম্নরূপ ঃ

হযরত সালমান ফারসী (রা) অযু ছাড়া কুরআন শরীফ পড়া দুষণীয় মনে করতেন না। তবে তাঁর মতে এরূপ ক্ষেত্রে হাত দিয়ে কুরআন স্পর্শ করা জায়েয নয়। হযরত সা'দ (রা) ইবনে আবী ওয়াক্কাস এবং হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে উমর (রা) ও এমত অনুসরণ করতেন। হযরত হাসান বাসরী ও ইবরাহীম নাখয়ীও বিনা অযুতে কুরআন শরীফ স্পর্শ করা মাকরূহ মনে করতেন। (আহকামুল কুরআন– জাস্‌সাস)। আতা, তাউস, শা'বী এবং কাসেম ইবনে মুহাম্মাদও এই মত পোষণ করতেন বলে বর্ণিত হয়েছে (আল–মুগনী–ইবনে কুদামাহ)। তবে তাঁদের সবার মতে অযু ছাড়া কুরআন শরীফ স্পর্শ না করে পড়া কিংবা মুখস্ত পড়া জায়েয।

নাপাক, হায়েজ ও নিফাস অবস্থায় কুরআন শরীফ পড়া হযরত, 'উমর (রা), হযরত আলী (রা), হযরত হাসান বাসরী, হযরত ইবরাহীম নাখয়ী এবং ইমাম যুহরীর মতে মাকরূহ। তবে ইবনে আব্বাসের (রা) মত ছিল এই যে, কোন ব্যক্তি কুরআনের যে অংশ স্বভাবতই মুখে মুখে পড়তে অভ্যস্ত তা মুখস্ত পড়তে পারে। তিনি এ মতের ওপর আমলও করতেন। এ মাসয়ালা সম্পর্কে হযরত সা'ঈদ ইবনুল মুসাইয়েব এবং সা'ঈদ ইবনে জুবাইরকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বললেন ঃ তার স্মৃতিতে কি কুরআন সংরক্ষিত নেই? সুতরাং পড়ায় কি দোষ হতে পারে? (আল–মুগনী ও আল–মুহাল্লা –ইবনে হাযম)।

এ মাসয়ালা সম্পর্কে ফকীহদের মতামত নিম্নরূপ ঃ

ইমাম আলাউদ্দীন আল–কাশানী بدائع الصنائع গ্রন্থে এ বিষয়ে হানাফীদের মতের ব্যাখ্যা করে বলেছেন ঃ বিনা অযুতে নামায পড়া যেমন জায়েয নয়, তেমনি কুরআন মজীদ স্পর্শ করাও জায়েয নয়। তবে কুরআন মজীদ যদি গেলাফের মধ্যে থাকে তাহলে স্পর্শ করা যেতে পারে। কোন কোন ফকীহর মতে চামড়ার আবরণ এবং কারো

কারো মতে যে কোষ, লেফাফা বা জুযদানের মধ্যে কুরআন শরীফ রাখা হয় এবং তা থেকে আবার বের করা যায় তা–ই গেলাফের পর্যায়ভুক্ত। অনুরূপ বিনা অযুতে তাফসীর গ্রন্থসমূহ এবং এমন কোন বস্তু স্পর্শ করা উচিত নয় যার ওপর কুরআনের কোন আয়াত লিখিত আছে। কিন্তু ফিকাহর গ্রন্থসমূহ স্পর্শ করা যেতে পারে। তবে এ ক্ষেত্রেও উত্তম হচ্ছে বিনা অযুতে স্পর্শ না করা। কারণ দলীল প্রমাণ হিসেবে তার মধ্যে কুরআনের আয়াত লিখিত থাকে। হানাফী ফকীহদের কারো কারো মত হচ্ছে কুরআন মজীদের যে অংশে আয়াত লিখিত আছে শুধু সেই অংশ বিনা অযুতে স্পর্শ করা ঠিক নয়। কিন্তু যে অংশে টীকা লেখা হয় তা ফাঁকা হোক কিংবা ব্যাখ্যা হিসেবে কিছু লেখা থাক, তা স্পর্শ করায় কোন দোষ নেই। তবে সঠিক কথা হলো, টীকা বা ব্যাখ্যাসমূহও কুরআনেরই একটা অংশ এবং তা স্পর্শ করা কুরআন মজীদ স্পর্শ করার শামিল। এরপর কুরআন শরীফ পড়া সম্পর্কে বলা যায় যে, "বিনা অযুতে কুরআন শরীফ পড়া জায়েয।" ফতোয়ায়ে আলমগিরী গ্রন্থে শিশুদেরকে এই নির্দেশের আওতা বহির্ভূত গণ্য করা হয়েছে। অযু থাক বা না থাক শিক্ষার জন্য শিশুদের হাতে কুরআন শরীফ দেয়া যেতে পারে।

ইমাম নববী (র) المنهاج গ্রন্থে শাফেয়ী মাযহাবের মতামত বর্ণনা করেছেন এভাবে ঃ নামায ও তাওয়াফের মত বিনা অযুতে কুরআন মজীদ স্পর্শ করা কিংবা তার কোন পাতা স্পর্শ করা হারাম। অনুরূপ কুরআনের জিলদ স্পর্শ করাও নিষেধ। তাছাড়া কুরআন যদি কোন থলি বা ব্যাগের মধ্যে রাখা থাকে কিংবা গেলাফ বা বাক্সের মধ্যে থাকে বা দরসে কুরআনের জন্য তার কোন অংশ কোন ফলকের ওপরে লিখিত থাকে তাও স্পর্শ করা জায়েয নয়। তবে যদি কারো মালপত্রের মধ্যে রাখা থাকে, কিংবা তাফসীর গ্রন্থসমূহে লিপিবদ্ধ থাকে অথবা কোন মুদ্রার গায়ে তা ক্ষোদিত হয় তাহলে তা স্পর্শ করা জায়েয। শিশুর অযু না থাকলেও সে কুরআন স্পর্শ করতে পারে। কেউ যদি অযু ছাড়া কুরআন পাঠ করে তাহলে কাঠ বা অন্য কোন জিনিসের সাহায্যে পাতা উল্টাতে পারে।

'আল–ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ' গ্রন্থে মালেকী মাযহাবের যে মত উদ্ধৃত করা হয়েছে তা হচ্ছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ ফকীহদের সাথে তারা এ ব্যাপারে একমত যে, হাত দিয়ে কুরআন মজীদ স্পর্শ করার জন্য অযু শর্ত কিন্তু কুরআন শিক্ষার প্রয়োজনে তারা শিক্ষক ও ছাত্র উভয়কে এ ব্যাপারে ছাড় দিয়েছেন। এমনকি তাদের মতে শিক্ষার জন্য ঋতুবতী নারীর জন্যেও কুরআন শরীফ স্পর্শ করা জায়েয। ইবনে কুদামা আল–মুগনী গ্রন্থে ইমাম মালেকের (র) এ উক্তিটি উদ্ধৃত করেছেন যে, নাপাক অবস্থায় তো কুরআন শরীফ পড়া নিষেধ। কিন্তু ঋতু অবস্থায় নারীর জন্য কুরআন পড়ার অনুমতি আছে। কারণ, আমরা যদি দীর্ঘ সময় পর্যন্ত তাকে কুরআন পড়া থেকে বিরত রাখি তাহলে সে তা ভুলে যাবে।

ইবনে কুদামা হাম্বলী মযহাবের যেসব বিধি–বিধান উল্লেখ করেছেন তা হচ্ছে, নাপাক এবং হায়েজ ও নিফাস অবস্থায় কুরআন কিংবা কুরআনের পূর্ণ কোন আয়াত পড়া জায়েয নয়। তবে বিসমিল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ ইত্যাদি পড়া জায়েয। কারণ এগুলো কুরআনের কোন না কোন আয়াতের অংশ হলেও সেগুলো পড়ার ক্ষেত্রে কুরআন তেলাওয়াতের উদ্দেশ্য থাকে না। তবে কোন অবস্থায়ই বিনা অযুতে হাত দিয়ে কুরআন শরীফ স্পর্শ করা

فَلَوْلَآ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ ﴿٨٣﴾ وَأَنتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ ﴿٨٤﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ ﴿٨٥﴾ فَلَوْلَآ إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿٨٦﴾ تَرْجِعُونَهَآ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿٨٧﴾ فَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿٨٨﴾ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنْ أَصْحَٰبِ الْيَمِينِ ﴿٩٠﴾ فَسَلَٰمٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَٰبِ الْيَمِينِ ﴿٩١﴾ وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّآلِّينَ ﴿٩٢﴾ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ ﴿٩٤﴾ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٩٦﴾

তোমরা যদি কারো অধীন না হয়ে থাকো এবং নিজেদের এ ধারণার ব্যাপারে যদি সত্যবাদী হয়ে থাকো তাহলে মৃত্যুপথযাত্রীর প্রাণ যখন কণ্ঠনালীতে উপনীত হয় এবং তোমরা নিজ চোখে দেখতে পাও যে, সে মৃত্যুমুখে পতিত হচ্ছে সে সময় তোমরা বিদায়ী প্রাণবায়ুকে ফিরিয়ে আন না কেন? সে সময় তোমাদের চেয়ে আমিই তার অধিকতর নিকটে থাকি। কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না। মৃত সেই ব্যক্তি যদি মুকাররাবীনদের কেউ হয়ে থাকে তাহলে তার জন্য রয়েছে আরাম-আয়েশ, উত্তম রিযিক এবং নিয়ামতে ভরা জান্নাত। আর সে যদি ডান দিকের লোক হয়ে থাকে তাহলে তাকে সাদর অভিনন্দন জানানো হয় এভাবে যে, তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আর সে যদি অস্বীকারকারী পথভ্রষ্টদের কেউ হয়ে থাকে তাহলে তার সমাদরের জন্য রয়েছে ফুটন্ত গরম পনি এবং জাহান্নামে ঠেলে দেয়ার ব্যবস্থা।

এ সবকিছুই অকাট্য সত্য। অতএব, হে নবী, আপনার মহান রবের নামের তাসবীহ- তথা পবিত্রতা ঘোষণা করুন।[৪২]

জায়েয নয়। তবে চিঠিপত্রে কিংবা ফিকাহর কোন গ্রন্থ বা অন্য কিছু লিখিত বিষয়ের মধ্যে যদি কুরআনের কোন আয়াত লিপিবদ্ধ থাকে তাহলে তা হাত দিয়ে স্পর্শ করা নিষেধ নয়। অনুরূপভাবে কুরআন যদি কোন জিনিসের মধ্যে সংরক্ষিত থাকে তাহলে অযু ছাড়াই তা হাত দিয়ে ধরে উঠানো যায়। তাফসীর গ্রন্থসমূহ হাত দিয়ে ধরার ক্ষেত্রে অযু শর্ত নয়। তাছাড়া তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে অযুহীন কোন লোককে যদি হাত দিয়ে কুরআন শরীফ

স্পর্শ করতে হয় তাহলে সে তায়াম্মুম করে নিতে পারে। 'আল ফিকহু আলাল মাযাহিবিল আরবা'আ' গ্রন্থে হাম্বলী মাযহাবের এ মাসয়ালাটিও উল্লেখ আছে যে, শিক্ষার উদ্দেশ্যেও শিশুদের বিনা অযুতে কুরআন শরীফ স্পর্শ করা ঠিক নয়। তাদের হাতে কুরআন শরীফ দেয়ার আগে তাদের অভিভাবকদের কর্তব্য তাদের অযু করানো।

এ মাসয়ালা সম্পর্কে জাহেরীদের মাতামত হচ্ছে, কেউ বিনা অযুতে থাক বা নাপাক অবস্থায় থাক কিংবা ঋতুবতী স্ত্রীলোক হোক সবার জন্য কুরআন পাঠ করা এবং হাত দিয়ে তা স্পর্শ করা সর্বাবস্থায় জায়েয। ইবনে হাযম তাঁর আল–মুহাল্লা গ্রন্থে (১ম খণ্ড, ৭৭ থেকে ৮৪ পৃষ্ঠা) এ মাসয়ালা সম্পর্কে সবিস্তার আলোচনা করেছেন। তাতে এ মতটি সঠিক ও বিশুদ্ধ হওয়া সম্পর্কে বহু দলীল প্রমাণ পেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, কুরআন পাঠ করা এবং তা স্পর্শ করার ব্যাপারে ফকীহগণ যে শর্তাবলী আরোপ করেছেন তার কোনটিই কুরআন ও সুন্নাহ থেকে প্রমাণিত নয়।

৪০. মূল আয়াতের কথাটি হচ্ছে أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ । ادهان অর্থ কোন ব্যাপারে খোশামোদ ও তোয়াজ করার নীতি গ্রহণ করা, গুরুত্ব না দেয়া এবং যথাযোগ্য মনোযোগের উপযুক্ত মনে না করা। ইংরেজীতে (to take lightly) কথাটি দ্বারা প্রায় একই অর্থ প্রকাশ পায়।

৪১. ইমাম রাযী تَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ কথাটির ব্যাখ্যায় এখানে রিযিক শব্দটির অর্থ আয় রোজগার ও উপার্জন হওয়ার সম্ভাবনার কথাও প্রকাশ করেছেন। কুরাইশ গোত্রের কাফেররা যেহেতু কুরআনের দাওয়াতকে তাদের উপার্জন ও আর্থিক স্বার্থের জন্য ক্ষতিকর বলে মনে করতো। তারা মনে করতো এ আন্দোলন যদি সাফল্য মণ্ডিত হয় তাহলে আমাদের আয় উপার্জনের পথ ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই আয়াতটির অর্থ এও হতে পারে যে, তোমরা পেটের ধান্ধার কারণেই কুরআনকে অস্বীকার করে যাচ্ছো। তোমাদের কাছে হক ও বাতিলের কোন গুরুত্বই নেই। তোমাদের দৃষ্টিতে সত্যিকার গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে রুটি। রুটির জন্য তোমরা হকের বিরোধীতা করতে এবং বাতিলের সহযোগিতা গ্রহণ করতে একটুও দ্বিধান্বিত নও।

৪২. হযরত উকবা ইবনে আমের জুহানী বর্ণনা করেছেন, এ আয়াত নাযিল হলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তোমরা এটিকে রুকূ'তে স্থান দাও। অর্থাৎ রুকূ'তে سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيمِ পড়। পরে سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى আয়াতটি নাযিল হলে তিনি বললেন, এটিকে তোমরা সিজদায় স্থান দাও। অর্থাৎ সিজদায় سُبْحَانَ رَبِّىَ الْأَعْلَى পড় (মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হাববান, হাকেম)। এ থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের যে নিয়ম পদ্ধতি বেঁধে দিয়েছেন তার ছোট ছোট বিষয়গুলো পর্যন্ত কুরআনের ইংগিত ও নির্দেশনা থেকেই গৃহীত।

আল হাদীদ

৫৭

নামকরণ

সূরার ২৫ আয়াতের وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ বাক্যাংশ থেকে নাম গৃহীত হয়েছে।

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

সর্ব সম্মত মতে এটি মদীনায় অবতীর্ণ সূরা। এ সূরার বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা ভাবনা করলে মনে হয় সম্ভবত উহুদ যুদ্ধ ও হুদায়বিয়ার সন্ধির মধ্যবর্তী কোন এক সময় এ সূরা নাযিল হয়েছে। এটা সে সময়ের কথা যখন কাফেররা চারদিক থেকে ক্ষুদ্র এ ইসলামী রাষ্ট্রটিকে তাদের আক্রমণের লক্ষস্থল বানিয়েছিল এবং ঈমানদারদের ক্ষুদ্র একটি দল অত্যন্ত সহায় সম্বলহীন অবস্থায় সমগ্র আরবের শক্তির মোকাবিলা করে যাচ্ছিলেন। এ পরিস্থিতিতে ইসলাম তার অনুসারীদের কাছে শুধু জীবনের কুরবানীই চাচ্ছিলো না বরং সম্পদের কুরবানীর প্রয়োজনীয়তাও একান্তভাবে উপলব্ধি করছিলো। এ ধরনের কুরবানী পেশ করার জন্য এ সূরায় অত্যন্ত জোরালো আবেদন জানানো হয়েছে। সূরার ১০ আয়াত এ অনুমানকে আরো জোরালো করছে। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা ঈমানদারদের দলকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, যারা বিজয়ের পরে নিজেদের অর্থ সম্পদ খরচ করবে এবং আল্লাহর পথে লড়াই করবে তারা কখনো ঐ সব লোকের সমমর্যাদা সম্পন্ন হতে পারবে না যারা বিজয় লাভের পূর্বে জান ও মালের কুরবানী পেশ করবে। ইবনে মারদুইয়া কর্তৃক উদ্ধৃত হযরত আনাস (রা) বর্ণিত হাদীস একথাই সমর্থন করে। তিনি اَلَمْ يَاْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন : কুরআন নাযিলের শুরু থেকে ১৭ বছর পর ঈমানদারদের আলোড়নকারী এ আয়াতটি নাযিল হয়। এ হিসেব অনুসারে এর নাযিল হওয়ার সময় ৪র্থ ও পঞ্চম হিজরী সনের মধ্যবর্তী সময়ই এ সূরার নাযিল হওয়ার সময়-কাল বলে নির্ধারিত হয়।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

এ সূরার আলোচ্য বিষয় হচ্ছে আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার উপদেশ দান। যখন আরব জাহেলিয়াতের সাথে ইসলামের সিদ্ধান্তকর সংগ্রাম চলছিলো, ইসলামের ইতিহাসের সে সংকটকালে মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে আর্থিক কুরবানীর জন্য প্রস্তুত করা এবং ঈমান যে শুধু মৌখিক স্বীকৃতি ও বাহ্যিক কিছু কাজকর্মের নাম নয় বরং আল্লাহ ও তার রসূলের জন্য একনিষ্ঠ হওয়াই তার মূল চেতনা ও প্রেরণা, একথা তাদের

মনে বদ্ধমূল করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই এ সূরা নাযিল করা হয়েছিল। যে ব্যক্তির মধ্যে এ চেতনা ও প্রেরণা অনুপস্থিত এবং আল্লাহ ও তার দীনের মোবাবিলায় নিজের প্রাণ, সম্পদ ও স্বার্থকে অধিকতর ভালবাসে তার ঈমানের দাবী অন্তসার শূন্য। আল্লাহর কাছে এ ধরনের ঈমানের কোন মূল্য ও মর্যাদা নেই।

এ উদ্দেশ্যে সর্ব প্রথম আল্লাহ তা'আলার গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে যাতে শ্রোতারা ভালভাবে উপলব্ধি করতে পারে যে, কোন মহান সত্তার পক্ষ থেকে তাঁকে সম্বোধন করা হচ্ছে। তারপর নিম্নের বিষয়গুলো ধারাবাহিকভাবে পেশ করা হয়েছে।

ঈমানের অনিবার্য দাবী হচ্ছে, ব্যক্তি যেন আল্লাহর পথে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে গড়িমসি ও টালবাহানা না করে। এ ধরনের কাজ শুধু ঈমানের পরিপন্থীই নয়, বাস্তবতার বিচারেও ভুল। কেননা, এসব অর্থ-সম্পদ মূলত আল্লাহ তা'আলারই অর্থ-সম্পদ। তোমাদেরকে খলিফা হিসেবে তা ব্যবহার করার ইখতিয়ার দেয়া হয়েছে। এ অর্থ-সম্পদই কাল অন্যদের হাতে ছিল, আজ তোমাদের হাতে আছে এবং ভবিষ্যতে অন্য কারো হাতে চলে যাবে। শেষ মেশ তা বিশ্ব-জাহানের প্রতিটি জিনিসের মালিক আল্লাহর কাছেই থেকে যাবে। এ সম্পদের কোন অংশ তোমাদের কাজে লাগলে কেবল সেই অংশই লাগতে পারে যা তোমাদের অধিকারে থাকা কালে তোমরা আল্লাহর কাজে ব্যয় করবে।

আল্লাহর পথে জান ও মালের কুরবানী পেশ করা যদিও সর্বাবস্থায়ই সম্মানজনক কাজ। কিন্তু এসব ত্যাগ ও কুরবানীর মূল্য ও মর্যাদা অবস্থার নাজুকতা দিয়ে নিরূপিত হয়। এমন সময়ও আসে যখন কুফরী শক্তি অত্যন্ত প্রবল হয়ে ওঠে এবং সর্বক্ষণ এমন একটা আশংকা বিদ্যমান থাকে যে, কুফরীর সাথে সংঘাতে ইসলাম হয়তো পরাভূত হয়ে পড়বে। আবার এমন একটা সময়ও আসে যখন কুফর ও ইসলামের দ্বন্দে শক্তির ভারসাম্য ইসলামের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং ন্যায় ও সত্যের দুশমনদের মোকাবেলায় ঈমানের অনুসারীরা বিজয়লাভ করতে থাকে। গুরুত্বের দিক দিয়ে এ দু'টি পরিস্থিতি সমান নয়। তাই এ ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে যে ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করা হয় মূল্যের দিক দিয়ে তাও সমান নয়। ইসলাম যখন দুর্বল তখন তাকে সমুন্নত ও বিজয়ী করার জন্য যারা প্রাণপণ চেষ্টা সাধনা ও অর্থ সম্পদ ব্যয় করবে ইসলামের বিজয় যুগে তার বিস্তার ও প্রসারের জন্য যারা প্রাণ ও সম্পদ অকাতরে ব্যয় করবে তারা তাদের সমমর্যাদা লাভ করতে পারবে না।

ন্যায় ও সত্যের পথে যতটা সম্পদ ব্যয় করা হবে আল্লাহর কাছে তা ঋণ হিসেবে গণ্য হবে। আর আল্লাহ ঐ সম্পদকে কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দেবেন শুধু তাই নয় নিজের পক্ষ থেকে অতিরিক্ত পুরস্কারও দান করবেন।

আখেরাতে সেসব ঈমানদার কেবল নূর লাভ করবে যারা আল্লাহর পথে তাদের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করেছে। মুনাফিকরা যারা দুনিয়াতে নিজেদের স্বার্থই কেবল রক্ষা করেছে। এবং ন্যায় ও সত্য বিজয়ী হচ্ছে, না বাতিল বিজয়ী হচ্ছে তার কোন পরোয়াই করেনি। দুনিয়ার এ জীবনে তারা ঈমানদারদের সাথেই মিলে মিশে থাকলেও আখেরাতে

তাদেরকে ঈমানদারদের থেকে আলাদা করে দেয়া হবে। তারা 'নূর' থেকে বঞ্চিত হবে এবং কাফেরদের সাথে তাদের হাশর হবে।

যেসব আহলে কিতাবের গোটা জীবন দুনিয়া পূজায় অতিবাহিত হয়েছে এবং যাদের মন দীর্ঘদিনের গাফলতি ও অমনোযোগিতার কারণে পাথরের ন্যায় কঠোর হয়ে গিয়েছে মুসলমানদের তাদের মত হয়ে যাওয়া ঠিক নয়। সে কেমন ঈমানদার আল্লাহর কথা শুনে যার হৃদয়মন বিগলিত হয় না। এবং তাঁর নাযিলকৃত সত্য বিধানের সামনে মাথা নত করে না।

কেবল সেই সব ঈমানদারই আল্লাহর নিকট 'সিদ্দীক' ও শহীদ বলে গণ্য যারা কোন রকম প্রদর্শনীর মনোভাব ছাড়াই একান্ত আন্তরিকতা ও সততার সাথে নিজেদের অর্থ–সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে।

দুনিয়ার জীবন মাত্র কয়েক দিনের চাকচিক্য এবং ধোকার উপকরণ। এখানকার খেল তামাসা, এখানকার আনন্দ ও আকর্ষণ, এখানকার সৌন্দর্য ও সাজ সজ্জা, এখানকার শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে গর্ব ও অহংকার এবং এখানকার ধন সম্পদ ও ঐশ্বর্যের ব্যাপারে একে অপরকে অতিক্রম করার চেষ্টা সাধনা সব কিছুই অস্থায়ী। এর উপমা দেয়া যায় সেই শস্য ক্ষেত্রের সাথে যা প্রথম পর্যায়ে সবুজ ও সতেজ হয়ে ওঠে। তারপর বিবর্ণ হয়ে তামাটে বর্ণ ধারণ করে এবং সর্বশেষে ভূষিতে পরিণত হয়। প্রকৃতপক্ষে আখেরাতের জীবন হচ্ছে স্থায়ী জীবন যেখানে সব কাজের বড় বড় ফলাফল পাওয়া যাবে। তোমাদের যদি প্রতিযোগিতামূলকভাবে কিছু করতে হয় তাহলে জান্নাতের দিকে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার জন্য চেষ্টা করো। পৃথিবীতে আরাম–আয়েশ ও বিপদ আপদ যাই আসে তা আল্লাহ তা'আলার পূর্ব লিখিত সিদ্ধান্ত অনুসারেই আসে। একজন ঈমানদারের ভূমিকা হওয়া উচিত বিপদ আপদ আসলে সাহস না হারানো এবং আরাম–আয়েশ ও সুখ–শান্তি আসলে গর্ব প্রকাশ না করা। একজন মুনাফিক বা কাফেরের আচরণ হচ্ছে আল্লাহ যদি তাকে নিয়ামত দান করেন তাহলে সে গর্বে মেতে ওঠে, অহংকার প্রকাশ করতে থাকে এবং নিয়ামত দাতা আল্লাহর কাজে ব্যয় করতে নিজেও সংকীর্ণতার পরিচয় দেয় এবং অন্যদেরকেও কার্পণ্য করতে পরামর্শ দেয়।

আল্লাহ সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ, কিতাব এবং ন্যায় বিচারের ভারসাম্যপূর্ণ মানদণ্ড সহকারে তাঁর রসূল পাঠিয়েছেন, যাতে মানুষ ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে আর তার সাথে লোহাও নাযিল করেছেন যাতে ন্যায় ও সত্য প্রতিষ্ঠা এবং বাতিলের মাথা অবনত করার জন্য শক্তি ব্যবহার করা যায়। এভাবে আল্লাহ দেখতে চান মানুষের মধ্যে এমন লোক কারা যারা তাঁর দীনের সহায়তা ও সাহায্যের জন্য প্রস্তুত হয় এবং সেজন্য প্রাণপণে চেষ্টা করে। তোমাদের নিজেদের উন্নতি ও মর্যাদার জন্য আল্লাহ এই সুযোগসমূহ সৃষ্টি করেছেন। অন্যথায় আল্লাহ তাঁর কাজের জন্য কারো মুখাপেক্ষী নন।

আল্লাহর পক্ষ থেকে ইতিপূর্বেও একের পর এক নবী রসূলগণ এসেছেন। তাদের আহবানে কিছু লোক সঠিক পথে ফিরে এসেছে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই পাপাচারী রয়ে গিয়েছে। তার পর ঈসা আলাইহিস সালাম এসেছেন। তাঁর শিক্ষায় মানুষের মধ্যে বহু নৈতিক গুণাবলী সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু তাঁর 'উম্মত' বৈরাগ্যবাদের বিদআত অবলম্বন করে।

এখন আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঠিয়েছেন। যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনবে এবং আল্লাহকে ভয় করে জীবন যাপন করবে আল্লাহ তাদেরকে তাঁর রহমতের দ্বিগুণ অংশ দেবেন এবং তাদেরকে এমন 'নূর' দান করবেন যার সাহায্যে তারা দুনিয়ার জীবনে পদে পদে বাঁকা পথসমূহের মধ্যে সোজা পথটি স্পষ্ট দেখে চলতে পারবে। আহলে কিতাব নিজেদেরকে যদিও আল্লাহর রহমতের ঠিকাদার মনে করে থাকে। কিন্তু আল্লাহর রহমত তাঁর নিজেরই হাতে আছে। যাকে ইচ্ছা তাকে এই রহমত ও অনুগ্রহ দান করার ইখতিয়ার তাঁর আছে। এ হচ্ছে এই সূরায় সুবিন্যস্ত ও ধারাবাহিকভাবে বর্ণিত বিষয়বস্তুর সার সংক্ষেপ।

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ① لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ ۚ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ② هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ۚ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ③

যমীন ও আসমানসমূহের প্রতিটি জিনিসই আল্লাহর তাসবীহ করেছে।[১] তিনি মহা পরাক্রমশালী ও অতিশয় বিজ্ঞ।[২] পৃথিবী ও আকাশ সাম্রাজ্যের সার্বভৌম মালিক তিনিই। তিনিই জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান। তিনিই আদি তিনি অন্ত এবং তিনিই প্রকাশিত তিনিই গোপন।[৩] তিনি সব বিষয়ে অবহিত।

১. অর্থাৎ বিশ্ব–জাহানের প্রত্যেকটি বস্তু সদা সর্বদা এ সত্য প্রকাশ এবং ঘোষণা করে চলেছে যে, এ বিশ্ব–জাহানের স্রষ্টা ও পালনকর্তা সব রকম দোষ–ত্রুটি, অপূর্ণতা, দুর্বলতা, ভুল ভ্রান্তি ও অকল্যাণ থেকে পবিত্র। তার ব্যক্তি সত্তা পবিত্র, তাঁর গুণাবলী পবিত্র, তাঁর কাজকর্ম পবিত্র এবং তাঁর সমস্ত সৃষ্টিমূলক বা শরীয়াতের বিধান সম্পর্কিত নির্দেশাবলীও পবিত্র। এখানে অতীতকাল নির্দেশক শব্দরূপ سَبَّحَ ব্যবহার করা হয়েছে এবং অন্য কিছু ক্ষেত্রে বর্তমান ও ভবিষ্যত কাল নির্দেশক শব্দ يُسَبِّحُ ব্যবহার করা হয়েছে। এর অর্থ দাঁড়ায় এই যে, বিশ্ব–জাহানের প্রতিটি অণু পরমাণু চিরদিন তার স্রষ্টার পবিত্রতা বর্ণনা করেছে, আজও করছে এবং ভবিষ্যতেও চিরদিন করতে থাকবে।

২. মূল আয়াতে هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ বাক্যটি ব্যবহৃত হয়েছে। এ বাক্যের শুরুতেই هُوَ শব্দ ব্যবহার করায় আপনা থেকেই এর অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে, তিনি মহা পরাক্রমশালী ও অতিশয় বিজ্ঞ শুধু তাই নয়, বরং প্রকৃত পক্ষে কেবলমাত্র তিনিই এমন সত্তা যিনি মহা পরাক্রমশালী ও অতিশয় বিজ্ঞ। عَزِيْزٌ শব্দের অর্থ পরাক্রমশালী, শক্তিমান ও অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতার অধিকারী যার সিদ্ধান্তের বাস্তবায়ন পৃথিবীর কোন শক্তিই রোধ করতে পারে না, যার সাথে টক্কর নেয়ার সাধ্য কারো নেই, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় যার আনুগত্য সবাইকে করতে হয়, যার অমান্যকারী কোনভাবেই তার পাকড়াও থেকে রক্ষা পায় না। আর حَكِيْمٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে, তিনি যাই করেন, জ্ঞান ও যুক্তি বুদ্ধির সাহায্যে

করেন। তাঁর সৃষ্টি, তাঁর ব্যবস্থাপনা, তাঁর শাসন, তাঁর আদেশ নিষেধ, তাঁর নির্দেশনা সব কিছুই জ্ঞান ও যুক্তি নির্ভর। তাঁর কোন কাজেই অজ্ঞতা, বোকামি ও মূর্খতার লেশমাত্র নেই।

এখানে আরো একটি সূক্ষ্ম বিষয় আছে যা ভালভাবে বুঝতে হবে। কুরআন মজীদের অতি অল্প সংখ্যক স্থানে আল্লাহ তা'আলার গুণবাচক নাম عزيز (মহাপরাক্রমশালী) এর সাথে قوى (নিরংকুশ শক্তির অধিকারী), مقتدر (ক্ষমতাধর), جبار (আপন নির্দেশাবলী বাস্তবায়নকারী) এবং ذوانتقام (প্রতিশোধ গ্রহণকারী) শব্দগুলো ব্যবহৃত হয়েছে যার সাহায্যে তাঁর নিরংকুশ ক্ষমতার প্রকাশ ঘটে। যেখানে বাক্যের ধারাবাহিকতা জালেম ও অবাধ্যদের জন্য আল্লাহর আযাবের ভীতি প্রদর্শন দাবী করে কেবল সেখানেই এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এ ধরনের হাতে গোনা কতিপয় স্থান বাদ দিলে আর যেখানেই عزيز শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে সেখানেই তার সাথে সাথে حكيم (অতিশয় বিজ্ঞ), عليم (সর্বজ্ঞাতা), رحيم (দয়াল, নিয়ামতদানকারী), غفور (ক্ষমাশীল) وهاب (সার্বক্ষণিক দানকারী) এবং حميد (প্রশংসিত) শব্দগুলোর মধ্য থেকে কোন শব্দ অবশ্যই ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, যে সত্তা অসীম ক্ষমতার অধিকারী, সে যদি নির্বোধ হয়, মূর্খ হয়, দয়া মায়াহীন হয়, ক্ষমা ও মার্জনা আদৌ না জানে, কৃপণ হয় এবং দুশ্চরিত্র হয় তাহলে তার ক্ষমতার পরিণাম জুলুম নির্যাতন ছাড়া আর কিছু হতে পারে না। পৃথিবীতে যেখানেই জুলুম নির্যাতন হচ্ছে তার মুল কারণ এই যে, যে ব্যক্তি অন্যদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছে সে তার শক্তি ও ক্ষমতাকে হয় মূর্খতার সাথে ব্যবহার করছে, নয়তো সে দয়ামায়াহীন, কঠোর হৃদয় অথবা কৃপণ ও সংকীর্ণমনা কিংবা দুশ্চরিত্র ও দুষ্কর্মশীল। যে ক্ষেত্রেই শক্তির সাথে এসব দোষ একত্রিত হবে সে ক্ষেত্রেই কোন কল্যাণের আশা করা যায় না। এ কারণে কুরআন মজীদে আল্লাহর গুনবাচক নাম عزيز এর সাথে তাঁর حكيم ، عليم ، رحيم ، غفور ، حميد ও وهاب হওয়ার কথাও অবশ্যই উল্লেখ করা হয়েছে যাতে মানুষ জানতে পারে, যে আল্লাহ এ বিশ্ব–জাহান শাসন ও পরিচালনা করছেন একদিকে তিনি এমন ক্ষমতার অধিকারী যে যমীন থেকে নিয়ে আসমান পর্যন্ত কেউ তাঁর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাধা দিতে পারে না, অপর দিকে তিনি حكيم বা (মহাজ্ঞানী)ও বটে। তাঁর প্রত্যেকটি সিদ্ধান্ত সরাসরি জ্ঞান ও বিজ্ঞতার ভিত্তিতে হয়ে থাকে। তিনি عليمও। যে ফায়সালাই তিনি করেন জ্ঞান অনুসারেই করেন। তিনি رحيمও। নিজের অসীম ক্ষমতা ও কতৃত্বকে নির্দয়ভাবে ব্যবহার করেন না। তিনি غفورও। অধীনস্তদের সাথে ছিদ্রান্বেষণ বা খুঁত ধরা মানসিকতার নয়, বরং ক্ষমাশীলতার আচরণ করে থাকেন। তিনি وهابও। নিজের অধীনস্তদের সাথে কৃপণতার আচরণ করেন না। বরং চরম দানশীলতা ও বদান্যতার আচরণ করছেন। এবং তিনি حميد ও। তাঁর সত্তায় প্রশংসার যোগ্য সমস্ত গুণাবলী ও পূর্ণতার সমাহার ঘটেছে।

যারা সার্বভৌমত্বের (Sovereignty) ওপর রাষ্ট্র দর্শন ও আইন দর্শনের আলোচনা সম্পর্কে অবহিত, তারা কুরআনের এ বক্তব্যের প্রকৃত গুরুত্বকে ভালভাবে বুঝতে পারবেন। সার্বভৌমত্ব বলতে বুঝায়, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী ব্যক্তি, অসীম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের মালিক হবে। তার আদেশ ও সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে বাধা সৃষ্টিকারী, তা পরিবর্তনকারী বা পুনর্বিবেচনাকারী কোন আভ্যন্তরীণ বা বাইরের শক্তি থাকবে না এবং তার আনুগত্য করা ছাড়া কারো কোন উপায়ও থাকবে না। এ অসীম ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের

ধারণার সাথে মানুষের বিবেক-বুদ্ধি অনিবার্যরূপেই দাবী করে যে, যিনি এ ধরনের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী হবেন তাকে নিষ্কলুষ এবং জ্ঞান-বুদ্ধিতে পূর্ণাংগ ও স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে হবে। কারণ, এরূপ ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সম্পন্ন লোক নির্বোধ, মুর্খ, দয়ামায়াহীন এবং দুশ্চরিত্র হলে তার সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হওয়া সর্বাত্মক জুলুম ও বিপর্যয় সৃষ্টি করবে। এ কারণে যেসব দার্শনিক কোন মানুষ বা মানবীয় প্রতিষ্ঠান কিংবা কোন একদল মানুষকে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করেছে তাদেরকে একথাও ধরে নিতে হয়েছে যে, তারা ভুল ত্রুটির উর্ধে হবে। কিন্তু এ কথা স্পষ্ট যে, কোন মানবীয় কর্তৃত্ব বাস্তবে যেমন কখনো এরূপ নিরঙ্কুশ ও সীমাহীন সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করতে পারে না তেমনি কোন বাদশাহ বা পার্লামেন্ট, জাতি কিংবা পার্টি সীমিত পরিসরে যে সার্বভৌম ক্ষমতা লাভ করে থাকে তা নির্ভুল পন্থায় কাজে লাগানোও তার পক্ষে সম্ভব নয়। কারণ এমন যুক্তিবুদ্ধি যার মধ্যে অজ্ঞতার লেশমাত্র নেই এবং এমন জ্ঞান যা সংশ্লিষ্ট সব সত্যকে পরিব্যাপ্ত করে—কোন একজন মানুষ, একক কোন প্রতিষ্ঠান বা কোন জাতির ভাগ্যে জুটে যাওয়া তো দূরের কথা, সম্মিলিতভাবে গোটা মানব জাতিও লাভ করেনি। অনুরূপভাবে মানুষ যতক্ষণ মানুষ ততক্ষণ তার পক্ষে নিজের স্বার্থপরতা, ইন্দ্রিয়পরায়ণতা, ভয়ভীতি, লোভ লালসা, ইচ্ছা আকাংখা, পক্ষপাতিত্ব, আবেগ তাড়িত সন্তুষ্টি ও ক্রোধ এবং ভালবাসা ও ঘৃণা করা থেকে উর্ধে উঠাও সম্ভবপর নয়। এসব সত্যকে সামনে রেখে কেউ যদি গভীরভাবে চিন্তা করে তাহলে সে উপলব্ধি করবে যে, এ বক্তব্যের মধ্যে কুরআন প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌমত্বের সঠিক ও পূর্ণাংগ ধারণা পেশ করছে। কুরআন বলছে ঃ عزيز এ বিশ্ব-জাহানে অর্থাৎ নিরংকুশ ও অসীম ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ তা'আলা ছাড়া আর কেউ নেই। আর কেবল তিনিই সমাহীন এই ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী একমাত্র সত্তা যিনি 'নিষ্কলুষ' 'হাকীম' ও 'আলীম' 'রাহীম' ও 'গাফুর' এবং 'হামীদ' ও 'ওয়াহহাব'।

৩. অর্থাৎ যখন কিছুই ছিল না তখন তিনি ছিলেন এবং যখন কিছুই থাকবে না তখন তিনি থাকবেন। তিনি সব প্রকাশ্যের চেয়ে অধিক প্রকাশ্য। কারণ পৃথিবীতে যে জিনিসের প্রকাশ দেখা যায় তা তাঁরই গুণাবলী, তাঁরই কার্যাবলী এবং তাঁরই নূরের প্রকাশ। আর তিনি সব গুপ্ত জিনিসের চেয়ে অধিক গুপ্ত। কারণ, ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা তাঁর সত্তাকে অনুভব ও উপলব্ধি করা তো দূরের কথা বিবেক-বুদ্ধি, চিন্তাভাবনা ও কল্পনা পর্যন্ত তাঁর রহস্য ও বাস্তবতাকে স্পর্শ করতে পারে না। ইমাম আহমদ, মুসলিম, তিরমিযী ও বায়হাকী হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে এবং হাফেজ আবু ইয়া'লা মুসেলী তার মুসনাদ গ্রন্থে হযরত আয়েশা (রা) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি দোয়া সম্বলিত যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তার নিম্নোক্ত কথাগুলোই এ আয়াতের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা ঃ

انت الاول فليس قبلك شيئ وانت الاخر فليس بعدك شيئ وانت ال ظاهر فليس فوقك شيئ وانت الباطن فليس دونك شيئ -

"তুমিই সর্ব প্রথম। তোমার পূর্বে আর কেউ নেই। তুমিই সর্বশেষ। তোমার পরে আর কেউ নেই। তুমিই প্রকাশ্য। তোমার চেয়ে প্রকাশ্য কেউ নেই। তুমি গুপ্ত। তোমার চেয়ে অধিক গুপ্ত আর কেউ নেই।"

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوٰى عَلَى الْعَرْشِ ۚ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٤﴾ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٥﴾ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۚ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿٦﴾

তিনিই আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং তারপর আরশে সমাসীন হয়েছেন।[৪] যা কিছু মাটির মধ্যে প্রবেশ করে, যা কিছু তা থেকে বেরিয়ে আসে এবং যা কিছু আসমান থেকে অবতীর্ণ হয় আর যা কিছু আসমানে উঠে যায়[৫] তা তিনি জানেন। তোমরা যেখানেই থাক তিনি তোমাদের সাথে আছেন।[৬] তোমরা যা করছো আল্লাহ তা দেখছেন। আসমান ও যমীনের নিরংকুশ ও সার্বভৌম মালিকানা একমাত্র তাঁরই। সব ব্যাপারের ফায়সালার জন্য তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হয়। তিনিই রাতকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবিষ্ট করেন। তিনি অন্তরের গোপন কথা পর্যন্ত জানেন।

এখানে প্রশ্ন দেখা দেয় যে, কুরআন মজীদে জান্নাত ও দোযখবাসীদের জন্য যে চিরস্থায়ী জীবনের কথা বলা হয়েছে আল্লাহ তা'আলাই সর্বশেষ অর্থাৎ যখন কিছুই থাকবে না তখন তিনি থাকবেন—তার সাথে এ কথা কি করে খাপ খায়? এর জবাব কুরআন মজীদের মধ্যেই বিদ্যমান। (كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (القصص : ٨٨ অর্থাৎ আল্লাহর সত্তা ছাড়া আর সব জিনিসই নশ্বর ও ধ্বংসশীল।" অন্য কথায় কোন সৃষ্টিরই নিজস্ব স্থায়িত্ব নেই। যদি কোন জিনিস স্থায়ী হয় বা স্থায়ী থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলা স্থায়ী রাখার কারণেই তা স্থায়ী হয়ে আছে এবং থাকতে পারে। অন্যথায় আল্লাহ ছাড়া স্ব স্ব ক্ষেত্রে আর সবাই নশ্বর ও ধ্বংসশীল। কেউ আপন ক্ষমতা ও বৈশিষ্টে অবিনশ্বর বিধায় জান্নাত বা দোযখে চিরস্থায়িত্ব লাভ করবে—এমনটা নয়। বরং সেখানে তার স্থায়িত্ব লাভ করার কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা তাকে চিরস্থায়ী জীবন দান করবেন। ফেরেশতাদের ব্যাপারটাও ঠিক তাই। তারা আপন ক্ষমতা ও বৈশিষ্টে অবিনশ্বর নয়। আল্লাহ যখন ইচ্ছা করেছেন তখন তারা অস্তিত্ব লাভ করেছে এবং যত সময় পর্যন্ত তিনি চাইবেন তত সময় পর্যন্তই তারা বেঁচে থাকতে পারে।

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيْنَ فِيْهِ ؕ فَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا لَهُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ ۞ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ ۚ وَالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ لِتُؤْمِنُوْا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ اَخَذَ مِيْثَاقَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۞

আল্লাহ ও তাঁর রসূলের[৭] প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং ব্যয় কর[৮] সে জিনিস যার প্রতিনিধিত্বমূলক মালিকানা তিনি তোমাদের দিয়েছেন।[৯] তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে ও অর্থ-সম্পদ খরচ করবে[১০] তাদের জন্য বড় প্রতিদান রয়েছে। তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান আনছো না। অথচ তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আনার জন্য রসূল তোমাদের প্রতি আহবান জানাচ্ছেন[১১] অথচ তিনি তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছেন।[১২] যদি তোমরা সত্যিই স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত হও।

৪. অর্থাৎ বিশ্বজাহানের স্রষ্টাও তিনি শাসনকর্তাও তিনি। (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আল আ'রাফ, টীকা ৪১-৪২, ইউনুস, টীকা ৪, আর রা'দ, টীকা ২ থেকে ৫, হামীম আস সাজদা, টীকা ১১ থেকে ১৫)।

৫. অন্য কথায় তিনি শুধু সামগ্রিক জ্ঞানের অধিকারী নন, খুঁটি নাটি বিষয়েও জ্ঞানের অধিকারী। এক একটি শস্যদানা ও বীজ যা মাটির গভীরে প্রবিষ্ট হয়, এক একটি ছোট পাতা ও অঙ্কুর যা মাটি ফুঁড়ে বের হয়, বৃষ্টির এক একটি বিন্দু যা আসমান থেকে পতিত হয় এবং সমুদ্র ও খালবিল থেকে যে বাষ্পরাশি আকাশের দিকে উত্থিত হয়, তার প্রতিটি মাত্রা তাঁর জানা আছে। কোন্ দানাটি ও বীজটি পৃথিবীর কোন্‌খানে কিভাবে পড়ে আছে তা তিনি জানেন বলেই সেটিকে বিদীর্ণ করে অঙ্কুরোদগম করেন এবং তাকে লালন পালন করে বড় করেন। কি পরিমাণ বাষ্প কোন্ কোন্ স্থান থেকে উত্থিত হয়েছে এবং কোথায় কোথায় পৌঁছেছে তা তিনি জানেন বলেই সেগুলো একত্রিত করে মেঘমালা সৃষ্টি করেন এবং ভূপৃষ্ঠের বিভিন্ন অংশের জন্য তা বন্টন করে দিয়ে একটি হিসেব অনুসারে বৃষ্টিপাত ঘটান। আর যেসব জিনিস মাটিতে প্রবেশ করে ও তা থেকে বেরিয়ে আসে এবং যেসব জিনিস আসমানের দিকে উঠে যায় ও তা থেকে নেমে আসে তার বিস্তারিত দিকও এর আলোকে অনুমান ও অনুধাবন করা যেতে পারে। আল্লাহর জ্ঞান যদি এসব বিষয়ে পরিব্যপ্ত না হতো, তাহলে প্রতিটি জিনিসই আলাদা আলাদা ব্যবস্থাপনা এবং প্রত্যেকটি জিনিসই এমন নিপুন, নিখুঁত ও বিজ্ঞোচিত পন্থায় ব্যবস্থাপনা করা কিভাবে সম্ভব হতো?

৬. অর্থাৎ তোমরা কোন জায়গায়ই তাঁর জ্ঞান, তাঁর অসীম ক্ষমতা, তাঁর শাসন কর্তৃত্ব এবং তাঁর ব্যবস্থাপনার আওতা বহির্ভূত নও। মাটিতে, বায়ুতে, পানিতে অথবা কোন

নিভৃত কোণে যেখানেই তোমরা থাক না কেন সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ জানেন তোমরা কোথায় আছো। সেখানে তোমাদের বেঁচে থাকাটাই একথা প্রমাণ করে যে, আল্লাহ ঐ স্থানেও তোমাদের জীবন ধারণের উপকরণ সরবরাহ করছেন। তোমাদের হৃদপিণ্ডে যে স্পন্দন উঠছে, তোমাদের ফুসফুস যে শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করছে, তোমাদের শ্রবণ শক্তি ও দৃষ্টিশক্তি যে কাজ করছে এসব কিছুরই কারণ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার প্রত্যক্ষ ব্যবস্থাপনায় তোমাদের দেহের সব যন্ত্রপাতি ঠিকমত কাজ করছে। কোন সময় যদি তোমাদের মৃত্যু আসে তাহলে এ কারণে আসে যে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে তোমাদের বেঁচে থাকার ব্যবস্থাপনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে তোমাদেরকে প্রত্যাহার করে নেয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

৭. অমুসলিমদের সম্বোধন করে একথা বলা হয়নি। বরং পরবর্তী গোটা বক্তব্য থেকে একথাই প্রকাশ পাচ্ছে যে, এখানে সেই সব মুসলমানদের সম্বোধন করা হয়েছে যারা ইসলামের বাণী স্বীকার করে ঈমান গ্রহণকারীদের সাথে শামিল হয়েছিলেন। কিন্তু ঈমানের দাবী পূরণ করা এবং মু'মিনের মত জীবন পদ্ধতি গ্রহণ করা থেকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিলেন। একথা সবারই জানা যে, অমুসলিমদেরকে ঈমানের দাওয়াত দেয়ার সাথে সাথেই একথা বলা যায় না যে, আল্লাহর পথে জিহাদের খাতে উদার মনে সাহায্য করো। কিংবা তাদেরকে একথাও বলা যায় না যে, তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়লাভের পূর্বে জিহাদ ও আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় করবে তাদের মর্যাদা যারা বিজয়লাভের পরে এসব কাজ করবে তাদের চেয়ে অনেক বেশী হবে। অমুসলিমদের দাওয়াত দেয়ার ক্ষেত্রে প্রথমে তাদের সামনে ইসলামের প্রাথমিক দাবী পেশ করা হয়ে থাকে, চূড়ান্ত দাবী নয়। এ কারণে বক্তব্যের ধারা অনুসারে এখানে امنوا بالله ورسوله বলার অর্থ হচ্ছে, হে সেই সব লোক, যারা ঈমানের দাবী করে মুসলমানদের দলে শামিল হয়েছো—আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে সরল মনে সত্যিকার অর্থে মেনে নাও এবং এমন কর্মপন্থা গ্রহণ করো যা নিষ্ঠাবান মু'মিনদের করা উচিত।

৮. এখানে ব্যয় করার অর্থ সাধারণ কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা নয়। বরং ১০ নম্বর আয়াতের ভাষা স্পষ্টভাবে বলছে যে, এখানে এর অর্থ ঐ সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নেতৃত্বে কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে ইসলামকে সমুন্নত করার যে সংগ্রাম চলছিলো সে উদ্দেশ্যে ব্যয় করা। বিশেষ করে সে সময় এমন দু'টি প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল যে জন্য ইসলামী সরকার চরমভাবে আর্থিক সাহায্যের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছিল। এর একটি ছিল সামরিক প্রয়োজন। আর অপরটি ছিল সেসব নির্যাতিত মুসলমানদের সাহায্য সহযোগিতা করা যারা কাফেরদের জুলুম নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে আরবের প্রতিটি অংশ থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে এসেছিলো এবং আরো আসছিলো। এ ব্যয় মেটানোর জন্য সত্যিকার মু'মিনগণ তাঁদের শক্তি ও সামর্থের চেয়ে বেশী বোঝা নিজেরা বহন করছিলো। পরবর্তী ১০, ১২, ১৮ ও ১৯ আয়াতে এজন্য তাদের প্রশংসা করা হয়েছে। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে বহুসংখ্যক এমন স্বচ্ছল লোকও ছিল যারা কুফর ও ইসলামের এ সংঘাতকে নিছক দর্শক হয়ে দেখছিলো। যে জিনিসের প্রতি ঈমান পোষণের দাবী তারা করছিলো তার কিছু কর্তব্য ও দায়–দায়িত্ব যে, তাদের প্রাণ ও সম্পদের ওপর বর্তায়, সে বিষয়ে কোন অনুভূতিই তাদের ছিল না। এ দ্বিতীয় প্রকারের লোকদেরকেই এ আয়াতে

সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের বলা হচ্ছে, খাঁটি মু'মিন হও এবং আল্লাহর পথে অর্থ ব্যয় কর।

৯. এর দু'টি অর্থ এবং দু'টি অর্থই এখানে প্রযোজ্য। একটি অর্থ হচ্ছে, তোমাদের কাছে যে সম্পদ আছে তা মূলত তোমাদের নিজের সম্পদ নয়, তা আল্লাহর দেয়া সম্পদ। তোমরা নিজেরা এর মালিক নও। আল্লাহ তাঁর নিজের প্রতিনিধি হিসেবে এ সম্পদ তোমদের অধিকারে দিয়েছেন। অতএব, সম্পদের মূল মালিকের কাজে তা ব্যয় করতে কুন্ঠিত ও পিছপা হয়ো না। মালিকের সম্পদ মালিকের কাজে ব্যয় করতে টালবাহানা করা প্রতিনিধির কাজ নয়। দ্বিতীয় অর্থ হলো, এ অর্থ চিরদিন তোমাদের কাছে ছিল না এবং চিরদিন তোমাদের কাছে থাকবেও না। কাল তা অন্য কিছু লোকের কাছে ছিল, আজ আল্লাহ তোমাদেরকে তাদের স্থলাভিষিক্ত করে তা তোমাদের হাতে সোপর্দ করেছেন। আবার এমন এক সময় আসবে যখন তা তোমাদের কাছে থাকবে না। অন্য লোকেরা তোমাদের স্থলাভিষিক্ত হবে। সাময়িক কৃর্তত্বের এ সংক্ষিপ্ত সময়ে যখন এ সম্পদ তোমাদের অধিকার ও কর্তৃত্বে থাকে তখন আল্লাহর কাজে তা খরচ করো, যাতে আখেরাতে তোমরা তার স্থায়ী প্রতিদান লাভ করতে পার। একটি হাদীসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ কথাটিই বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বর্ণনা করেছেন : একবার নবীর (সা) বাড়ীতে একটি বকরী জবাই করে তার গোশত বন্টন করা হলো। ঘরে গিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন : বকরীর কি অবশিষ্ট আছে ? হযরত আয়েশা বললেন : مَا بَقِيَ اِلاَّ كَتِفُهَا "একটি হাত ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।" নবী (সা) বললেন : بقى كلهاغير كتفها "একটি হাত ছাড়া গোটা বকরীই অবশিষ্ট আছে।" অর্থাৎ আল্লাহর পথে যা ব্যয়িত হলো প্রকৃতপক্ষে সেটাই অবশিষ্ট রইলো। আরো একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো : হে আল্লাহর রসূল কোন্ প্রকার দানের সওয়াব সবচেয়ে বেশী? তিনি বললেন :

ان تصدق وانت صحيح شحيح تخشى الفقر وتامل الغنى ولا تمهل حتى اذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان –

"যদি তুমি এমন পরিস্থিতিতে দান করো যে, তুমি সুস্থ সবল সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে তা বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন অনুভব করছো এবং তা কোন কাজে খাটিয়ে অধিক উপার্জনের আশা করো। সে সময়ের অপেক্ষায় থেকো না যখন প্রাণ ওষ্ঠাগত হবে আর তুমি ওসিয়ত করবে যে, এটা অমুককে দিতে হবে এবং এটা অমুককে দিতে হবে। সে সময় তো এ সম্পদ অমুক অমুকের কাছেই চলে যাবে" (বুখারী ও মুসলিম)।

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। নবী (সা) বলেছেন :

يقول ابن ادم مالى مالى ، وهل لك من مالك الا ما اكلت فافنيت او لبست فابليت ، او تصدقت فامضيت ؟ وما سوى ذلك فذاهب وتاركه للناس –

"মানুষ বলে, আমার সম্পদ, আমার সম্পদ। অথচ তোমার সম্পদের যতটা তুমি খেয়ে নিঃশেষ করলে কিংবা পরিধান করে পুরনো করে ফেললে অথবা দান করে ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করলে তা ছাড়া তোমার সম্পদে তোমার আর কোন অংশ নেই। এছাড়া আর যাই আছে একদিন তা তোমার হাত থেকে চলে যাবে আর তুমি অন্যদের জন্য তা রেখে যাবে"। –(মুসলিম)

১০. এখানে পুনরায় জিহাদে অর্থ সম্পদ ব্যয় করাকে ঈমানের অনিবার্য দাবী এবং আন্তরিকতাপূর্ণ ঈমানের আবশ্যিক প্রমাণ বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অন্য কথায় যেন বলা হয়েছে। প্রকৃত ও নিষ্ঠাবান মু'মিন সে–ই, যে এরূপ পরিস্থিতিতে অর্থ ব্যয় করতে টালবাহানা করে না।

১১. অর্থাৎ এমন এক পরিস্থিতিতে তোমরা ঈমানের পরিপন্থী এই কর্মপন্থা গ্রহণ করছো যখন আল্লাহর রসূল নিজে তোমাদের মাঝে আছেন এবং তোমাদেরকে কোন দূরবর্তী মাধ্যমের সাহায্যে ঈমানের দাওয়াত দেয়া হচ্ছে না, বরং তোমাদের কাছে সে দাওয়াত সরাসরি আল্লাহর রসূলের মুখ থেকে পৌছুচ্ছে।

১২. কিছু সংখ্যক মুফাসসির এ প্রতিশ্রুতি বলতে অর্থ করেছেন আল্লাহর দাসত্ব করার সে প্রতিশ্রুতি যা সৃষ্টির সূচনা পর্বে আদম আলাইহিস সালামের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাঁর সমস্ত সন্তানকে বের করে তাদের সবার নিকট থেকে নেয়া হয়েছিল। কিন্তু অপর কিছু সংখ্যক তাফসীরকার এর অর্থ করেছেন সে প্রতিশ্রুতি যা প্রত্যেক মানুষের প্রকৃতি ও প্রকৃতিগত বিবেক–বুদ্ধিতে আল্লাহর দাসত্বের জন্য বর্তমান। কিন্তু সঠিক কথা হলো, এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্যের সচেতন প্রতিশ্রুতি ঈমান গ্রহণ করার মাধ্যমে প্রত্যেক মুসলমান আল্লাহর সাথে যে প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ হয়। কুরআন মজীদের অন্য এক স্থানে যে ভাষায় এ প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে ঃ

وَاذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَمِيْثَاقَهُ الَّذِىْ وَاثَقَكُمْ بِهٖ ۙ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ ۢبِذَاتِ الصُّدُوْرِ (المائده :٧)

"আল্লাহ তোমাদের যেসব নিয়ামত দান করেছেন সেসব নিয়ামতের কথা মনে কর এবং তোমাদের কাছ থেকে যে প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছেন তার কথাও মনে কর। সে সময় তোমরা বলেছিলে ঃ আমরা শুনলাম এবং আনুগত্য করলাম। আর আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ মনের কথাও জানেন।"

হযরত উবাদা ইবনে সামেত থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেছেন ঃ

بايعنا رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه وسلم على السمع والطاعة فى النشاط والكسل وعلى النفقة فى العسر واليسر وعلى الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وعلى ان نقول فى اللّٰه تعالى ولا نخاف لومة لائم – (مسند احمد)

هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَىٰ عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ⑨ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ۚ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا ۚ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ⑩

সেই মহান সত্তা তো তিনিই যিনি তাঁর বান্দার কাছে স্পষ্ট আয়াতসমূহ নাযিল করছেন যাতে তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোর দিকে নিয়ে আসতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ তোমাদের প্রতি অতীব দয়ালু ও মেহেরবান। কি ব্যাপার যে, তোমরা আল্লাহর পথে খরচ করছো না, অথচ যমীন ও আসমানের উত্তরাধিকার তাঁরই।[১৩] তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের পরে অর্থ ব্যয় করবে ও জিহাদ করবে তারা কখনো সেসব লোকের সমকক্ষ হতে পারে না যারা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে। বিজয়ের পরে ব্যয়কারী ও জিহাদকারীদের তুলনায় তাদের মর্যাদা অনেক বেশী। যদিও আল্লাহ উভয়কে ভাল প্রতিদানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।[১৪] তোমরা যা করছো আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।[১৫]

"রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের থেকে এই মর্মে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন যে, আমরা যেন সক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয়তা উভয় অবস্থায় শুনি ও আনুগত্য করে যাই এবং স্বচ্ছলতা ও অস্বচ্ছলতা উভয় অবস্থায় আল্লাহর পথে খরচ করি, ভাল কাজের আদেশ করি এবং মন্দ কাজে নিষেধ করি, আল্লাহ সম্পর্কে সত্য কথা বলি এবং সেজন্য কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় না করি।" (মুসনাদে আহমদ)।

১৩. এর দু'টি অর্থ। একটি অর্থ হচ্ছে, এ অর্থ সম্পদ চিরদিন তোমাদের কাছে থাকবে না। একদিন তা ছেড়ে তোমাদেরকে অবশ্যই যেতে হবে এবং তখন আল্লাহই হবেন এর উত্তরাধিকারী। তাহলে নিজের জীবদ্দশায় নিজের হাতে কেন তা আল্লাহর পথে ব্যয় করবে না? এভাবে ব্যয় করলে আল্লাহর কাছে তোমাদের পুরস্কার প্রাপ্য হবে। ব্যয় না করলেও তা আল্লাহর কাছেই ফিরে যাবে। তবে পার্থক্য হবে এই যে, সে ক্ষেত্রে তোমরা কোন পুরস্কার লাভ করবে না। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, আল্লাহর পথে অর্থ খরচ করতে গিয়ে তোমাদের কোন রকম দারিদ্র বা অস্বচ্ছলতার আশংকা করা উচিত নয়। কেননা, যে

আল্লাহর উদ্দেশ্যে তা খরচ করবে তিনি পৃথিবী ও ঊর্ধ জগতের সমস্ত ভাণ্ডারের মালিক। আজ তিনি তোমাদেরকে যা দান করে রেখেছেন তাঁর কাছে দেয়ার শুধু ঐ টুকুই ছিল না। কাল তিনি তোমাদেরকে তার চেয়েও অনেক বেশী দিতে পারেন। একথাটাই অন্য একটা স্থানে এভাবে বলা হয়েছে ঃ

قُلْ اِنَّ رَبِّى يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْئٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ وَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ - (السبا : ٣٩)

"হে নবী, তাদের বলো, আমার রব তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা অঢেল রিযিক দান করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা সংকীর্ণ করে দেন। আর তোমরা যা খরচ করো তার পরিবর্তে তিনিই তোমাদেরকে আরো রিযিক দান করেন। তিনি সর্বোত্তম রিযিক দাতা।" (সাবা–৩৯)

১৪. অর্থাৎ উভয়েই পুরস্কার লাভের যোগ্য। কিন্তু এক গোষ্ঠীর মর্যাদা অপর গোষ্ঠীর চেয়ে নিশ্চিতভাবেই অনেক উচ্চতর। কারণ, অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে তারা আল্লাহ তা'আলার জন্য এমন সব বিপদাপদের সম্মুখীন হয়েছিলো যার সম্মুখীন অন্য গোষ্ঠীকে হতে হয়নি। তারা এমন পরিস্থিতিতে অর্থ খরচ করেছে যখন কোথাও এ সম্ভাবনা পরিদৃষ্ট হচ্ছিলো না যে, বিজয়ের মাধ্যমে এ ব্যায়ের ক্ষতিপূরণ হবে। তাছাড়া তারা এমন নাজুক সময়ে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে যখন প্রতি মুহূর্তে এ আশংকা ছিল যে, শত্রু বিজয় লাভ করে ইসলামের অনুসারীদের পিষে মারবে। মুফাসসিরদের মধ্যে মুজাহিদ, কাতাদা এবং যায়েদ ইবনে আসলাম বলেন ঃ এ আয়াতে বিজয় শব্দটি যে ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়েছে সেটি হচ্ছে মক্কা বিজয়। আমের শা'বী বলেন ঃ এর দ্বারা হুদায়বিয়ার সন্ধিকে বুঝানো হয়েছে। অধিকাংশ মুফাসসির প্রথম মতটি গ্রহণ করেছেন। দ্বিতীয় মতটির সমর্থনে হযরত আবু সাঈদ খুদরী বর্ণিত এই হাদীসটি পেশ করা হয় যে, হুদায়বিয়ার সন্ধিকালে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লাম আমাদের বললেন ঃ অচিরেই এমন লোক জন আসবে যাদের আমল বা কাজকর্ম দেখে তোমরা নিজেদের কাজকর্মকে নগণ্য মনে করবে। কিন্তু

لو كان لاحدهم جبل من ذهب فانفقه ما ادرك مد احدكم ولا نصيفه -

"তাদের কারো কাছে যদি পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও থাকে আর সে তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে তবুও সে তোমাদের দুই রতল এমন কি এক রতল পরিমাণ ব্যয় করার সমকক্ষও হতে পারবে না" (ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুইয়া, আবু নুআইম ইসফাহানী)।

তাছাড়া ইমাম আহমদ কর্তৃক হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসেও এ মতের প্রতি সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন ঃ একবার হযরত খালেদ (রা) ইবনে ওয়ালীদ এবং হযরত আবদুর রহমান (রা) ইবনে আওফের মধ্যে ঝগড়া হয়। ঝগড়ার মুহূর্তে হযরত

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١١﴾ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَىٰ نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ يَوْمَ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالْمُنَافِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انْظُرُونَا نَقْتَبِسْ مِنْ نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴿١٣﴾

২ রুকূ'

এমন কেউ কি আছে যে আল্লাহকে ঋণ দিতে পারে? উত্তম ঋণ যাতে আল্লাহ তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দেন। আর সেদিন তার জন্য রয়েছে সর্বোত্তম প্রতিদান[১৬] যেদিন তোমরা ঈমানদার নারী ও পুরুষদের দেখবে, তাদের 'নূর' তাদের সামনে ও ডান দিকে দৌড়াচ্ছে।[১৭] (তাদেরকে বলা হবে) "আজ তোমাদের জন্য সুসংবাদ।" জান্নাতসমূহ থাকবে যার পাদদেশ দিয়ে ঝর্ণাধারাসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। যেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই বড় সফলতা। সেদিন মুনাফিক নারী পুরুষের অবস্থা হবে এই যে, তারা মু'মিনদের বলবে ঃ আমাদের প্রতি একটু লক্ষ কর যাতে তোমাদের 'নূর' থেকে আমরা কিছু উপকৃত হতে পারি।[১৮] কিন্তু তাদের বলা হবে ঃ পেছনে চলে যাও। অন্য কোথাও নিজেদের নূর তালাশ কর। অতপর একটি প্রাচীর দিয়ে তাদের মাঝে আড়াল করে দেয়া হবে। তাতে একটি দরজা থাকবে। সে দরজার ভেতর দিকে থাকবে রহমত আর বাইরে থাকবে আযাব।[১৯]

খালেদ (রা) হযরত আবদুর রহমান (রা) কে বলেন ঃ "তোমরা তোমাদের অতীত কাজ কর্মের কারণেই আমাদের কাছে গর্ব কর এবং বড় হতে চাও।" এ কথা নবীর (সা) কাছে পৌছলে তিনি বললেন ঃ "যে আল্লাহর হাতে আমার প্রাণ, তাঁর শপথ ! যদি তোমরা উহুদের সমপরিমাণ বা পাহাড়গুলোর সমপরিমাণ স্বর্ণও খরচ করো তবুও এসব লোকের আমলের সমান হতে পারবে না।" এ থেকে প্রমাণ পেশ করা হয় যে, বিজয় অর্থ হুদাইবিয়ার

সন্ধি। কারণ, হযরত খালেদ হুদাইবিয়ার এ সন্ধির পরে ঈমান এনেছিলেন এবং মক্কা বিজয়ে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু এ বিশেষ ক্ষেত্রে বিজয় বলতে হুদাইবিয়ার সন্ধি কিংবা মক্কা বিজয় যা–ই বুঝানো হোক না কেন সর্বক্ষেত্রে এ আয়াতের অর্থ এ নয় যে, এ একটি মাত্র বিজয় মর্যাদার পার্থক্যের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। বরং এ থেকে নীতিগত যে কথাটি জানা যায় তা হচ্ছে, ইসলামের জন্য যখনই এমন কোন প্রতিকূল পরিস্থিতির উদ্ভব হবে যখন কুফর ও কাফেরদের পাল্লা অনেক ভারী হবে এবং বাহ্যত ইসলামের বিজয় লাভ করার কোন সুদূর সম্ভাবনা দৃষ্টি গোচর হবে না সে সময় যারা ইসলামের সহযোগিতায় জীবনপাত ও অর্থ–সম্পদ খরচ করবে তাদের সমমর্যদা সেসব লোক লাভ করবে না যারা কুফর ও ইসলামের মধ্যকার ফায়সালা ইসলামের অনুকূলে হয়ে যাওয়ার পর ত্যাগ ও কুরবানী পেশ করবে।

১৫. অর্থাৎ আল্লাহ যাকে যে প্রতিদান দেন ও মর্যাদা দান করেন তা এই দেখে দান করেন যে, সে কোন্ পরিস্থিতিতে কোন্ ধরনের আবেগ অনুভূতি নিয়ে কাজ করেছে। তিনি অন্ধভাবে বন্টন করেন না। তিনি জেনে শুনেই প্রত্যেককে মর্যাদা ও তার কাজের প্রতিদান নির্ধারণ করে থাকেন।

১৬. এটা আল্লাহ তা'আলার চরম উদারতা ও দানশীলতা যে, মানুষ যদি তাঁরই দেয়া সম্পদ তাঁর পথে ব্যয় করে তাহলে তিনি তা নিজের জন্য ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেন। অবশ্য শর্ত এই যে, তা "কর্জে হাসানা" (উত্তম ঋণ) হতে হবে। অর্থাৎ খাঁটি নিয়তে কোন ব্যক্তিগত উদ্দেশ্য ছাড়াই তা দিতে হবে, তার মধ্যে কোন প্রকার প্রদর্শনীর মনোবৃত্তি, খ্যাতি ও নামধামের আকাংখা থাকবে না, তা দিয়ে কাউকে খোঁটা দেয়া যাবে না, দাতা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই দেবে এবং এছাড়া অন্য কারো প্রতিদান বা সন্তুষ্টি লক্ষ হবে না। এ ধরনের ঋণের জন্য আল্লাহর দুইটি প্রতিশ্রুতি আছে। একটি হচ্ছে, তিনি তা কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে ফেরত দেবেন। অপরটি হচ্ছে, এজন্য তিনি নিজের পক্ষ থেকে সর্বোত্তম পুরস্কারও দান করবেন। হাদীসে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে যে, এ আয়াত যখন নাযিল হয় এবং নবীর (সা) পবিত্র মুখ থেকে লোকজন তা শুনতে পায় তখন হযরত আবুদ দাহ্দাহ আনসারী জিজেস করেন ঃ হে আল্লাহর রসূল, আল্লাহ কি আমাদের কাছে ঋণ চান? জবাবে নবী (সা) বলেন ঃ হে আবুদ দাহ্দাহ, হাঁ।' তখন তিনি বললেন ঃ আপনার হাত আমাকে একটু দেখান। নবী (সা) তার দিকে নিজে হাত বাড়িয়ে দিলেন। আবুদ দাহ্দাহ নবীর (সা) হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন ঃ "আমি আমার রবকে আমার বাগান ঋণ দিলাম" হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ বলেন ঃ সেই বাগানে ৬ শত খেজুর গাছ ছিল। বাগানের মধ্যেই ছিল আবুদ দাহ্দাহের বাড়ী। তার ছেলে মেয়েরা সেখানেই থাকতো। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এসব কথাবার্তা বলে তিনি সোজা বাড়ীতে গিয়ে হাজির হলেন এবং স্ত্রীকে ডেকে বললেন ঃ "দাহ্দাহর মা, বেরিয়ে এসো। আমি এ বাগান আমার রবকে ঋণ হিসেবে দিয়ে দিয়েছি।" স্ত্রী বললো ঃ দাহ্দাহর বাপ, তুমি অতিশয় লাভজনক কারবার করেছো" এবং সেই মুহূর্তেই সব আসবাবপত্র ও ছেলেমেয়েকে সাথে নিয়ে বাগান ছেড়ে চলে গেলেন" (ইবনে আবী হাতেম)। এ ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় সে সময় প্রকৃত মু'মিনদের কর্ম পদ্ধতি কেমন ছিল। এ থেকে একথাও বুঝা যায়, যে কর্জে হাসানাকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে

ফেরত দেয়ার এবং তাছাড়াও আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে সম্মানজনক পুরস্কার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা কেমন।

১৭. এ আয়াতটি এবং পরবর্তী আয়াতসমূহ থেকে জানা যায় হাশরের ময়দানে শুধুমাত্র নেককার ঈমানদারদেরই 'নূর' থাকবে। কাফের, মুনাফিক, ফাসেক ও ফাজেররা দুনিয়াতে যেমন অন্ধকারে পথ হারিয়ে হাতড়িয়ে মরেছে সেখানেও তেমনি অন্ধকারে হাতড়িয়ে মরতে থাকবে। যেখানে আলো যেটুকু হবে তা হবে সৎ আকীদা–বিশ্বাস ও সৎ আমলের। ঈমানের সততা এবং চরিত্র ও কর্মের পবিত্রতাই 'নূরে' রূপান্তরিত হবে যার কারণে সৎ লোকদের ব্যক্তিত্ব ঝলমলিয়ে উঠবে। যার কর্ম যতটা উজ্জল হবে তার ব্যক্তি–সত্তার আলোক রশ্মিও তত বেশী তীব্র হবে। সে যখন হাশরের ময়দান থেকে জান্নাতের দিকে যাত্রা করবে তখন তার 'নূর' বা আলো তার আগে আগে ছুটতে থাকবে। এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা হচ্ছে কাতাদা বর্ণিত একটি 'মুরসাল' হাদীস। উক্ত হাদীসে তিনি বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "কারো কারো 'নূর' এত তীব্র হবে যে, মদীনা থেকে "আদন" এর সম পরিমাণ দূরত্ব পর্যন্ত পৌছতে থাকবে। তাছাড়া কারো 'নূর' পৌছবে মদীনা থেকে সান'আ পর্যন্ত, কারো তার চেয়েও কম এমনকি এমন মু'মিন থাকবে যার নূর তার পায়ের তলা থেকে সামনে যাবে না" (ইবনে জারীর)। অন্য কথায় যার মাধ্যমে পৃথিবীর যত বেশী কল্যাণ হবে তার 'নূর' তত বেশী উজ্জ্বল হবে এবং পৃথিবীর যেসব স্থানে তার কল্যাণ পৌছবে হাশরের ময়দানেও তার নূরের আলো ততটা দূরত্ব পর্যন্ত দৌড়াতে থাকবে।

এখানে একটি প্রশ্ন মানুষের মনে দ্বিধা–দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করতে পারে। প্রশ্নটি হচ্ছে, নূর বা আলোক রশ্মির আগে আগে দৌড়ানোর ব্যাপারটি বোধগম্য হয়। কিন্তু শুধু ডান পাশে নূর দৌড়ানোর অর্থ কি? তবে কি তাদের বাঁ দিকে অন্ধকার থাকবে? এ প্রশ্নের জবাব হচ্ছে, কেউ যদি তার ডান হাতে আলো নিয়ে পথ চলতে থাকে তাহলে তার বাঁ দিকটাও কিন্তু আলোকিত হবে। অথচ বাস্তব ঘটনা এই যে, আলো আছে তার ডান হাতে। হযরত আবু যার ও আবুদ দারদা কর্তৃক বর্ণিত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের একটি হাদীস থেকে এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্য পাওয়া যায়। নবী (সা) বলেছেন ঃ

اعرفهم بنورهم الذى يسعى بين ايديهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم -

"আমি সেখানে আমার উম্মতের নেক্‌কার লোকদের তাদের নূরের সাহায্যে চিনতে পারবো—যে নূর তাদের সামনে ডানে ও বাঁয়ে দৌড়াতে থাকবে" (হাকেম, ইবনে আবী হাতেম, ইবনে মারদুইয়া)।

১৮. অর্থ হচ্ছে, মু'মিনগণ যখন জান্নাতের দিকে যেতে থাকবেন তখন আলো থাকবে তাদের সামনে আর মুনাফিকরা পেছনের অন্ধকারে ঠোকর খেতে থাকবে। সে সময় তারা ঈমানদারদেরকে ডেকে ডেকে বলতে থাকবে। আমাদের দিকে একটু ফিরে তাকাও যাতে আমরাও কিছু আলো পেতে পারি। কারণ এ মুনাফিকরা দুনিয়াতে ঈমানদারদের সাথে একই মুসলিম সমাজে বসবাস করতো।

يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ وَلَٰكِنَّكُمْ فَتَنتُمْ
أَنفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ
وَغَرَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ ﴿١٤﴾ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ
كَفَرُوا ۚ مَأْوَاكُمُ النَّارُ ۖ هِيَ مَوْلَاكُمْ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿١٥﴾

তারা ঈমানদারদের ডেকে ডেকে বলবে আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না?[২০] ঈমানদাররা জওয়াব দেবে হাঁ, তবে তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে ফিতনার মধ্যে নিক্ষেপ করেছিলে[২১], সুযোগের সন্ধানে ছিলে,[২২] সন্দেহে নিপতিত ছিলে[২৩] এবং মিথ্যা আশা–আকাংখা তোমাদেরকে প্রতারিত করছিলো। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর ফায়সালা এসে হাজির হলো[২৪] এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সে বড় প্রতারক[২৫] আল্লাহর ব্যাপারে প্রতারণা করে চললো। অতএব, তোমাদের নিকট থেকে আজ কোন বিনিময় গ্রহণ করা হবে না। আর তাদের নিকট থেকেও গ্রহণ করা হবে না যারা সুস্পষ্টভাবে কুফরিতে লিপ্ত ছিল।[২৬] তোমাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সে (জাহান্নাম) তোমাদের খোঁজ খবর নেবে।[২৭] এটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট পরিণতি।

১৯. এর অর্থ হচ্ছে, জান্নাতবাসীগণ ঐ দরজা দিয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং তারপর দরজা বন্ধ করে দেয়া হবে। দরজার এক দিকে থাকবে জান্নাতের নিয়ামতসমূহ আর অপরদিকে থাকবে দোযখের আযাব। যে সীমারেখা জান্নাত ও দোযখের মাঝে আড়াল হয়ে থাকবে মুনাফিকদের পক্ষে তা অতিক্রম করা সম্ভব হবে না।

২০. অর্থাৎ আমরা কি তোমাদের সাথে একই মুসলিম সমাজের অন্তরভুক্ত ছিলাম না? আমরা কি কালেমায় বিশ্বাসী ছিলাম না? তোমাদের মত আমরাও কি নামায পড়তাম না? রোযা রাখতাম না? হজ্জ ও যাকাত আদায় করতাম না? আমরা তোমাদের মজলিসে শরীক হতাম না? তোমাদের সাথে কি আমাদের বিয়ে শাদী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল না? তাহলে আমাদের ও তোমাদের মাঝে আজ এ বিচ্ছিন্নতা আসলো কিভাবে?

২১. অর্থাৎ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও তোমরা খাঁটি মুসলমান হও নাই, বরং ঈমান ও কুফরের মাঝে দোদুল্যমান ছিলে, কুফরী ও কাফেরদের প্রতি তোমাদের আকর্ষণ কখনো ছিন্ন হয়নি এবং তোমরা নিজেদেরকে কখনো ইসলামের সাথে পূর্ণরূপে সম্পৃক্ত করনি।

২২. আয়াতে মূল শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে تَرَبَّصْتُمْ । আরবী ভাষায় تَرَبُّص বলে অপেক্ষা করা ও সুযোগলাভের প্রতীক্ষায় থাকাকে। কেউ যখন দু'টি পথের কোন একটিতে চলার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, বরং এই ভেবে অপেক্ষা করতে থাকে যে, যেদিকে যাওয়া লাভজনক বলে মনে হবে সেদিকেই যাবে তখন বলা হয় সে تَرَبُّص এ

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿١٦﴾ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٧﴾

ঈমান গ্রহণকারীদের জন্য এখনো কি সে সময় আসেনি যে, আল্লাহর স্মরণে তাদের মন বিগলিত হবে, তাঁর নাযিলকৃত মহা সত্যের সামনে অবনত হবে[২৮] এবং তারা সেসব লোকদের মত হবে না যাদেরকে ইতিপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল। দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হওয়ার কারণে তাদের মন কঠোর হয়ে গিয়েছে এবং আজ তাদের অধিকাংশই ফাসেক হয়ে আছে।[২৯] খুব ভাল করে জেনে নাও, আল্লাহ ভূ-পৃষ্ঠকে মৃত হয়ে যাওয়ার পর জীবন দান করেন। আমরা তোমাদেরকে স্পষ্টভাবে নির্দশনসমূহ দেখিয়ে দিয়েছি যাতে তোমরা বিবেক-বুদ্ধি কাজে লাগাও।[৩০]

পড়ে আছে। কুফর ও ইসলামের মধ্যকার সে নাজুক যুগে মুনাফিকরা এ ভূমিকাই গ্রহণ করেছিল। তারা খোলাখুলি কুফরের পক্ষও অবলম্বন করছিল না। আবার পূর্ণ তৃপ্তি ও প্রশান্তির সাথে নিজের শক্তিকে ইসলামের সাহায্য সহযোগিতায় কাজে লাগাচ্ছিলো না। বরং যথারীতি বসে বসে দেখছিলো, এ শক্তি পরীক্ষায় কোন্ দিকের পাল্লা শেষ পর্যন্ত ভারী হয়। যাতে ইসলাম বিজয়ী হচ্ছে বলে মনে হলে সে ইসলামের দিকে পুরোপুরি ঝুঁকে পড়তে পারে এবং মুসলমানদের সাথে কালেমায় বিশ্বাস করার যে সম্পর্ক আছে তা কাজে লাগে। আর যদি কুফরী শক্তি বিজয়ী হয় তাহলে তার সহযোগীদের সাথে যেয়ে শামিল হতে পারে এবং তখন ইসলামের পক্ষ থেকে যুদ্ধে কোন প্রকার অংশ গ্রহণ না করা তার জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হয়।

২৩. এর অর্থ বিভিন্ন রকম সংশয়--সন্দেহ। মুনাফিকরা এ ধরনের সংশয়-সন্দেহে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এগুলোই মুনাফিকীর মূল কারণ। সে আল্লাহর অস্তিত্বে সন্দেহ পোষণ করে। রসূলের রিসালাতে সন্দেহ পোষণ করে, কুরআন যে আল্লাহর কিতাব তাতেও সন্দেহ পোষণ করে। আখেরাত, আখেরাতের জবাবদিহি এবং প্রতিদান ও শাস্তির ব্যাপারেও সন্দেহ পোষণ করে এবং তার মনে এরূপ সন্দেহও সৃষ্টি হয় যে, হক ও বাতিলের এ দ্বন্দ্বের সত্যিই কি কোন স্বার্থকতা আছে? না কি এসবই একটা ঢং। সত্য

শুধু এত টুকুই যে, সুখে স্বাচ্ছন্দে থাকো। এটাই সত্যিকারের জীবন। যতক্ষণ না কেউ এ ধরনের সন্দেহ সংশয়ে নিমজ্জিত হবে ততক্ষণ সে মুনাফিক হতে পারে না।

২৪. এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে, তোমাদের মৃত্যু এসে গেল এবং তোমরা মৃত্যুর মুহূর্ত পর্যন্ত এ প্রতারণার ফাঁদ থেকে বেরিয়ে আসতে পারনি। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, ইসলাম বিজয় লাভ করলো আর তোমরা তামাশার মধ্যেই ডুবে রইলে।

২৫. অর্থাৎ শয়তান।

২৬. এখানে এ বিষয়টি স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, আখেরাতে কাফেরের পরিণতি যা হবে মুনাফিকের পরিণতিও ঠিক তাই হবে।

২৭. মূল আয়াতে ব্যবহৃত কথাটি হচ্ছে هِىَ مَوْلٰكُمْ "দোযখই তোমাদের مولى। এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি হচ্ছে, সেটিই তোমাদের জন্য উপযুক্ত জায়গা। আরেকটি অর্থ হচ্ছে, তোমরা তো আল্লাহকে তোমাদের অভিভাবক বানাওনি যে, তিনি তোমাদের তত্বাবধান করবেন। এখন দোযখই তোমাদের অভিভাবক। সে-ই তোমাদের যথোপযুক্ত তত্বাবধান করবে।

২৮. এখানেও "ঈমান গ্রহণকারী" কথাটি ব্যাপক অর্থবোধক কিন্তু তা দ্বারা সব মুসলমানকে বুঝানো হয়নি, বরং মুসলমানদের সে বিশেষ গোষ্ঠীকে বুঝানো হয়েছে যারা ঈমান গ্রহণের অঙ্গীকার করে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসারীদের মধ্যে শামিল হয়েছিলো এবং তা সত্ত্বেও ইসলামের জন্য তাদের মনে কোন দরদ ছিল না। তারা নিজ চোখে দেখছিলো সমস্ত কুফরী শক্তি ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য বদ্ধ পরিকর হয়েছে, মু'মিনদের ক্ষুদ্র একটি দলকে চারদিক থেকে ঘিরে রেখেছে। আরব ভূমির বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের জুলুম-নির্যাতনের শিকার বানানো হচ্ছে। দেশের নানা স্থান থেকে নির্যাতিত মুসলমানরা নিতান্ত সহায় সম্বলহীন অবস্থায় আশ্রয়লাভের জন্য মদীনার দিকে ছুটে আসছে। এসব মজলুমদের সহায়তা দিতে দিতে সত্যিকার মুসলমানদের কোমর ভেঙ্গে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এরাই আবার জীবন বাজি রেখে শত্রুর মোকাবিলা করছে। কিন্তু এসব দেখে ঈমানের দাবীদার এ লোকগুলোর মধ্যে কোন পরিবর্তনই অসছে না। এ জন্য তাদেরকে ধিক্কার দিয়ে বলা হচ্ছে, তোমরা কেমন ঈমানদার? ইসলামের জন্য পরিস্থিতি নাজুক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। আল্লাহর কথা শুনে তোমাদের অন্তর বিগলিত হবে, তাঁর দীনের জন্য তোমাদের অন্তরে ত্যাগ ও কুরবানীর মনোভাব প্রবল হবে এবং সে জন্য প্রাণপাত করতে আবেগ উদ্বেলিত হয়ে উঠবে, এখনো কি তোমাদের জন্য সে সময় আসেনি? ঈমান গ্রহণকারীরা কি এমনই হয়ে থাকে যে, আল্লাহর দীনের জন্য চরম প্রতিকূল পরিস্থিতির দেখা দিলেও সেজন্য সামান্যতম দরদও অনুভব করবে না? আল্লাহর নাম নিয়ে তাদের আহবান জানানো হবে, কিন্তু তারা আপন স্থান থেকে একটুও নড়বে না? আল্লাহ তাঁর নাযিলকৃত কিতাবে নিজে দান করার জন্য আহবান জানিয়ে তাকে নিজের জন্য ঋণ হিসেবে ঘোষণা করবেন এবং স্পষ্টভাবে এও জানিয়ে দেবেন যে, এ পরিস্থিতিতে যারা তাদের অর্থ সম্পদকে আমার দীনের চেয়ে প্রিয় মনে করবে তারা মু'মিন নয়, মুনাফিক—এতেও তাদের অন্তর আল্লাহর ভয়ে কেঁপেও উঠবে না, তাঁর নির্দেশের আগে তাদের মাথাও নত হবে না?

إِنَّ الْمُصَّدِّقِينَ وَالْمُصَّدِّقَٰتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَٰعَفُ لَهُمْ
وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿١٨﴾ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِۦٓ أُولَٰٓئِكَ هُمُ
الصِّدِّيقُونَ ۖ وَالشُّهَدَآءُ عِندَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ۖ
وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِـَٔايَٰتِنَآ أُولَٰٓئِكَ أَصْحَٰبُ الْجَحِيمِ ﴿١٩﴾

দান সাদকা প্রদানকারী নারী ও পুরুষ[৩১] এবং যারা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দান করে, নিশ্চয়ই কয়েকগুণ বৃদ্ধি করে তাদেরকে ফেরত দেয়া হবে। তাছাড়াও তাদের জন্য আছে সর্বোত্তম প্রতিদান। যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান এনেছে[৩২] তারাই তাদের রবের কাছে 'সিদ্দীক'[৩৩] ও 'শহীদ'[৩৪] বলে গণ্য। তাদের জন্য তাদের পুরস্কার ও 'নূর' রয়েছে।[৩৫] আর যারা কুফরী করেছে এবং আমার আয়াতকে অস্বীকার করেছে তারাই দোযখের বাসিন্দা।

২৯. অর্থাৎ নবীদের তিরোধানের শত শত বছর পর তোমরা ইহুদী ও খৃষ্টানদের চেতনাহীন, মৃত আত্মা এবং নৈতিকভাবে মৃত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছ। অথচ তোমাদের রসূল তোমাদের মধ্যে বর্তমান, আল্লাহর কিতাব নাযিল হচ্ছে, তোমাদের ঈমান গ্রহণের পর দীর্ঘ দিনও অতিবাহিত হয়নি, অথচ তোমাদের অবস্থা ঠিক তেমনি হয়ে যাচ্ছে, শত শত বছর ধরে আল্লাহর দীন ও তাঁর আয়াত নিয়ে খেল তামাশা করতে থাকার পর ইহুদী ও খৃষ্টানদের অবস্থা যা হয়েছে।

৩০. এখানে যে প্রসংগে একথাটি বলা হয়েছে তা ভালভাবে বুঝে নেয়া দরকার। কুরআন মজীদে বেশ কিছু জায়গায় নবুওয়াত ও কিতাব নাযিলকে বৃষ্টির বরকতের সাথে তুলনা করা হয়েছে। কেননা, ভূ-পৃষ্ঠের ওপর বৃষ্টিপাত যে কল্যাণ বয়ে আনে নবুওয়াত এবং কিতাবও মানবজাতির জন্য সে একই রকমের কল্যাণ বয়ে আনে। মৃত ভূ-পৃষ্ঠে যেমন রহমতের বৃষ্টির এক বিন্দু পড়তেই শস্য শ্যামল হয়ে ওঠে। ঠিক তেমনি আল্লাহর রহমতে যে দেশে নবী প্রেরিত হন এবং অহী ও কিতাব নাযিল হওয়া শুরু হয় সেখানে মৃত মানবতা অকস্মাত জীবন লাভ করে। তার এমন সব প্রতিভা ও গুণাবলীর বহিপ্রকাশ ঘটতে থাকে, যা জাহেলিয়াত দীর্ঘদিন থেকে মাটিতে মিশিয়ে রেখেছিলো। তার মধ্য থেকে মহত নৈতিক চরিত্রের ঝর্ণাধারা ফুটে বের হতে থাকে এবং কল্যাণ ও সৎকর্মের ফুলবাগিচা শ্যামলিমায় ভরে ওঠে। এখানে যে উদ্দেশ্যে এ সত্যটির প্রতি ইংগিত করা হয়েছে তা হচ্ছে, দুর্বল ঈমান মুসলমানদের চোখ যেন খুলে যায় এবং তারা যেন নিজেদের অবস্থা সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করে দেখে। নবুওয়াত ও অহীর কল্যাণময় বৃষ্টিধারা থেকে মানবতার মধ্যে যেভাবে নতুন প্রাণের সঞ্চার হচ্ছিলো এবং যেভাবে তার আঁচল কল্যাণে ভরে উঠছিলো তা তাদের জন্য সুদূর অতীতের কোন কাহিনী ছিল না। সাহাবা কিরামের (রা) পূত পবিত্র সমাজে তারা নিজ চোখে তা দেখছিলো। এ ব্যাপারে তারা দিনরাত সর্বক্ষণ

অভিজ্ঞতা লাভ করছিলো। জাহেলিয়াতও তার সমস্ত অকল্যাণসহ তাদের সামনে বর্তমান ছিল এবং জাহেলিয়াতের মোকাবিলায় ইসলাম থেকে যে গুণাবলী ও কল্যাণ উৎসারিত হয়ে পূর্ণরূপে বিকশিত হচ্ছিলো। তাই এসব বিষয় তাদেরকে বিস্তারিত বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। অতএব, মৃত ভূ-পৃষ্ঠকে আল্লাহ তা'আলা রহমতের বারিধারা দ্বারা কিভাবে জীবন দান করেন তোমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে তার নিদর্শন দেখিয়ে দেয়া হয়েছে। এ কারণে সেদিকে শুধু ইংগিত করাই যথেষ্ট ছিল। এখন তোমরা বুদ্ধি বিবেক খাটিয়ে নিজেদের অবস্থা ভেবে দেখ যে, এ নিয়ামত দ্বারা তোমরা কতখানি উপকৃত হচ্ছো।

৩১. বাংলা ভাষায় صدقه (সাদকা) শব্দটি অত্যন্ত খারাপ অর্থে বলা হয়ে থাকে। কিন্তু ইসলামের পরিভাষায় 'সাদকা' বলা হয় এমন দানকে যা সরল মনে খাঁটি নিয়তে কেবলমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই দেয়া হয়। যার মধ্যে কোন প্রদর্শনীর মনোভাব থাকে না, কাউকে উপকার করে খোঁটা দেয়া হয় না। দানকারী তার রবের দাসত্ব ও আনুগত্যের খাঁটি মনোবৃত্তি পোষণ করেন বলেই দেন। এ শব্দটি صدق শব্দটি থেকে গৃহীত। তাই এর পেছনে কাজ করে সততা। কোন দান বা কোন অর্থ ব্যয় ততক্ষণ 'সাদকা' বলে গণ্য হয় না যতক্ষণ তার মধ্যে "ইনফাক ফী সাবীলিল্লাহ" আল্লাহর পথে ব্যয় করার খাঁটি নিয়ত এবং নির্ভেজাল আবেগ ও ভাবধারা কার্যকর না থাকে।

৩২. এখানে ঈমান গ্রহণকারী অর্থ সেসব লোক যারা ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী এবং যাদের কর্মপদ্ধতি ঈমানের মিথ্যা দাবীদার ও দুর্বল ঈমানের লোকদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। সে সময় যারা একে অন্যের তুলনায় অধিক আর্থিক কুরবানী পেশ করছিলো এবং আল্লাহর দীনের জন্য জীবনপণ সংগ্রামে লিপ্ত ছিল।

৩৩. এটি صدق শব্দের অর্থের আধিক্য প্রকাশক শব্দ। صادق অর্থ সত্যবাদী এবং صديق অর্থ অতিশয় সত্যবাদী। কিন্তু একথা ভালভাবে বুঝে নিতে হবে যে, صدق কেবল সত্য ও বাস্তবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কথাকেই বলে না। যে কথা যথাস্থানে সত্য, যার বক্তা মুখে যা বলছে অন্তরেও সেটাকে সত্য বলে বিশ্বাস করে কেবল সে কথার ক্ষেত্রেই এ শব্দটি প্রযোজ্য। যেমন ঃ কেউ যদি বলে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রসূল, তা হলে তা বাস্তবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কথা। কারণ তিনি তো সত্যিকার অর্থেই আল্লাহর রসূল। কিন্তু ঐ ব্যক্তিকে একথার ক্ষেত্রে কেবল তখনই সত্যবাদী বলা যাবে যখন সে বিশ্বাস করবে যে, সত্যই তিনি আল্লাহর রসূল। সুতরাং কোন কথা সত্য হতে হলে প্রয়োজন বাস্তবের সাথে এবং বক্তার মন ও বিবেকের সাথে তার মিল থাকা। অনুরূপভাবে صديق শব্দের অর্থের মধ্যে বিশ্বস্ততা, সরলতা এবং বাস্তব কাজ কর্মে সততাও অন্তরভুক্ত। صادق الوعد (প্রতিশ্রুতি পালনে সত্যবাদী) সে ব্যক্তিকে বলা হবে যে কার্যত তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। صديق (সত্যিকার বন্ধু) তাকেই বলা হবে যে বিপদের সময় বন্ধুত্বের হক আদায় করেছে এবং কেউ কখনো তার থেকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অভিজ্ঞতা লাভ করেনি। যুদ্ধে صادق فى القتال (খাঁটি সৈনিক) কেবল সেই ব্যক্তিকেই বলা হবে যে তার কাজ দ্বারা নিজের বীরত্ব প্রমাণ করেছে। বক্তার কাজ তার কথার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়াটাও صدق শব্দের অর্থ ও তাৎপর্যের অন্তরভুক্ত। যে ব্যক্তি তার কথার পরিপন্থী কাজ করে তাকে সত্যবাদী বলা

যেতে পারে না। এ কারণে যে ব্যক্তি বলে এককথা কিন্তু করে ভিন্ন কিছু, তাকে সবাই মিথ্যাবাদী বলে। এখন ভেবে দেখা দরকার যে, صدق ও صادق শব্দের অর্থ যেখানে এই সেখানে صديق (অতিশয় সত্যবাদী) এ আধিক্য প্রকাশক শব্দটি বলার অর্থ কি হবে। এর অনিবার্য অর্থ হবে এমন সত্যবাদী লোক যার মধ্যে কোন ভেজাল নেই, যে ন্যায় ও সত্যের পথ থেকে কখনো বিচ্যুত হয়নি। যার নিকট থেকে বিবেকের বিরুদ্ধে কোন কথা আশাই করা যায় না, যে কোন কথা মেনে নিয়ে থাকলে পূর্ণ সততার সাথেই মেনে নিয়েছে, যথার্থভাবে তা পালন করেছে এবং নিজের কাজ দ্বারা প্রমাণ করেছে যে, একজন মান্যকারীকে বাস্তবে যা হওয়া উচিত সে তেমনি একজন মান্যকারী (আরো ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আন নিসা, টীকা-৯৯)।

৩৪. এ আয়াতের তাফসীরে বড় বড় মুফাসসিরদের মধ্যে মতানৈক্য আছে। ইবনে আব্বাস (রা), মাসরূক, দাহ্হাক, মুকাতিল ইবনে হাইয়ান প্রমুখ মুফাসসিরদের মতে أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ পর্যন্ত একটি বাক্য শেষ হয়েছে। এরপর وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ পর্যন্ত কথাগুলো একটা স্বতন্ত্র বাক্য। এ ব্যাখ্যা অনুসারে আয়াতের অনুবাদ হবে "যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান এনেছে তারাই 'সিদ্দীক'। আর শহীদদের জন্য তাদের রবের কাছে তাদের পুরস্কার ও 'নূর' রয়েছে। পক্ষান্তরে মুজাহিদ এবং আরো কিছু সংখ্যক মুফাসসির এ পুরা বক্তব্যকে একটা বাক্য বলে মনে করেন। তাদের ব্যাখ্যা অনুসারে আয়াতের অনুবাদ হবে তাই যা আমি ওপরে আয়াতের অনুবাদে লিখেছি। উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে ভিন্নতার কারণ হচ্ছে, প্রথমোক্ত দল শহীদ বলতে আল্লাহর পথে নিহতদের বুঝেছেন। তারা এও দেখছেন যে, প্রত্যেক মু'মিন আল্লাহর পথে নিহত হয় না। তাই তারা وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ কথাটিকে একটি পূর্ণাংগ বাক্য ধরে নিয়েছেন। কিন্তু শেষোক্ত দলটি 'শহীদ'কে আল্লাহর পথে নিহত অর্থে গ্রহণ করেননি, বরং সত্যের সাক্ষদাতা অর্থে গ্রহণ করেছেন। এ বিচারে প্রত্যেক নিষ্ঠাবান মু'মিনই শহীদ হিসেবে গণ্য। আমাদের এ দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটিই অগ্রাধিকার লাভের যোগ্য। কুরআন ও হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে :

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا (البقرة : ١٤٣)

"আর এভাবেই আমি তোমাদেরকে একটি মধ্যপন্থী উম্মত বানিয়েছি যেন তোমরা লোকদের জন্য সাক্ষী হতে পার এবং রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হন।" (আল বাকারা ১৪৩)।

هُوَ سَمَّٰكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (الحج : ٧٨)

"আল্লাহ পূর্বেও তোমাদের নাম রেখেছিলেন মুসলমান। এ কুরআনেও (তোমাদের এ নাম-ই রাখা হয়েছে।) যেন রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হন আর তোমরাও মানুষের জন্য সাক্ষী হও।" (আল হজ্জ ৭৮)।

اِعْلَمُوْٓا اَنَّمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَّلَهْوٌ وَّزِيْنَةٌ وَّتَفَاخُرٌۢ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ؕ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهٗ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتَرٰىهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطٰمًا ؕ وَفِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيْدٌ ۙ وَّمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانٌ ؕ وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلَّا مَتَاعُ الْغُرُوْرِ ﴿٢٠﴾ سَابِقُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ ۙ اُعِدَّتْ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ ؕ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢١﴾

৩ রুকূ'

ভালভাবে জেনে রাখো দুনিয়ার এ জীবন, একটা খেলা, হাসি তামাসা, বাহ্যিক চাকচিক্য, তোমাদের পারস্পরিক গৌরব ও অহংকার এবং সন্তান সন্ততি ও অর্থ-সম্পদে পরস্পরকে অতিক্রম করার চেষ্টা ছাড়া আর কিছুই নয়। এর উপমা হচ্ছে, বৃষ্টি হয়ে গেল এবং তার ফলে উৎপন্ন উদ্ভিদরাজি দেখে কৃষক আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলো। তারপর সে ফসল পেকে যায় এবং তোমরা দেখতে পাও যে, তা হলদে বর্ণ ধারণ করে এবং পরে তা ভূষিতে পরিণত হয়। পক্ষান্তরে আখেরাত এমন স্থান যেখানে রয়েছে কঠিন আযাব, আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। পার্থিব জীবন প্রতারণার উপকরণ ছাড়া আর কিছুই নয়।[৩৬] দৌড়াও এবং একে অপরের চেয়ে অগ্রগামী হওয়ার চেষ্টা করো[৩৭] —তোমার রবের মাগফিরাতের দিকে এবং সে জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের মত।[৩৮] তা প্রস্তুত রাখা হয়েছে সে লোকদের জন্য যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ। যাকে ইচ্ছা তিনি তা দান করেন। আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল।

হাদীসে হযরত বারা ইবনে আযেব বর্ণনা করেছেন যে, তিনি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একথা বলতে শুনেছেন যে, مُؤْمِنُوْا اُمَّتِىْ شُهَدَاءُ "আমার উম্মতের মু'মিনগণই শহীদ।" তারপর নবী (সা) সূরা হাদীদের এ আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন (ইবনে জারীর)। ইবনে মারদুইয়া হযরত আবুদ দারদা থেকে এই একই অর্থের একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ

من فر بدينه من ارض مخافة الفتنة على نفسه ودينه كتب عند الله صديقا فاذا مات قبضه الله شهيدا ثم تلا هذه الاية –

"যে ব্যক্তি তার প্রাণ ও দীন বিপন্ন হবে ও কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হবে এ আশংকায় কোন দেশ বা ভূ–খণ্ড ছেড়ে চলে যায় তাকে আল্লাহর কাছে 'সিদ্দীক' বলে লেখা হয়। আর সে যখন মারা যায় তখন আল্লাহ শহীদ হিসেবে তার রূহ কবজ করেন। একথা বলার পর নবী (সা) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন (শাহাদাতের এই অর্থ বিশদভাবে বুঝার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, সূরা বাকারা, টীকা ১৪৪, আন নিসা, টীকা ৯৯, আল আহযাব, টীকা ৮২)।

৩৫. অর্থাৎ তাদের মধ্য থেকে যে যে মর্যাদার পুরস্কার ও যে মর্যাদার 'নূরের' উপযুক্ত হবে সে তা পাবে। তারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পুরস্কার ও 'নূর' লাভ করবে। তাদের প্রাপ্য অংশ এখন থেকেই তাদের জন্য সংরক্ষিত আছে।

৩৬. এ বিষয়টি পুরোপুরি বুঝার জন্য কুরআন মজীদের নিম্নবর্ণিত স্থানগুলোর প্রতি লক্ষ রাখতে হবে ঃ সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৪–১৫, ইউনুস, আয়াত ২৪, ২৫, ইবরাহীম ১৮, আল কাহাফ, ৪৫–৪৬, আন নূর ৩৯। এসব স্থানে মানুষের মনে যে বিষয়টি বদ্ধমূল করার চেষ্টা করা হয়েছে তা হচ্ছে, এ পৃথিবীর জীবন প্রকৃতপক্ষে একটি ক্ষণস্থায়ী জীবন। এখানকার বসন্তকাল যেমন অস্থায়ী তেমনি শরতকালও অস্থায়ী। এখানে চিত্তহরণের বহু উপকরণ আছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা এত নিকৃষ্ট এবং এত নগণ্য যে, নিজেদের নির্বুদ্ধিতার কারণে মানুষ ঐগুলোকে বড় বড় জিনিস বলে মনে করে এবং প্রতারিত হয়ে মনে করে ঐগুলো লাভ করতে পারাই যেন চরম সফলতা অর্জন করা। অথচ যেসব বড় বড় স্বার্থ এবং আনন্দের উপকরণই এখানে লাভ করা সম্ভব তা নিতান্তই নগণ্য এবং কেবল কয়েক বছরের ধার করা জীবন পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। তার অবস্থাও আবার এমন যে, ভাগ্যের একটি বিপর্যয় ও বিড়ম্বনা এ পৃথিবীতেই ওগুলোকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। পক্ষান্তরে আখেরাতের জীবন এক বিশাল ও স্থায়ী জীবন। সেখানকার কল্যাণও বিশাল ও স্থায়ী এবং ক্ষতিও বিশাল এবং স্থায়ী। সেখানে কেউ যদি আল্লাহর মাগফিরাত ও সন্তুষ্টি পেয়ে যায় তাহলে সে চিরদিনের জন্য এমন নিয়ামত লাভ করলো যার সামনে গোটা পৃথিবীর ধন–সম্পদ এবং রাজত্বও অতিশয় নগণ্য ও হীন। আর সেখানে যে আল্লাহর আযাবে গ্রেফতার হলো, সে যদি দুনিয়াতে এমন কিছুও পেয়ে যায় যা সে নিজে বড় মনে করতো। তবুও সে বুঝতে পারবে যে, সে ভয়ানক ক্ষতিকর কারবার করেছে।

৩৭. মূল আয়াতে سابقوا শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। শুধু দৌড়াও কথা দ্বারা এর সঠিক অর্থ প্রকাশ পায় না। مسابقت শব্দের অর্থ প্রতিযোগিতায় অন্যদের পেছনে ফেলে আগে চলে যাওয়ার চেষ্টা করা অর্থাৎ তোমরা পৃথিবীর ধন–সম্পদ, আনন্দ ও সুখ এবং কল্যাণসমূহ হস্তগত করার জন্য যে চেষ্টা করেছো তা পরিত্যাগ করে এ জিনিসকে লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে নাও এবং এ দিকে দৌড়িয়ে সফলতা লাভের চেষ্টা করো।

مَآ اَصَابَ مِنْ مُّصِيْبَةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا فِىْٓ اَنْفُسِكُمْ اِلَّا فِىْ كِتٰبٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ نَّبْرَاَهَا ۭ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝ لِّكَيْلَا تَاْسَوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوْا بِمَآ اٰتٰىكُمْ ۭ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرِ ۝ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ وَيَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ ۭ وَمَنْ يَّتَوَلَّ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْغَنِىُّ الْحَمِيْدُ ۝

পৃথিবীতে এবং তোমাদের নিজেদের ওপর যেসব মুসিবত আসে তার একটিও এমন নয় যে, তাকে আমি সৃষ্টি করার পূর্বে[৩৯] একটি গ্রন্থে লিখে রাখিনি।[৪০] এমনটি করা আল্লাহর জন্য খুবই সহজ কাজ।[৪১] (এ সবই এজন্য) যাতে যে ক্ষতিই তোমাদের হয়ে থাকুক তাতে তোমরা মনক্ষুণ্ন না হও। আর আল্লাহ তোমাদের যা দান করেছেন। সেজন্য গর্বিত না হও।[৪২] যারা নিজেরা নিজেদের বড় মনে করে এবং অহংকার করে, নিজেরাও কৃপণতা করে এবং মানুষকেও কৃপণতা করতে উৎসাহ দেয়[৪৩] আল্লাহ তাদের পছন্দ করেন না। এর পরও যদি কেউ মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ অভাবশূন্য ও অতি প্রশংসিত।[৪৪]

৩৮. মূল আয়াতাংশ হচ্ছে عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ । কোন কোন মুফাসসির عرض শব্দটিকে প্রস্থ অর্থে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এখানে এ শব্দটি বিস্তৃতি ও প্রশস্ততা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আরবী ভাষায় عرض শব্দটি দৈর্ঘ্যের বিপরীত প্রস্থ বুঝাতেই শুধু ব্যবহৃত হয় না, বরং শুধুমাত্র বিস্তৃতি বুঝাতেও ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ কুরআন মজীদের অন্য একস্থানে বলা হয়েছে فَذُوْدُعَاءٍ عَرِيْضٍ "মানুষ তখন লম্বা চওড়া দোয়া করতে শুরু করে (হা মীম, আস সাজদা ৫১)। এক্ষেত্রে একথাও বুঝে নিতে হবে যে, একথা দ্বারা জান্নাতের আয়তন বুঝাতে চাওয়া হয়নি, বরং তার বিস্তৃতির ধারণা দিতে চাওয়া হয়েছে। এখানে বলা হয়েছে, তার বিস্তৃতি আসমান ও যমীনের মত ব্যাপক। আর সূরা আলে ইমরানে বলা হয়েছে ঃ

سَارِعُوْٓا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ (اية ١٣٣)

"দৌড়াও তোমাদের রবের মাগফিরাত ও সেই জান্নাতের দিকে যার বিস্তৃতি গোটা বিশ্ব–জাহান জুড়ে, যা মুত্তাকীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে।" (আয়াত ১৩৩)।

এ দু'টি আয়াত এক সাথে পড়লে মাথায় এমন একটা ধারণা জন্মে যে, একজন মানুষ জান্নাতে যে বাগান এবং প্রাসাদসমূহ লাভ করবে তার অবস্থান স্থল কেবল তার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গোটা বিশ্ব–জাহান হবে তার বিচরণ ক্ষেত্র। সে কোথাও সীমাবদ্ধ থাকবে না। সেখানে তার অবস্থা এ পৃথিবীর মত হবে না যে, চাঁদের মত সর্বাধিক নিকটবর্তী উপগ্রহ পর্যন্ত পৌছতেও তাকে বছরের পর বছর ধরে একের পর এক বহু কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে এবং এ সামান্য পথ ভ্রমণের কষ্ট দূর করার জন্য অজস্র সম্পদ ব্যয় করতে হয়েছে। কিন্তু সেখানে গোটা বিশ্ব–জাহান তার জন্য উন্মুক্ত হবে, যা চাইবে নিজের জায়গায় বসে বসেই দেখতে পারবে এবং যেখানে ইচ্ছা বিনা বাধায় যেতে পারবে।

৩৯. 'তাকে' কথাটি দ্বারা মুসিবতের প্রতিও ইংগিত করা হতে পারে, পৃথিবীর প্রতিও ইংগিত করা হতে পারে, নিজেদের কথাটির প্রতিও ইংগিত করা হতে পারে এবং বাক্যের ধারা অনুসারে সৃষ্টিকূলের প্রতিও ইংগিত করা হতে পারে।

৪০. কিতাব অর্থ ভাগ্য লিপি।

৪১. অর্থাৎ নিজের সৃষ্টিকূলের মধ্যে প্রত্যেকের ভাগ্য আগেই লিখে দেয়া আল্লাহর জন্য কোন কঠিন কাজ নয়।

৪২. বর্ণনার এই ধারাবাহিকতার মধ্যে যে উদ্দেশ্যে এ কথাটি বলা হয়েছে তা বুঝার জন্য এ সূরা নাযিল হওয়ার সময় ঈমানদারগণ যে পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছিলেন তা সামনে রাখা দরকার। প্রতি মুহূর্তে শত্রুদের হামলার আশংকা একের পর এক যুদ্ধ বিগ্রহ, সর্বদা অবরোধ পরিস্থিতি, কাফেরদের অর্থনৈতিক অবরোধের কারণে চরম দুরবস্থা, গোটা আরবের সর্বত্র ইসলাম গ্রহণকারীদের ওপর কাফেরদের জুলুম নির্যাতন এ পরিস্থিতির মধ্যে তখনকার মুসলমানদের সময় অতিবাহিত হচ্ছিলো। কাফেররা একে মুসলমানদের লাঞ্ছিত ও অভিশপ্ত হওয়ার প্রমাণ মনে করতো। এ পরিস্থিতিকে মুনাফিকরা তাদের সন্দেহের সমর্থনে ব্যবহার করতো। আর একনিষ্ঠ মু'মিনগণ যদিও অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে এ পরিস্থিতির মোকাবিলা করছিলেন। তবুও বিপদ মসিবতের আধিক্য কোন কোন সময় তাদের জন্যও চরম ধৈর্য পরীক্ষার কারণ হয়ে দাঁড়াতো। এ কারণে মুসলমানদের সান্ত্বনা দেয়ার জন্য বলা হচ্ছে, তোমাদের ওপর কোন বিপদই তোমাদের রবের অবগতির বাইরে নাযিল হয়নি। যা কিছু হচ্ছে তা সবই আল্লাহর পূর্ব পরিকল্পিত সিদ্ধান্ত মোতাবেক হচ্ছে–যা তাঁর দফতরে লিখিত আছে। তোমাদের প্রশিক্ষণের জন্যই এসব সঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে তোমাদেরকে অগ্রসর করানো হচ্ছে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের দিয়ে যে বিরাট কাজ আজ্ঞাম দিতে চান তার জন্য এ প্রশিক্ষণ অত্যন্ত জরুরী। এসব পরীক্ষা ছাড়াই যদি তোমাদেরকে সফলতার স্বর্ণ দুয়ারে পৌছিয়ে দেয়া হয় তাহলে তোমাদের চরিত্রে এমন সব দুর্বলতা থেকে যাবে যার কারণে তোমরা না পারবে মর্যাদা ও ক্ষমতার গুরুপাক খাদ্য হজম করতে, না পারবে বাতিলের প্রলয়ংকরী তুফানের চরম আঘাত সহ্য করতে।

৪৩. সে সময় মুসলিম সমাজের মুনাফিকদের যে চরিত্র সবারই চোখে পড়ছিলো এখানে সেদিকে ইংগিত করা হয়েছে। ঈমানের বাহ্যিক স্বীকারোক্তি অনুসারে মুনাফিক ও খাঁটি মুসলমানদের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। কিন্তু নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা না থাকার

আমি আমার রসূলদের সুস্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এবং হিদায়াত দিয়ে পাঠিয়েছি। তাদের সাথে কিতাব ও মিযান নাযিল করেছি যাতে মানুষ ইনসাফের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।[৪৫] আর লোহা নাযিল করেছি যার মধ্যে বিরাট শক্তি এবং মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ রয়েছে।[৪৬] এটা করা হয়েছে এজন্য যে, আল্লাহ জেনে নিতে চান কে তাঁকে না দেখেই তাঁকে ও তাঁর রসূলদেরকে সাহায্য করে। নিশ্চিতভাবেই আল্লাহ অত্যন্ত শক্তিধর ও মহাপরাক্রমশালী।[৪৭]

কারণে খাঁটি ঈমানদারদের যে প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছিলো তারা তাতে শামিল হয়নি। তাই তাদের অবস্থা ছিল এই যে, আরবের অতি সাধারণ একটা শহরে যে নাম মাত্র স্বচ্ছলতা ও পৌরহিত্য তারা লাভ করেছিলো তাতেই তারা যেন গর্বে স্ফীত হয়ে উঠছিলো এবং ফেটে পড়ার উপক্রম হয়েছিলো। তাদের মনের সংকীর্ণতা এমন পর্যায়ের ছিল যে, তারা যে আল্লাহর ওপর ঈমান আনার, যে রসূলের অনুসারী হওয়ার এবং যে দীন মানার দাবী করতো, তার জন্য নিজেরা একটি পয়সাও ব্যয় করবে কি, অন্য দাতাদেরও একথা বলে ব্যয় করা থেকে বিরত রাখতো যে, তোমরা নিজের অর্থ এভাবে অপচয় করছো কেন? স্পষ্ট কথা, দুঃখ কষ্টের উত্তপ্ত অগ্নি কুণ্ডে যদি জ্বালানো না হতো, তাহলে এই কৃত্রিম পদার্থগুলো—যা আল্লাহর কোন কাজে লাগার মত ছিল না—খাঁটি সোনা থেকে পৃথক করা যেতো না। আর তাকে আলাদা করা ছাড়া দুর্বল ও খাঁটি মুসলমানদের এই সংমিশ্রিত সমাবেশকে দুনিয়ার নেতৃত্বের গুরুত্বপূর্ণ মহান পদটি অর্পণ করা যেতো না, যার বহুবিধ মহতী কল্যাণ খিলাফতে রাশেদার যুগে দুনিয়া অবলোকন করেছিলো।

৪৪. অর্থাৎ উপদেশবাণী শোনার পরও যদি কোন ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর দীনের জন্য আন্তরিকতা, আনুগত্য এবং ত্যাগ ও কুরবানীর পন্থা অবলম্বন না করে এবং নিজের বক্রতা আঁকড়ে ধরে থাকতে চায় যা আল্লাহ অপছন্দ করেন—তাহলে আল্লাহর তাতে কোন পরোয়া নেই। তিনি অভাব শূন্য, এসব লোকের কাছে তাঁর কোন প্রয়োজন আটকে নেই, আর তিনি অতিশয় প্রশংসিত, তাঁর কাছে উত্তম গুণাবলীর অধিকারী লোকেরাই গ্রহণযোগ্য হতে পারে। দুষ্কর্মশীল লোকেরা তাঁর কৃপা দৃষ্টিলাভের উপযুক্ত হতে পারে না।

৪৫. এ সংক্ষিপ্ত আয়াতাংশে নবী–রসূলদের মিশনের পুরা সার সংক্ষেপ বর্ণনা করা হয়েছে, যা ভালভাবে বুঝে নিতে হবে। এতে বলা হয়েছে, আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে পৃথিবীতে যত রসূল এসেছেন, তারা সবাই তিনটি বিষয় নিয়ে এসেছিলেন ঃ

এক ঃ بينات অর্থাৎ স্পষ্ট নিদর্শনাবলী যা থেকে স্পষ্টরূপ প্রতিভাত হচ্ছিলো যে, তাঁরা সত্যিই আল্লাহর রসূল। তাঁরা নিজেরা রসূল সেজে বসেননি। তাঁরা যা সত্য বলে পেশ করছেন তা সত্যিই সত্য আর যে জিনিসকে বাতিল বলে উল্লেখ করেন তা যে সত্যিই বাতিল তা প্রমাণ করার জন্য তাঁদের পেশকৃত উজ্জ্বল নিদর্শনসমূহই যথেষ্ট। সুস্পষ্ট হিদায়াতসমূহ, যাতে কোন সন্দেহ–সংশয় ছাড়া বলে দেয়া হয়েছিল—আকায়েদ, আখলাক, ইবাদাত–বন্দেগী এবং আদান–প্রদানের ক্ষেত্রে মানুষের জন্য সঠিক পথ কি–যা তারা অনুসরণ করবে এবং ভ্রান্ত পথসমূহ কি যা তারা বর্জন করবে।

দুই ঃ কিতাব, মানুষের শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সব দিক নির্দেশনা এতে বর্তমান যাতে মানুষ পথ নির্দেশনার জন্য তার স্মরণাপন্ন হতে পারে।

তিন ঃ মিযান, অর্থাৎ হক ও বাতিলের মানদণ্ড যা দাঁড়ি পাল্লার মতই সঠিকভাবে ওজন করে বলে দিবে চিন্তা ও ধ্যান–ধারণা, নৈতিকতা ও পারস্পরিক লেনদেনে প্রাচুর্য ও অপ্রতুলতার বিভিন্ন চরম পন্থার মধ্যে ইনসাফ ও ন্যায় বিচার কোন্‌টি।

নবী–রসূলদেরকে এ তিনটি জিনিস দিয়ে যে উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে তা হচ্ছে পৃথিবীতে মানুষের আচরণ এবং মানব জীবনের বিধি–বিধান ব্যক্তিগত ও সামগ্রিকভাবেও যেন ন্যায় বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। একদিকে প্রতিটি মানুষ তার আল্লাহর অধিকার, নিজের অধিকার এবং আল্লাহর সেসব বান্দাদের অধিকার সঠিকভাবে জানবে এবং ইনসাফের সাথে আদায় করবে যার সাথে কোন না কোনভাবে তাকে জড়িত হতে হয়। অপর দিকে সামাজিক জীবনের বিধি–বিধান এমন নীতিমালার ওপর নির্মাণ করতে হবে যাতে সমাজে কোন প্রকার জুলুম অবশিষ্ট না থাকে। সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতিটি দিক ভারসাম্যহীনতা থেকে রক্ষা পায়, সমাজ জীবনের প্রতিটি বিভাগে সঠিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠিত হয় এবং সমাজের সবাই যেন ইনসাফ মত যার যার অধিকার লাভ করে এবং নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করতে পারে। অন্য কথায় ব্যক্তিগত ও সামাজিক ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠাই ছিল নবী–রসূলদের প্রেরণের উদ্দেশ্য। তারা প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিগত জীবনেও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে উদগ্রীব ছিলেন, যাতে তার মন–মগজ, তার চরিত্র ও কর্ম এবং তার ব্যবহারে ভারসাম্য সৃষ্টি হয়। তারা গোটা মানব সমাজেও ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী ছিলেন যাতে ব্যক্তি এবং ব্যষ্টি উভয়েই পরস্পরের আত্মিক, নৈতিক ও বৈষয়িক উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক ও সাংঘর্ষিক হওয়ার পরিবর্তে সহযোগী ও সাহায্যকারী হয়।

৪৬. লোহা নাযিল করার অর্থ মাটির অভ্যন্তরে লোহা সৃষ্টি করা। যেমন কুরআন মজীদের অন্য এক জায়গায় বলা হয়েছে। وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْاَنْعَامِ ثَمٰنِيَةَ اَزْوَاجٍ

তিনি তোমাদের জন্য গবাদী পশুর আটটি জোড়া নাযিল করেছেন (আয যুমার ৬)। পৃথিবীতে যা কিছু পাওয়া যায় তা যেহেতু আপনা থেকেই সৃষ্টি হয়নি, আল্লাহর নির্দেশে এখানে এসেছে। সুতরাং কুরআন মজীদে তা সৃষ্টি করাকে নাযিল করা বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

নবী-রসূলদের মিশন কি তা বর্ণনা করার পর পরই আমি লোহা নাযিল করেছি, তার মধ্যে বিপুল শক্তি ও মানুষের জন্য বহুবিধ কল্যাণ রয়েছে। বলায় আপনা থেকেই এ বিষয়ে ইংগিত পাওয়া যায় যে, এখানে লোহা অর্থে রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিকে বুঝানো হয়েছে। বাক্যের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য শুধু একটা পরিকল্পনা পেশ করার উদ্দেশ্যে রসূলদের পাঠান নাই। কার্যত তা প্রতিষ্ঠিত করার প্রচেষ্টা চালানো ও সে উদ্দেশ্যে শক্তি সঞ্চয় করাও তাদের মিশনের অন্তরভুক্ত ছিল। যাতে এ প্রচেষ্টার ধ্বংস সাধনকারীদের শাস্তি দেয়া যায় এবং এর বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টিকারীদের শক্তি নির্মূল করা যায়।

৪৭. অর্থাৎ আল্লাহ দুর্বল, তিনি আপন শক্তিতে এ কাজ করতে সক্ষম নন, তাই তার সাহায্য প্রয়োজন, ব্যাপারটা তা নয়। তিনি মানুষকে পরীক্ষার জন্য এ কর্ম পন্থা গ্রহণ করেছেন। এ পরীক্ষার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েই মানুষ তার উন্নতি ও সফলতার পথে এগিয়ে যেতে পারে। আল্লাহ তা'আলার সব সময় এ ক্ষমতা আছে যে, যখন ইচ্ছা তিনি তাঁর একটি ইংগিতেই সমস্ত কাফেরকে পরাস্ত করে তাঁদের ওপর তাঁর রসূলদের আধিপত্য দান করতে পারেন। কিন্তু তাতে রসূলদের ওপর ঈমান আনয়নকারীদের কি কৃতিত্ব থাকবে যে, তারা পুরস্কারের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে? তাই আল্লাহ তা'আলা এ কাজকে তাঁর বিজয়ী শক্তির সাহায্যে আঞ্জাম দেয়ার পরিবর্তে এ কর্মপন্থা গ্রহণ করেছেন যে, তাঁর রসূলদেরকে 'বাইয়েনাত' স্পষ্ট নিদর্শনাদী, কিতাব ও মিযান দিয়ে মানুষের কাছে প্রেরণ করেছেন। তাদেরকে আদেশ দিয়েছেন যে, তারা যেন মানুষের সামনে ন্যায়নীতির বিধান পেশ করেন এবং জুলুম-নির্যাতন ও বে-ইনসাফী থেকে বিরত থাকার জন্য আহবান জানান। মানুষকে এ ব্যাপারে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন যে, যার ইচ্ছা রসূলদের দাওয়াত কবুল করবে এবং যার ইচ্ছা প্রত্যাখ্যান করবে। যারা কবুল করলো তাদের আহবান জানিয়েছেন; এসো, এই ন্যায়বিচারপূর্ণ জীবন বিধান প্রতিষ্ঠা করতে আমার ও আমার রসূলদের সহযোগী হও এবং যারা জুলুম ও নির্যাতনমূলক বিধান টিকিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর, তাদের বিরুদ্ধে প্রাণপণ সংগ্রাম করো। আল্লাহ তা'আলা এভাবে দেখতে চান, মানুষের মধ্যে কারা ইনসাফ ও ন্যায় বিচারের বাণী প্রত্যাখ্যান করে, আর কারা ইনসাফ ও ন্যায়বিচারের মোকাবিলায় বে-ইনসাফী কায়েম রাখার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। ইনসাফের বাণী গ্রহণ করার পর তার সাহায্য-সহযোগিতা ও সে উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করা থেকে পালিয়ে বেড়ায়। আর কারা আল্লাহকে না দেখেও তাঁরই কারণে এই ন্যায় ও সত্যকে বিজয়ী করার জন্য প্রাণ-সম্পদও বাজি রাখছে। যারা এ পরীক্ষায় সফল হবে, ভবিষ্যতে তাদের জন্যই বহুবিধ উন্নতির পথ খুলে যাবে।

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَٰهِيمَ وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِمَا ٱلنُّبُوَّةَ وَٱلْكِتَٰبَ فَمِنْهُم مُّهْتَدٍ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٢٦﴾ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰٓ ءَاثَٰرِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ٱبْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَٰهُ ٱلْإِنجِيلَ ۙ وَجَعَلْنَا فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً ۚ وَرَهْبَانِيَّةً ٱبْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَٰهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ٱبْتِغَآءَ رِضْوَٰنِ ٱللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۖ فَـَٔاتَيْنَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۖ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَٰسِقُونَ ﴿٢٧﴾

৪ রুকূ'

আমি[৪৮] নূহকে ও ইবরাহীমকে পাঠিয়েছিলাম এবং তাদের উভয়ের বংশধরের মধ্যে নবুওয়াত ও কিতাবের প্রচলন করেছিলাম[৪৯]। তারপর তাদের বংশধরদের কেউ কেউ হিদায়াত গ্রহণ করেছিল এবং অনেকেই ফাসেক হয়ে গিয়েছিল[৫০]। তাদের পর আমি একের পর এক আমার রসূলগণকে পাঠিয়েছি। তাদের সবার শেষে মার্‌য়ামের পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি, তাকে ইনজীল দিয়েছি এবং তার অনুসারীদের মনে দয়া ও করুণার সৃষ্টি করেছি[৫১]। আর বৈরাগ্যবাদ তো তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করে নিয়েছে[৫২]। আমি ওটা তাদের ওপর চাপিয়ে দেইনি। আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তারা নিজেরাই এ বিদয়াত বানিয়ে নিয়েছে[৫৩]। তারপর সেটি যেভাবে মেনে চলা দরকার, সেভাবে মেনেও চলেনি[৫৪]। তাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল, তাদের প্রতিদান আমি দিয়েছি। তবে তাদের অধিকাংশই পাপী।

৪৮. মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পূর্বে যে রসূলগণ 'বাইয়েনাত' কিতাব ও মিযান নিয়ে এসেছিলেন তাদের অনুসারীদের মধ্যে কি বিকৃতি সৃষ্টি হয়েছিলো এখানে তাই বলা হচ্ছে।

৪৯. অর্থাৎ যে রসূলই কিতাব নিয়ে এসেছিলেন তারা হযরত নূহ (আ) ও তাঁর পরবর্তীগণ হযরত ইবরাহীমের বংশধর ছিলেন।

৫০. অর্থাৎ অবাধ্য হয়ে গিয়েছিলো এবং আল্লাহর আনুগত্যের গণ্ডি থেকে বেরিয়ে গিয়েছিলো।

৫১. মূল আয়াতে ব্যবহৃত শব্দ হচ্ছে رافت ও رحمت। এ দু'টি শব্দ প্রায় সমার্থক কিন্তু দু'টি শব্দই যখন একসাথে বলা হয় তখন رافت এর অর্থ হয় মনের নম্র ও সদয়

অনুভূতি যা কাউকে দুঃখ কষ্ট ও বিপদের মধ্যে দেখে কারো মনে সৃষ্টি হয়। আর رحمت অর্থ সেই আবেগ যার কারণে সে তাকে সাহায্য করতে চেষ্টা করে। হযরত ঈসা আলাইহিস সালাম যেহেতু অত্যন্ত দয়াদ্র হৃদয় এবং আল্লাহর সৃষ্টির জন্য অত্যন্ত দয়ালু ও স্নেহ প্রবন ছিলেন। তাই তাঁর অনুসারীদের মধ্যেও তাঁর চরিত্রের এ প্রভাব সৃষ্টি হয়েছিলো। যার কারণে আল্লাহর বান্দাদের জন্য তাদের মনে দয়া সৃষ্টি হতো এবং সহানুভূতির সাথে তাদের সেবা করতো।

৫২. এ শব্দটির উচ্চারণ 'রাহবানিয়াত' ও 'রুহ্‌বানিয়াত' দুই রকমই করা হয়ে থাকে। এর শব্দমূল رهب যার অর্থ হচ্ছে ভয়। রাহবানিয়াত অর্থ ভীত হওয়ার পথ ও পন্থা এবং রুহ্‌বানিয়াত অর্থ ভীতদের পথ ও পন্থা। এর পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে ভয়ের কারণে কোন ব্যক্তির (কারো জুলুম নির্যাতনের ভয়ে হোক বা দুনিয়ার ফিতনার ভয়ে হোক কিংবা নিজের প্রবৃত্তির দুর্বলতার ভয়ে হোক) দুনিয়াত্যাগী হয়ে যাওয়া এবং দুনিয়ার জীবন থেকে পালিয়ে বন-জংগলে বা পাহাড়ে আশ্রয় নেয়া কিংবা নির্জন নিভৃতে যেয়ে বসা।

৫৩. মূল আয়াতে ব্যবহৃত বাক্যাংশ হচ্ছে اِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ । এর দু'টি অর্থ হতে পারে। একটি অর্থ হচ্ছে আমি তাদের জন্য রাহ্‌বানিয়াত বা বৈরাগ্যবাদ ফরয করেছিলাম না। বরং আমি তাদের ওপর যা ফরয করেছিলাম তা ছিলো এই যে, তারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করবে। আর অপর অর্থটি হচ্ছে, এ বৈরাগ্যবাদ আমার ফরযকৃত ছিল না। বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্তে তারা তা নিজেরাই নিজেদের ওপর ফরয করে নিয়েছিলো। দু'টি অবস্থাতেই এ আয়াতটি একথা স্পষ্ট করে তুলে ধরছে যে, বৈরাগ্যবাদ একটি অনৈসলামিক রীতি। এটি কখনো দীনে ইসলামের অংগীভূত ছিল না। এ প্রসংগেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, لاَ رَهْبَانِيَّةَ فِى الاِسْلاَمِ "ইসলামে কোন বৈরাগ্যবাদ নেই" (মুসনাদে আহমদ)। অন্য একটি হাদীসে নবী (সা) বলেছেন ঃ رَهْبَانِيَّةُ هٰذِهِ الاُمَّةِ الْجِهَادُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ "আল্লাহর পথে জিহাদই হচ্ছে এ উম্মতের বৈরাগ্যবাদ।" (মুসনাদে আহমদ, মুসনাদে আবু ইয়া'লা) অর্থাৎ দুনিয়া বর্জন করা এ উম্মতের আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ নয়, বরং এর আধ্যাত্মিক উন্নতির পথ হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ। আর এ উম্মত ফিতনার ভয়ে ভীত হয়ে বন-জংগল ও পাহাড়-পর্বতে পালিয়ে যায় না বরং আল্লাহর পথে জিহাদের মাধ্যমে তার মোকাবিলা করে। বুখারী ও মুসলিম উভয়ের বর্ণিত হাদীসে উদ্ধৃত হয়েছে যে, সাহাবীদের একজন বললেন ঃ আমি সব সময় সারা রাত নামায পড়বো। দ্বিতীয়জন বললো ঃ আমি সব সময় রোযা রাখবো, কখনো বিরতি দেব না। তৃতীয় জন বললো, আমি কখনো বিয়ে করবো না এবং নারীর সাথে কোন সম্পর্ক রাখবো না। তাদের এসব কথা শুনতে পেয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ

اما والله انى لاخشاكم لله واتقاكم له لكنى اصوم وافطر واصلى و ارقد واتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس منى -

"আল্লাহর শপথ, আমি আল্লাহকে তোমাদের চেয়ে বেশী ভয় করি এবং তাকওয়া অবলম্বন করে চলি। আমার নীতি হলো, আমি রোযা রাখি এবং রোযা না রেখেও

থাকি, রাতের বেলা নামাযও পড়ি আবার নিদ্রাও যাই এবং নারীদের বিয়েও করি। যে আমার নীতি পছন্দ করে না তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।"

হযরত আনাস বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন ঃ

لَا تُشَدِّدُوا عَلَى اَنْفُسِكُمْ فَيُشَدِّدُ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاِنَّ قَوْمًا شَدَّدُوا فَشَدَّدَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ فَتِلْكَ بَقَايَا هُمْ فِى الصَّوَامِعِ وَالدِّيَارِ –

"নিজের প্রতি কঠোর হয়ো না তাহলে আল্লাহও তোমাদের প্রতি কঠোর হবেন। একটি কওম কঠোরতা অবলম্বন করলে আল্লাহও তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করলেন। দেখে নাও, তারা এবং তাদের অবশিষ্টরা গীর্জা ও উপাসনালয়ে বর্তমান।"

(আবু দাউদ)।

৫৪. অর্থাৎ তারা দ্বিবিধ ভ্রান্তিতে ডুবে আছে। একটি ভ্রান্তি হচ্ছে তারা নিজেদের ওপর এমন সব বাধ্য বাধকতা আরোপ করে নিয়েছিল যা করতে আল্লাহ কোন নির্দেশ দেননি। দ্বিতীয় ভ্রান্তি হচ্ছে নিজেদের ধারণা মতে যেসব বাধ্য বাধকতাকে তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উপায় বলে মনে করে নিজেদের ওপর আরোপ করে নিয়েছিলো তার হক আদায় করেনি এবং এমন সব আচরণ করেছে যার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পরিবর্তে তার গযব খরিদ করে নিয়েছে।

এ বিষয়টিকে ভালভাবে বুঝতে হলে খৃস্টীয় বৈরাগ্যবাদের ইতিহাসের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করে নেয়া দরকার।

হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের পর খৃস্টান গীর্জাসমূহ দুই'শ বছর পর্যন্ত বৈরাগ্যবাদের সাথে অপরিচিত ছিল। কিন্তু শুরু থেকেই খৃস্টান ধর্মে এর বিষাক্ত জীবাণু বিদ্যমান ছিল এবং যেসব ধ্যান–ধারণা এর জন্ম দেয় তাও এর মধ্যে বর্তমান ছিল। সংসার বর্জন ও নিসঙ্গ জীবন যাপনকে নৈতিক আদর্শ মনে করা এবং বিয়ে শাদী ও পার্থিব কায় কারবারমূলক জীবনের তুলনায় দরবেশী জীবন ধারাকে অধিক উন্নত ও ভাল মনে করাই বৈরাগ্যবাদের ভিত্তি। খৃস্টান ধর্মে এ দু'টি জিনিস শুরু থেকেই ছিল। বিশেষ করে কৌমার্য বা নিসঙ্গ জীবন যাপনকে পবিত্রতার সম পর্যায়ের মনে করার কারণে গীর্জায় ধর্মীয় কাজ কর্ম সম্পাদনকারী ব্যক্তিদের জন্য বিয়ে করা, তাদের সন্তানাদি থাকা এবং সাংসারিক ঝামেলায় জড়িয়ে পড়াকে অপছন্দনীয় মনে করা হতো। তৃতীয় শতাব্দীর আগমনের পূর্বেই এটি একটি ফিতনার রূপ ধারণ করে এবং বৈরাগ্যবাদ মহামারীর আকারে খৃস্ট ধর্মের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। ঐতিহাসিকভাবে এর তিনটি বড় কারণ ছিল।

একটি কারণ হচ্ছে, প্রাচীন মুশরিক সমাজে যৌনতা, চরিত্রহীনতা ও দুনিয়া পূজা যে চরম আকারে বিস্তার লাভ করেছিল তা উচ্ছেদ করার জন্য খৃস্টান পাদ্রীরা মধ্যপন্থা অবলম্বনের পরিবর্তে চরম পন্থার নীতি গ্রহণ করে। তারা সতীত্ব ও পবিত্রতার ওপর এমন গুরুত্ব আরোপ করে যে, বিয়ের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের সম্পর্ক হলেও তা মূলত অপবিত্র বলে গণ্য হয়। তারা দুনিয়া পূজার বিরুদ্ধে এমন কঠোরতা অবলম্বন করে যে, একজন দীনদার ও ধর্মভীরু লোকের পক্ষে কোন প্রকার সম্পদের মালিক হওয়া গোনাহর

কাজ বলে গণ্য হয় এবং একেবারে নিসম্বল ও সব দিক দিয়ে দুনিয়াত্যাগী হওয়াটাই ব্যক্তির জন্য নৈতিক মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। অনুরূপ মুশরিক সমাজের ভোগবাদী নীতির প্রতিবাদে তারা এমন চরম পন্থার আশ্রয় নেয় যে, ভোগ সুখ বর্জন, যৌন বাসনাকে হত্যা করা এবং প্রবৃত্তির মূলোৎপাটন করাই নৈতিকতার উদ্দেশ্য হয়ে যায় এবং নানা রকম সাধনা দ্বারা শরীরকে কষ্ট দেয়াই ব্যক্তির আধ্যাত্মিক পূর্ণতা ও তার প্রমাণ হিসেবে মনে করা হতে থাকে।

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, খৃষ্ট ধর্ম যখন সফলতার যুগে প্রবেশ করে এবং জনগণের মধ্যে বিস্তার লাভ করতে থাকে, গীর্জা তখন তার ধর্মের প্রসার ও প্রচারের আকাংখায় জনপ্রিয় প্রতিটি খারাপ জিনিসকেও তার গণ্ডিভুক্ত করতে থাকে। ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের পূজা প্রাচীন উপাস্যদের স্থান দখল করে নেয়। হোরাস (HORUS) ও আইসিস (ISIS) এর মূর্তির বদলে যীশু ও মারয়ামের মূর্তির পূজা শুরু হয়। স্যাটারনেলিয়া (Saturnalia) এর পরিবর্তে বড় দিনের উৎসব পালন শুরু হয়। খৃষ্টান দরবেশগণ প্রাচীন যুগের তাবিজ ও বালা পরা, আমল–তদবীর করা, শুভ–অশুভ লক্ষণ নির্ণয় ও অদৃশ্য বলা, জিন ভূত তাড়ানোর আমল সব কিছুই করতে শুরু করে। অনুরূপ যে ব্যক্তি নোংরা, অপরিষ্কার ও উলঙ্গ থাকতো এবং কোন কুঠরি বা গুহায় বসবাস করতো জনগণ যেহেতু তাকে ধার্মিক মনে করতো তাই খৃষ্টান গীর্জাসমূহ এটাই আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী বা ওলী হওয়ার একমাত্র পথ বলে ধরে নেয়া হয়। এ ধরনের লোকদের 'কারামত' বা অলৌকিক ক্রিয়া কাণ্ডের কাহিনী দ্বারা খৃষ্টানদের মধ্যে তাযকিরাতুল আওলিয়া ধরনের প্রচুর বই–পুস্তক বহুল প্রচারিত হয়।

তৃতীয় কারণ হচ্ছে ধর্মের সীমা নির্ণয়ের জন্য খৃষ্টানদের কাছে কোন বিস্তারিত শরীয়াত এবং কোন সুস্পষ্ট 'সুন্নাত' বর্তমান ছিল না। মূসার শরীয়াতকে তারা পরিত্যাগ করেছিল, কিন্তু এককভাবে শুধু ইনজীলের মধ্যে কোন পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনামা ছিল না। এ কারণে খৃষ্টান পণ্ডিতগণ কিছুটা বাইরের দর্শন ও রীতিনীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এবং কিছুটা নিজেদের মানসিক প্রবণতার কারণে ধর্মের মধ্যে নানা ধরনের বিদআতকে অন্তরভুক্ত করতে থাকে। বৈরাগ্যবাদ ওই সব বিদআতেরই একটি। খৃষ্টান ধর্মের পণ্ডিত পুরোহিত ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ এ ধর্মের দর্শন ও এর কর্মপদ্ধতি বৌদ্ধ ধর্মের ভিক্ষু, হিন্দু যোগী–সন্নাসী, প্রাচীন মিসরীয় সংসার ত্যাগী (Anchorits) সন্নাসী, পারস্যের মানেবীয়া এবং প্লেটো ও প্লেটোনিক দর্শনের অনুসারীদের থেকে গ্রহণ করেছে এবং একেই আত্মার পরিশুদ্ধির পন্থা, আধ্যাত্মিক উন্নতির উপায় ও আল্লাহর নৈকট্যলাভের অসীলা হিসেবে গণ্য করেছে। যারা এ ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত হয়েছিল তারা কোন সাধারণ লোক ছিল না। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দী (অর্থাৎ কুরআন নাযিল হওয়ার সময়) পর্যন্ত তারা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে খৃষ্ট ধর্মের বড় বড় পণ্ডিত–পুরোহিত এবং ধর্মীয় নেতা ও পথ প্রদর্শক ছিল। অর্থাৎ সেন্ট আথানাসিউয়াস, সেন্ট বাসেল, সেন্ট গ্রেগরী নাযিয়ানযীন, সেন্ট কারাই সুষ্টাম, সেন্ট আয়ম ব্রোজ, সেন্ট জিরুম, সেন্ট অগাষ্টাইন, সেন্ট বেনডিক্ট, মহান গ্রেগরী। এঁরা সবাই ছিলেন সংসার বিরাগী দরবেশ এবং বৈরাগ্যবাদের বড় প্রবক্তা। এদের প্রচেষ্টায়ই গীর্জাসমূহে বৈরাগ্যবাদ চালু হয়।

ইতিহাস থেকে জানা যায়, খৃষ্টানদের মধ্যে বৈরাগ্যবাদের সূচনা হয় মিসর থেকে। সেন্ট এন্থনী (St. Anthony) ছিলেন এর প্রবর্তক। তিনি ২৫০ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং ৩৫০ খৃষ্টাব্দে মারা যান। তাঁকেই সর্ব প্রথম খৃষ্টান দরবেশ বলে আখ্যায়িত করা হয়। তিনি 'কাইয়ুম' অঞ্চলে 'পাসপীর' নামক স্থানে (যা বর্তমানে দাইর আল-মাইমূন নামে পরিচিত) প্রথম খানকাহ প্রতিষ্ঠিত করেন। এরপর তিনি লোহিত সাগরের তীরে দ্বিতীয় খানকাহ প্রতিষ্ঠিত করেন, যাকে বর্তমানে দাইর মার আনতিনিউস বলা হয়। খৃষ্টানদের মধ্যে বৈরাগ্যবাদের মৌলিক নিয়ম-কানুন তাঁর লেখা ও নির্দেশাবলী থেকেই গৃহীত হয়েছে। এভাবে সূচনা হওয়ার পর গোটা মিসরে তা প্লাবনের ন্যায় ছড়িয়ে পড়ে এবং স্থানে স্থানে পুরুষ ও মহিলা দরবেশ ও সংসার বিরাগীদের জন্য স্বতন্ত্র খানকাহ গড়ে ওঠে যার কোন কোনটিতে তিন হাজার পর্যন্ত দরবেশ ও সন্ন্যাসী থাকতো। ৩২৫ খৃষ্টাব্দে মিসরেই পাখোমিউস নামের আরো একজন খৃষ্টান অলীর আবির্ভাব ঘটে, যিনি নারী ও পুরুষ সন্ন্যাসী-দরবেশদের জন্য দশটি বড় খানকাহ নির্মাণ করেন। এরপর এ ধারা সিরিয়া, ফিলিস্তিন এবং আফ্রিকা ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করতে থাকে। গীর্জা কর্তৃপক্ষ প্রথম প্রথম এ বৈরাগ্যবাদের ব্যাপারে কঠিন দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে যায়। কারণ গীর্জাসমূহ দুনিয়া বর্জন, নিসঙ্গ ও কুমার জীবন যাপন এবং দারিদ্র ও অভাব অনটনকে আধ্যাত্মিক জীবনের আদর্শ মনে করতো ঠিকই কিন্তু সন্ন্যাসীদের বিয়ে শাদী করা, সন্তান উৎপাদন করা এবং সম্পদের মালিকানা লাভকে গোনাহর কাজ বলে আখ্যায়িত করতে পারতো না। অবশেষে সেন্ট আথানাসিউস (মৃত্যু ৩৭৩ খৃষ্টাব্দ), সেন্ট বাসেল (মৃত্যু ৩৭৯ খৃষ্টাব্দ), সেন্ট অগাস্টাইন (মৃত্যু ৪৩০ খৃষ্টাব্দ) এবং মহান গ্রেগরী (মৃত্যু ৬০৯ খৃষ্টাব্দ) এর মত ব্যক্তিদের প্রভাবে বৈরাগ্যবাদের অনেক নিয়ম-কানুন চার্চ ব্যবস্থায় যথারীতি প্রবেশ লাভ করে।

এই বৈরাগ্যবাদী বিদআতের কতিপয় বৈশিষ্ট ছিল। আমরা সংক্ষেপে সেগুলো বর্ণনা করছি ঃ

এক ঃ কঠোর সাধনা ও নিত্য নতুন পন্থায় নিজের দেহকে নানা রকম কষ্ট দেয়া। এ ব্যাপারে প্রত্যেক দরবেশই অন্যদের পেছনে ফেলার চেষ্টা করতো। খৃষ্টান আওলিয়া দরবেশদের কিস্‌সা-কাহিনীতে তাদের কামালিয়াতের যেসব বর্ণনা আছে তা কতকটা এখানে বর্ণনা করা হলো ঃ

আলেকজান্দ্রিয়ার সেন্ট মাকারিউস তার দেহের ওপর সব সময় ৮০ পাউণ্ড ওজনের বোঝা বহন করতো। ৬ মাস পর্যন্ত সে কর্দমাক্ত মাটিতে শয়ন করতে থাকে এবং বিষাক্ত মক্ষিকাসমূহ তার উদোম শরীরে দংশন করতে থাকে। তার সাগরেদ সেন্ট ইউসিবিউস গুরুর চেয়েও অধিক সাধনায় মগ্ন হয়। সে সব সময় ১৫০ পাউণ্ড ওজনের বোঝা বহন করতো এবং তিনবছর পর্যন্ত একটি শুষ্ক কূপের মধ্যে অবস্থান করেছিলো। সেন্ট সাবিউস শুধু এমন জোয়ারের রুটি খেতেন যা গোটা মাস পানিতে ভিজে থাকার কারণে গন্ধযুক্ত হয়ে যেতো। সেন্ট বাইসারিউন ৪০ দিন পর্যন্ত কন্টকাকীর্ণ ঝোপের মধ্যে পড়েছিলো এবং ৪০ বছর পর্যন্ত সে মাটিতে পিঠ ঠেকায়নি। সেন্ট পাখোমিউস ১৫ বছর অপর একটি বর্ণনা অনুসারে পঞ্চাশ বছর মাটিতে পিঠ না ঠেকিয়ে অতিবাহিত করেছে। সেন্ট জন নামক একজন ওলী তিন বছর পর্যন্ত উপাসনারত অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিল। পুরো এই সময়টাতে সে

কখনো বসেও নাই কিংবা শয্যা গ্রহণও করে নাই। আরাম করার জন্য একটি বড় পাথরে হেলান দিত এবং প্রতি রবিবারে তার জন্য 'তাবাররুক' হিসেবে যে খাদ্য আনা হতো কেবল তাই ছিল তার খাদ্য। সেন্ট সিমিউন ষ্টায়লাইট (৩৯০–৪৪৯ খৃঃ) খৃষ্টানদের বড় বড় ওলী দরবেশদের অন্যতম। প্রত্যেক ইষ্টারের আগে সে পুরা চল্লিশ দিন না খেয়ে কাটিয়ে দিত। একবার সে পুরো এক বছর পর্যন্ত এক পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে ছিল। মাঝে মধ্যে সে তার খানকাহ থেকে বেরিয়ে একটি কূপের মধ্যে গিয়ে থাকতো। অবশেষে সে উত্তর সিরিয়ার সীমান দূর্গের সন্নিকটে ৬০ ফুট উঁচু একটি স্তম্ভ নির্মাণ করিয়ে নেয় যার ওপরের অংশের পরিধি ছিল মাত্র তিন ফুট। এরই উপরে তার জন্য একটি ঘেরা নির্মাণ করে দেয়া হয়েছিলো। এই স্তম্ভটির ওপরে সে পুরো তিনটি বছর কাটিয়ে দেয়। রোদ–বৃষ্টি ও শীত–গ্রীষ্ম সব কিছুই তার ওপর দিয়ে চলে যেতো কিন্তু স্তম্ভ থেকে সে কখনো নিচে নামতো না। তার শিষ্য সিড়ি লাগিয়ে তাকে খাবার পৌঁছাতো এবং তার ময়লা আবর্জনা সাফ করতো। তার পর সে একটি রশি দিয়ে নিজেকে স্তম্ভের সাথে বেঁধে নেয়। এমনকি রশি তার শরীরের মাংসের মধ্যে ঢুকে যায়। এতে মাংসে পচন ধরে এবং তাতে পোকা পড়ে। তার ফোঁড়া থেকে যখনই কোন পোকা নীচে পড়ে যেতো তখনই সে তা উঠিয়ে ফোঁড়ার মধ্যে রাখতো এবং বলতো ঃ "আল্লাহ তোকে যা খেতে দিয়েছেন, খা।" সাধারণ খৃষ্টানরা বহুদূর দূরান্ত থেকে তার সাক্ষাত লাভের জন্য আসতো। সে মারা গেলে খৃষ্টান জনতা তার সম্পর্কে সিদ্ধান্ত দেয় যে, সে খৃষ্টান অলী দরবেশদের মধ্যে সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত।

এ যুগের খৃষ্টান আওলিয়াদের যেসব গুণাবলী বর্ণনা করা হয়েছে তা এ ধরনের দৃষ্টান্তে ভরা। অলীদের মধ্যে কারো পরিচয় ছিল এই যে, সে ৩০ বছর পর্যন্ত সম্পূর্ণ নিশ্চুপ ছিল, তাকে কখনো কথা বলতে দেখা যায়নি। কেউ নিজেকে একটি বড় পাথরের সাথে বেঁধে রেখেছিল। কেউ জংগলে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াতো এবং ঘাস ও লতাপাতা খেয়ে জীবন ধারণ করতো। কেউ সব সময় ভারী বোঝা বহন করে বেড়াতো। কেউ শৃঙ্খলে নিজের অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ বেঁধে রাখতো। কিছু সংখ্যক অলী আবার জীব–জন্তুর গুহায়, শুষ্ক বিরান কূপে কিংবা পুরনো কবরে গিয়ে বাস করতো। আরো কিছু সংখ্যক বুযর্গ সব সময় উলঙ্গ থাকতো, লম্বা চুল দিয়ে নিজেদের লজ্জাস্থান ঢাকতো এবং বুকে হেঁটে চলতো। সবখানে এ ধরনের ওলী দরবেশদের কারামতের চর্চা হতো এবং মৃত্যুর পর তাদের হাড্ডিসমূহ খানকাহসমূহে সংরক্ষণ করা হতো। আমি নিজে সিনাই পর্বতের পাদদেশে সেন্ট ক্যাথারাইনের খানকায় এ ধরনের হাড় গোড়ে সজ্জিত গোটা একটা লাইব্রেরী দেখেছি যেখানে এক জায়গায় ওলীদের মাথার খুলি, এক জায়গায় পায়ের হাড় এবং এক জায়গায় হাতের হাড় সাজানো ছিল। একজন ওলীর গোটা কংকালই কাঁচের আলমারীতে রাখা ছিল।

দুই ঃ তাদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট ছিল এই যে, তারা সব সময় নোংরা ও অপরিচ্ছন্ন থাকতো এবং পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে চরমভাবে বর্জন করে চলতো। তাদের দৃষ্টিতে গোসল করা বা শরীরে পানি লাগানো আল্লাহ ভীরুতার পরিপন্থী। দেহের পরিচ্ছন্নতাকে তারা আত্মার অপবিত্রতা বলে মনে করতো। সেন্ট আথানাসিউস অত্যন্ত ভক্তির সাথে সেন্ট এ্যানথোনীর এই বৈশিষ্টটি বর্ণনা করেছেন যে, মৃত্যু পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত সে তার নিজের পা

৫০ বছর পর্যন্ত সে মুখ বা পা কিছুই ধোয়নি। এক বিখ্যাত খৃষ্টান সন্ন্যাসীনী কুমারী সিলভিয়া আঙ্গুল ছাড়া জীবনভর দেহের অন্য কোন অংশে পানি লাগতে দেয়নি। একটি কনভেন্টের ১৩০ জন সন্ন্যাষিনীর প্রশংসায় লেখা হয়েছে যে, তারা কখনো নিজেদের পা ধোয়নি। আর গোসলের তো নাম শুনলেই তাদের দেহে কম্পন সৃষ্টি হতো।

তিন ঃ এ বৈরাগ্যবাদ দাম্পত্য জীবনকে কার্যত পুরোপুরি হারাম করে দেয় এবং বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে ফেলার ব্যাপারে অত্যন্ত নির্মমভাবে কাজ করে। চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীর সমস্ত ধর্মীয় রচনাবলী এ ধারণায় ভরা যে, নিসঙ্গ জীবন বা কৌমার্য সর্বাপেক্ষা বড় নৈতিক মূল্যবোধ। পবিত্রতার অর্থ হচ্ছে ব্যক্তি যৌন সম্পর্ককে একেবারেই বর্জন করবে। এমনকি তা স্বামী–স্ত্রীর মধ্যকার যৌন সম্পর্ক হলেও। এমন একটি অবস্থাকে পূতঃ পবিত্র আধ্যাত্মিক জীবনের পরিপূর্ণতা মনে করা হতো, যে ক্ষেত্রে ব্যক্তি তার প্রবৃত্তিকে পুরোপুরি হত্যা করে এবং তার মধ্যে দৈহিক ভোগাকাংখার লেশ মাত্রও অবশিষ্ট না থাকে। প্রবৃত্তিকে হত্যা করা তাদের দৃষ্টিতে এজন্য জরুরী ছিল যে, তা দ্বারা পশুত্ব শক্তি লাভ করে। তাদের কাছে ভোগ এবং গোনাহ ছিল সমার্থক। এমনকি তাদের দৃষ্টিতে আনন্দ প্রকাশ করাও আল্লাহকে ভুলে যাওয়ার নামান্তর ছিল। সেন্ট বাসেল শব্দ করে হাসা এমনকি মুচকি হাসা পর্যন্ত নিষেধ করেছেন। এসব ধ্যান–ধারণার ভিত্তিতে তাদের কাছে নারী ও পুরুষের বৈবাহিক সম্পর্ক একেবারেই অপবিত্র বলে গণ্য হয়েছিলো। বিয়ে তো দূরের কথা নারীর চেহারা না দেখা এবং বিবাহিত হলে স্ত্রীকে ফেলে চলে যাওয়া সন্ন্যাসীর জন্য অত্যন্ত জরুরী ছিল। পুরুষদের মত নারীদের মনেও একথা বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছিল যে, তারা যদি আসমানী বাদশাহীতে প্রবেশ করতে চায় তাহলে যেন চির কুমারী থাকে এবং বিবাহিতা হলে স্বামীদের থেকে আলাদা হয়ে যায়। সেন্ট জিরুমের মত বিশিষ্ট খৃষ্টান পণ্ডিত বলেন, যে নারী যীশু খৃষ্টের কারণে সন্ন্যাসিনী হয়ে সারা জীবন কুমারী থাকবে সে খৃষ্টের সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী আর সেই নারীর মা, খোদা অর্থাৎ খৃষ্টের শাশুড়ী (Mother in law of god) হওয়ার মর্যাদা লাভ করবে। সেন্ট জিরুম অন্য একস্থানে বলেন ঃ "পবিত্রতার কুঠার দিয়ে দাম্পত্য বন্ধনের কাষ্ঠ খণ্ড কেটে ফেলাই আধ্যাত্মিক পথের অনুসারীর সর্ব প্রথম কাজ।" এসব শিক্ষার প্রভাবে ধর্মীয় আবেগ সৃষ্টি হওয়ার পর একজন খৃষ্টান পুরুষ বা খৃষ্টান নারীর মধ্যে এর সর্ব প্রথম যে প্রতিক্রিয়া হয় তা হচ্ছে, তার মধুর দাম্পত্য জীবন চিরদিনের জন্য ধংস হয়ে যায়। আর খৃষ্টান ধর্মে যেহেতু তালাক ও বিচ্ছেদের কোন ব্যবস্থা ছিল না তাই বৈবাহিক বন্ধনের মধ্যে থেকেই স্বামী–স্ত্রী পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতো। সেন্ট নাইলাস (St. Nilus) ছিল দুই সন্তানের পিতা। সে বৈরাগ্যবাদের খপ্পরে পড়লে তার স্ত্রী কাঁদতে শুরু করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও সে স্ত্রী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। সেন্ট আম্মুন (St. Ammon) বিয়ের রাতে বাসর শয্যায়ই তার নব বধুকে দাম্পত্য সম্পর্কের অপবিত্রতা সম্পর্কে উপদেশ দেয় এবং উভয়ে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত নেয় যে, তারা আজীবন পরস্পর আলাদা থাকবে। সেন্ট এ্যালেক্সিসও (St. Alexis) এই একই কাজ করেছিল। খৃষ্টান আওলিয়া–দরবেশদের জীবন–কথা এ ধরনের কাহিনীতে ভরপুর।

গীর্জা কর্তৃপক্ষ তার গণ্ডির মধ্যে তিনশত বছর পর্যন্ত কোন না কোনভাবে এ চরমপন্থী ধ্যান–ধারণা প্রতিরোধ করতে থাকে। সেই সময় একজন পাদ্রীর জন্য নিসঙ্গ বা অবিবাহিত

হওয়া জরুরী ছিল না। সে যদি পাদ্রীর পদ মর্যাদায় অভিষিক্ত হওয়ার আগেই বিবাহিত হয়ে থাকে তাহলে সে স্ত্রীর সাথেই থাকতে পারতো। তবে পাদ্রী হিসেবে নিয়োজিত হওয়ার পর তার বিয়ে করা নিষেধ ছিল। তাছাড়া এমন কোন ব্যক্তিকে পাদ্রী নিয়োগ করা যেতো না যে কোন বিধবা কিংবা তালাক প্রাপ্তাকে বিয়ে করেছে বা যার দুই স্ত্রী আছে কিংবা যার ঘরে দাসী আছে। ক্রমান্বয়ে চতুর্থ শতাব্দীতে এ ধারণা জোরদার হয়ে ওঠে যে, যে ব্যক্তি গীর্জায় ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করে তার বিবাহিত হওয়া অত্যন্ত ঘৃণার ব্যাপার। ৩৬২ খৃষ্টাব্দের গেংরা কাউন্সিল ছিল এ ব্যাপারে সর্বশেষ সম্মেলন যেখানে এ ধরনের ধ্যান–ধারণাকে ধর্মের পরিপন্থী বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু এর অল্প কিছুকাল পরেই ৩৮৬ খৃষ্টাব্দে রোমান সিনোড (Synod) সমস্ত পাদ্রীকে পরামর্শ দেয় যে, তারা যেন বৈবাহিক বন্ধন থেকে দূরে থাকে। পরের বছর পোপ সাইরিকিয়াস (Siricius) নির্দেশ জারি করে যে, যে পাদ্রী বিয়ে করবে কিংবা পূর্ব বিবাহিত হওয়ার ক্ষেত্রে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক রাখবে, তাকে তার পদ থেকে অপসারিত করা হোক। সেন্ট জিরুম, সেন্ট এ্যাম্ব্রুজ ও সেন্ট অগাষ্টাইনের মত বড় বড় পণ্ডিত ও মনীষী অত্যন্ত জোরালোভাবে এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করে এবং যৎ সামান্য প্রতিরোধের পর পাশ্চাত্য গীর্জাসমূহে অত্যন্ত কঠোরভাবে তা চালু হয়। পূর্ব বিবাহিত লোকেরা ধর্মীয় দায়িত্ব পালনে নিয়োজিত হওয়ার পরও নিজেদের স্ত্রীর সাথে "অবৈধ" সম্পর্ক রক্ষা করে চলছে এ ধরনের অনেক অভিযোগ নিয়ে চিন্তা–ভাবনা করার জন্য সে সময় অনেকগুলো কাউন্সিল অনুষ্ঠিত হয়। অবশেষে তাদের সংশোধনের জন্য নিয়ম করে দেয়া হয় যে, তারা উন্মুক্ত স্থানে ঘুমাবে, স্ত্রীদের সাথে কখনো একাকী সাক্ষাত করবে না এবং তাদের সাক্ষাতের সময় কমপক্ষে দুই জন লোক উপস্থিত থাকবে। সেন্ট গ্রেগরী একজন পাদ্রীর প্রশংসা করে লিখছেন যে, সে ৪০ বছর পর্যন্ত তার স্ত্রী থেকে দূরে ছিল এবং মৃত্যুর সময় তার স্ত্রী যখন তার কাছে যায় তখন সে বলে ঃ "নারী, তুই দূর হ।"

চার ঃ এ বৈরাগ্যবাদের সব চাইতে বেদনাদায়ক দিক ছিল এই যে, তা মা–বাপ, ভাইবোন ও সন্তানদের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক ছিন্ন করে দিয়েছিল। খৃষ্টান আওলিয়া দরবেশদের দৃষ্টিতে সন্তানের জন্য মা বাবার স্নেহ–ভালবাসা, ভাইয়ের জন্য ভাই–বোনের স্নেহ–ভালবাসা এবং বাপের জন্য ছেলেমেয়ের ভালবাসাও ছিল একটি পাপ। তাদের মতে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য এসব সম্পর্ক ছিন্ন করা অপরিহার্য। খৃষ্টান আওলিয়া দরবেশদের জীবন কথায় এর এমন সব হৃদয় বিদারক কাহিনী দেখা যায় যা পাঠ করে কোন মানুষের পক্ষে ধৈর্যধারণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। একজন সন্ন্যাসী ইভাগ্রিয়াস (Evagrius) বছরের পর বছর মরুভূমিতে গিয়ে সাধনা করছিল। তার বাবা মা বহু বছর ধরে তার জন্য অস্থিরতা প্রকাশ করছিল। একদিন হঠাৎ তার কাছে তার মা বাবার পত্র পৌঁছলো। এ পত্র পাঠ করে তার মনে মানবিক ভালবাসার আবেগ উদ্বেলিত হয়ে উঠতে পারে এ আশংকা দেখা দিল। তাই সে ঐ পত্রগুলো না খুলেই আগুনে নিক্ষেপ করলো। সেন্ট থিউডোরাসের মা ও বোন বহুসংখ্যক পাদ্রীর সুপারিশ পত্র নিয়ে যে খানকায় সে অবস্থান করতো সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলো এবং পুত্র ও ভাইকে এক নজর দেখার আকাংখা প্রকাশ করলো। কিন্তু সে তাদের সম্মুখে আসতে পর্যন্ত অস্বীকার করলো। সেন্ট মার্কাসের (St. Marcus) মা তার সাথে সাক্ষাতের জন্য তার খানকায় যায় এবং খানকার প্রধানকে অনুনয়–বিনয় করে ছেলেকে মায়ের সামনে আসার নির্দেশ দিতে রাজি করায়। কিন্তু ছেলে কোনক্রমেই মায়ের

সাথে সাক্ষাত করতে চাচ্ছিলো না। শেষ পর্যন্ত সে খানকা প্রধানের নির্দেশ পালন করে এভাবে যে, বেশভূষা পরিবর্তন করে মায়ের সামনে যায় এবং চোখ বন্ধ করে থাকে। এভাবে মাও ছেলেকে চিনতে পারেনি, ছেলেও মায়ের চেহারা দেখতে পায়নি। আরো একজন অলী সেন্ট পোমেন (St. Poemen) ও তার ৬ ভাই মিসরের একটি মরু খানকায় থাকতো। বহু বছর পর তাদের বৃদ্ধা মা তা খোঁজ পায় এবং তাদের সাথে সাক্ষাতের জন্য সেখানে গিয়ে হাজির হয়। ছেলে দূর থেকে মাকে দেখা মাত্রই দৌড়িয়ে গিয়ে তার হুজরায় প্রবেশ করে এবং দরজা বন্ধ করে দেয়। মা বাইরে বসে কাঁদতে থাকলো এবং চিৎকার করে বললো ঃ এই বৃদ্ধাবস্থায় এত দীর্ঘ পথ হেটে আমি কেবল তোমাকে দেখতে এসেছি। আমি যদি তোমার চেহারা দেখি তাহলে তোমার কি ক্ষতি হবে? আমি কি তোমার মা নই? কিন্তু সেসব অলী–দরবেশরা দরজা খুললো না। তারা মাকে বলে দিল যে, আমরা আল্লাহর কাছে তোমার সাথে সাক্ষাত করবো। সেন্ট সিমিউন স্টায়লাইটসের (St. Simeon Stylites) কাহিনী এর চেয়েও বেদনাদায়ক। সে তার মাকে ছেড়ে ২৭ বছর নিরুদ্দেশ থাকে। বাপ তার বিচ্ছেদে মারা যায়। মা জীবিত থাকে। ছেলের আল্লাহর অলী হওয়ার কথা যখন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে তখন মা ছেলের অবস্থান জানতে পারে। বেচারী মা তার সাথে সাক্ষাতের জন্য তার খানকায় গিয়ে হাজির হয়। কিন্তু কোন নারীর জন্য সেখানে প্রবেশের অনুমতি ছিল না। ছেলে হয় তাকে ভেতরে ডেকে নিক কিংবা বাইরে এসে তাকে দর্শন দিক এ ব্যাপারে মা অশেষ কাকুতি–মিনতি জানায়। কিন্তু সেই অলী তা করতে সুস্পষ্টভাবে অস্বীকৃতি জানায়। এ অবস্থায় হতভাগিনী মা তিনদিন তিন রাত খানকার দরজার সামনে পড়ে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত সেখানেই শুয়ে শুয়ে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। তখন অলী সাহেব বেরিয়ে এসে মায়ের লাশের পাশে অশ্রুপাত এবং তার ক্ষমার জন্য দোয়া করে।

এসব অলীরা তাদের বোন ও সন্তানদের সাথেও এ ধরনের নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছে। এক ব্যক্তি মিউটিয়াসের কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন যে, সে ছিল একজন সুখী–স্বচ্ছল মানুষ। হঠাৎ তাকে ধর্মীয় আবেগে পেয়ে বসে এবং সে তার ৮ বছর বয়সের একমাত্র পুত্রকে নিয়ে এক খানকায় গিয়ে হাজির হয়। সেখানে তার আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য মন থেকে পুত্রের প্রতি স্নেহ–ভালবাসা দূর করা একান্ত আবশ্যক ছিল। সেজন্য প্রথমে তাকে পুত্রের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। অতপর তার চোখের সামনে দীর্ঘদিন পর্যন্ত তার সে নিষ্পাপ শিশু সন্তানকে নানাভাবে নির্মম কষ্ট দেয়া হতে থাকে এবং সে তা দেখতে থাকে। এরপর খানকার পুরোহিত তাকে তার ঐ সন্তানকে নিজ হাতে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে নির্দেশ দেয়। সে যখন এ নির্দেশও পালন করতে প্রস্তুত হয় এবং শিশুটিকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে উদ্যত হয় ঠিক সে মুহূর্তে সন্ন্যাসীরা এসে তার জীবন রক্ষা করে। এরপরে স্বীকৃতি দেয়া হয় যে, সত্যিই সে অলী হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছে।

এসব ব্যাপারে খৃষ্টীয় বৈরাগ্যবাদের দৃষ্টিকোণ ছিল এই যে, আল্লাহর ভালবাসা যে ব্যক্তি চায় তাকে মানবীয় ভালবাসার সেসব শৃঙ্খল কেটে ফেলতে হবে যা পৃথিবীতে তাকে তার মা বাবা, ভাইবোন এবং সন্তান–সন্ততির সাথে মায়ার বন্ধনে আবদ্ধ করে। সেন্ট জিরূম বলেন ঃ "তোমার ভাতিজা যদি তোমার গলায় বাহু জড়িয়েও থাকে, তোমার মা যদি তোমাকে দুধের দোহাই দিয়ে বিরত রাখতে চায়, তোমাকে বিরত রাখার জন্য

তোমার বাবা যদি তোমার সামনে লুটিয়ে পড়ে, তারপরও তুমি সবাইকে পরিত্যাগ করে এবং বাবার দেহকে পদদলিত করে এক ফোটাও অশ্রুপাত না করে ক্রুশের ঝাণ্ডার দিকে ছুটে যাও। এ ক্ষেত্রে নিষ্ঠুরতাই তাকওয়া।" সেন্ট গ্রেগরী লিখেছেন ঃ "এক যুবক সন্ন্যাসী মন থেকে মা বাবার প্রতি ভালবাসা দূর করতে পারেনি। সে এক রাতে চুপে চুপে তাদের সাথে সাক্ষাত করতে যায়। আল্লাহ তাকে এ অপরাধের সাজা দেন। সে খানকায় ফিরে আসা মাত্রই মারা যায়। তার লাশ দাফন করা হলে মাটি তা গ্রহণ করে না। কবরে বার বার তার লাশ রাখা হয় কিন্তু মাটি তা বাইরে নিক্ষেপ করে। অবশেষে সেন্ট বেনেডিক্ট তার বুকের ওপর তাবার্‌রুক রাখলে কবর তাকে গ্রহণ করে।" এক সন্ন্যাসিনী সম্পর্কে লিখেছেন যে, সে মারা যাওয়ার পর তিনদিন পর্যন্ত আযাব হতে থাকে। কারণ সে মন থেকে তাঁর মায়ের ভালবাসা দূর করতে পারেনি। একজন অলীর প্রশংসায় লিখেছেন যে, নিজের আত্মীয়–স্বজন ছাড়া সে কখনো অন্য কারো সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করেনি।

পাঁচ ঃ নিজের নিকটাত্মীয়দের সাথে নির্দয়তা, নিষ্ঠুরতা এবং কঠোরতা প্রদর্শনের যে অনুশীলন তারা করতো তাতে তাদের মানবিক আবেগ–অনুভূতি মরে যেতো। এর স্বাভাবিক ফল দাঁড়িয়েছিল এই যে, যাদের সাথে তাদের ধর্মীয় বিরোধ দেখা দিতো এরা তাদের ওপর জুলুম–অত্যাচারের চরম পন্থা গ্রহণ করতো। চতুর্থ শতাব্দীর আগমন পর্যন্ত খৃষ্টবাদের মধ্যে ৮০–৯০টি ফিরকা সৃষ্টি হয়েছিল। সেন্ট অগাষ্টাইন তার সময়ে ৮৮টি ফিরকা গণনা করেছেন। এসব ফিরকা পরস্পরের বিরুদ্ধে চরম ঘৃণা ও হিংসা বিদ্বেষ পোষণ করতো। হিংসা বিদ্বেষের এ আগুনের ইন্ধন যোগানদাতাও ছিল সন্ন্যাসীরা। এ আগুনে বিরোধী ফিরকাসমূহকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেয়ার প্রচেষ্টায়ও এসব খানকাবাসী সন্ন্যাসীরাই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতো। এ সাম্প্রদায়িক সংঘাতের একটি বড় আখড়া ছিল আলেকজান্দ্রিয়া। সেখানে প্রথমে এরিয়ান ফিরকার বিশপ আথানাসিউসের দলের ওপর হামলা করে। তার খানকা থেকে কুমারী সন্ন্যাসীনীদের ধরে ধরে বের করে আনা হয়। তাদেরকে উলংগ করে কাঁটাযুক্ত ডাল পাল্য দিয়ে প্রহার করা হয় এবং শরীরে দাগ লাগানো হয় যাতে তারা নিজেদের আকীদা–বিশ্বাস বর্জন করে তাওবা করে। এর পর মিসরে ক্যাথলিক গোষ্ঠী বিজয় লাভ করলে এরিয়ান ফিরকার সাথে একই আচরণ করে। এমনকি খুব সম্ভবত খোদ এরিয়াস (Arius)কেও বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়। আলেকজান্দ্রিয়াতেই সেন্ট সাইরিল (Cyril) এর মুরীদ সন্ন্যাসীরা ব্যাপক হাংগামার সৃষ্টি করে। এমনকি তারা বিরোধী ফিরকার এক সন্ন্যাসিনীকে ধরে তাদের গীর্জায় নিয়ে হত্যা করে এবং লাশ টুকরো টুকরো করে কেটে আগুনে নিক্ষেপ করে। রোমের পরিস্থিতিও এর থেকে ভিন্ন কিছু ছিল না। ৩৬৬ খৃষ্টাব্দে পোপ লিবেরিয়াস (Liberius) এর মৃত্যু হলে দুই গোষ্ঠীই পোপের পদের জন্য নিজ নিজ প্রার্থী দাঁড় করায়। উভয় গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক খুনাখুনি ও রক্তপাত হয়। এমনকি একটি চার্চ থেকে একদিনে ১৩৭টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়।

ছয় ঃ দুনিয়া বর্জন ও নিসঙ্গ জীবন যাপন এবং কৃচ্ছতা ও দরবেশীর জীবন যাপনের পাশাপাশি পার্থিব ধন–সম্পদ উপার্জনও কম করা হয়নি। পঞ্চম শতাব্দীর শুরুতেই পরিস্থিতি এ দাঁড়িয়েছিল যে, রোমের বিশপ তার মহলে রাজা–বাদশাহদের মত বসবাস করতো। আর সে যখন সওয়ারীতে আরোহণ করে শহরে বের হতো তখন তার জাঁকজমক

কাইজারের চাইতে কম হতো না। সেন্ট জিরুম তার সময়ে (চতুর্থ শতাব্দীর শেষযুগ) অভিযোগ করেছেন যে, বহু সংখ্যক বিশপের খাওয়ার অনুষ্ঠানসমূহ জাঁকজমকের দিক দিয়ে গভর্ণরদের খাওয়া অনুষ্ঠানসমূহকে লজ্জা দিত। খানকাহ ও গীর্জাসমূহের প্রতি সম্পদের এই প্রবাহ সপ্তম শতাব্দীর প্রারম্ভকাল (কুরআন নাযিল হওয়ার যুগ) পর্যন্ত প্লাবনের আকার ধারণ করেছিলো। জনসাধারণের মনে একথা বদ্ধমূল করে দেয়া হয়েছিলো যে, কোন ব্যক্তির দ্বারা কোন বড় গোনাহর কাজ সংঘটিত হলে কোন না কোন অলীর দরগায় নজরানা পেশ করে কিংবা কোন খানকাহ বা চার্চকে ভেট ও উপঢৌকন দিয়েই কেবল ক্ষমা পাওয়া যেতে পারে। যে পার্থিব স্বার্থ ও ঐশ্বর্য পরিত্যাগ করাই ছিল পাদ্রী–সন্ন্যাসীদের বিশেষ বৈশিষ্ট তা–ই এখন তাদের পদতলে লুটিয়ে পড়লো। যে জিনিস বিশেষ ভাবে এ অধপতনের কারণ হয় তা ছিল সন্ন্যাসীদের অস্বাভাবিক আধ্যাত্মিক সাধনা ও প্রবৃত্তি দমনের চরম প্রচেষ্টা দেখে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে চরম ভক্তি–শ্রদ্ধা সৃষ্টি হয়েছিলো তাতে বহু দুনিয়াদার লোক দরবেশের পোশাক পরে পাদ্রী–সন্ন্যাসীদের দলে অন্তরভুক্ত হয়েছিলো। তারা পার্থিব স্বার্থ বর্জনের মুখোশ পরে দুনিয়া অর্জনের কারবার এমনভাবে জাঁকিয়ে বসেছিল যে, বড় বড় দুনিয়াদারও তাদের কাছে হার মানতে বাধ্য হয়।

সাত ঃ সতীত্বের ক্ষেত্রেও বৈরাগ্যবাদ প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে বারবার পরাজয় বরণ করেছে আর সে পরাজয়ও বরণ করতে হয়েছে অত্যন্ত শোচনীয়ভাবে। খানকাসমূহে প্রবৃত্তি দমনের এমন কিছু অনুশীলনও ছিল, যে ক্ষেত্রে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীরা মিলে একই জায়গায় থাকতো এবং কোন কোন সময় কিছুটা কঠিন অনুশীলনের জন্য একই বিছানায় রাত কাটাতো। বিখ্যাত দরবেশ সেন্ট ইভাগ্রিয়াস (Evagrius) অত্যন্ত প্রশংসামুখর হয়ে ফিলিস্তিনের কিছু সংখ্যক সন্ন্যাসী–দরবেশের আত্ম সংযমের উল্লেখ করে বলেছেনঃ "তারা তাদের আবেগ অনুভূতিকে এতটা কাবু করতে সক্ষম হয়েছিল যে, নারীদের সাথে এক জায়গায় গোসল করতো কিন্তু তাদেরকে দেখে, তাদের স্পর্শ পেয়ে এমনকি তাদের সাথে আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়েও তাদের প্রবৃত্তি সাড়া দিতো না।" বৈরাগ্যবাদের দৃষ্টিতে গোসল যদিও অত্যন্ত অপছন্দনীয় ব্যাপার ছিল। কিন্তু প্রবৃত্তি দমনের উদ্দেশ্যে এ ধরনের গোসলও করা হতো। শেষ পর্যন্ত এ ফিলিস্তিন সম্পর্কেই নাইসার (Nyssa) সেন্ট গ্রেগরী যিনি ৩৯৬ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন—লিখেছেন যে, ফিলিস্তিন অসৎ ও দুশ্চরিত্রের আখড়ায় পরিণত হয়েছে। যারা মানব–প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াই করে মানব–প্রকৃতি তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ না করে ক্ষান্ত হয় না। বৈরাগ্যবাদ এর বিরুদ্ধে লড়াই করে অবশেষে লাম্পট্যের যে গহ্বরে পতিত হয়েছে তার কাহিনী খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সময়ের ধর্মীয় ইতিহাসের একটি কুৎসিত কলঙ্ক। দশম শতাব্দীর একজন ইতালীয় বিশপ লিখছেন ঃ চার্চে ধর্মীয় দায়িত্ব পালনকারীদের বিরুদ্ধে যদি লাম্পট্য ও চরিত্রহীনতার শাস্তিমূলক আইন কার্যকর করা হয় তাহলে চার্চের কাজে নিয়োজিত লোকদের মধ্যে কেবল বালকরা ছাড়া আর কেউ তা থেকে রক্ষা পাবে না। আর যদি অবৈধ সন্তানদেরকেও ধর্মীয় কাজের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়ার নিয়ম চালু করা হয় তাহলে হয়তো চার্চের কাজে নিয়োজিত কোন বালকই সেখানে থাকতে পারবে না। মধ্য যুগের লেখকদের গ্রন্থসমূহ এ ধরনের অভিযোগ ও কাহিনীতে ভরা যে, সন্ন্যাসিনীদের খানকাসমূহ চরিত্রহীনতার আখড়া তথা বেশ্যালয়ে পরিণত হয়েছে, চতুর্দেয়ালের মধ্যে

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَاٰمِنُوْا بِرَسُوْلِهٖ يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَّحْمَتِهٖ وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۚ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿٢٨﴾ لِّئَلَّا يَعْلَمَ اَهْلُ الْكِتٰبِ اَلَّا يَقْدِرُوْنَ عَلٰى شَيْءٍ مِّنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَآءُ ۚ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ ﴿٢٩﴾

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং তাঁর রসূল (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)–এর ওপর ঈমান আনো।[৫৫] তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে দ্বিগুণ রহমত দান করবেন, তোমাদেরকে সেই জ্যোতি দান করবেন যার সাহায্যে তোমরা পথ চলবে[৫৬] এবং তোমাদের ত্রুটি–বিচ্যুতি মাফ করে দেবেন।[৫৭] আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (তোমাদের এ নীতি অবলম্বন করা উচিত) যাতে কিতাবধারীরা জানতে পারে যে, আল্লাহর অনুগ্রহের ওপর তাদের একচেটিয়া অধিকার নেই, বরং আল্লাহর অনুগ্রহ নিরংকুশভাবে আল্লাহরই হাতে নিবদ্ধ। তিনি যাকে চান তা দেন। তিনি বড়ই অনুগ্রহশীল।

নবজাতক শিশুদের গণহত্যা চলছে, পাদ্রী এবং চার্চের ধর্মীয় কাজ সম্পাদনকারী কর্মীদের মধ্যে "মুহরেম" বা যেসব নারীর সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক হারাম তাদের সাথে পর্যন্ত অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন ও খানকাসমূহে সমকামিতার অপরাধ পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে এবং গীর্জাসমূহে পাপ স্বীকারের (Confession) অনুষ্ঠান দুষ্কর্ম ও চরিত্রহীনতার সহায়ক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কুরআন মজীদ এখানে বৈরাগ্যবাদরূপী বিদআত আবিষ্কার করা এবং পরে তা যথার্থভাবে মেনে চলতে না পারার কথা বলে খৃষ্টান ধর্মের কোন্ বিকৃতির প্রতি ইংগিত করছে বিস্তারিত এসব বর্ণনা থেকে তা সঠিকভাবে অনুমান করা যেতে পারে।

৫৫. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাস্সিরদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। একদল মুফাসসির বলেনঃ এখানে يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا কথাটি দ্বারা যারা হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর ঈমান এনেছিলো তাদের সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের বলা হচ্ছে, এখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনো। এজন্য তোমাদেরকে দ্বিগুণ পুরস্কার দেয়া হবে। একটি পুরস্কার দেয়া হবে হযরত ঈসা আলাইহিস সালামের ওপর ঈমান আনার জন্য এবং আরেকটি পুরস্কার দেয়া হবে হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনার জন্য। অপর দল বলেন, যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান এনেছে এখানে তাদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে। তাদের বলা হচ্ছে, তোমরা শুধু মৌখিকভাবে তার নবুওয়াতকে স্বীকার করেই ক্ষান্ত হয়ো না, বরং সরল মনে নিষ্ঠার সাথে ঈমান গ্রহণ করো এবং ঈমান গ্রহণের হক

আদায় করো। এভাবে তোমরা দ্বিগুণ পুরস্কার লাভ করবে। একটি পুরস্কার কুফরী ত্যাগ করে ইসলাম গ্রহণের জন্য এবং আরেকটি পুরস্কার নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা সহ ইসলামের খেদমত করার ও তার ওপর দৃঢ়পদ থাকার জন্য। সূরা কাসাসের ৫২ থেকে ৫৪ পর্যন্ত আয়াত প্রথম তাফসীরের সমর্থন করে। তাছাড়া হযরত আবু মূসা আশআরী বর্ণিত হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। হাদীসটিতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তিন ব্যক্তির জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। উক্ত তিন ব্যক্তির মধ্যে একজন হচ্ছে

رَجُلٌ مِّنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اٰمَنَ بِنَبِيِّهٖ وَاٰمَنَ بِمُحَمَّدٍ

"আহলে কিতাবদের মধ্য থেকে সে ব্যক্তি যে পূর্ববর্তী নবীর প্রতি ঈমান পোষণ করতো এবং পরে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম–এর ওপর ঈমান এনেছে।" (বুখারী ও মুসলিম)।

সূরা সাবার ৩৭ আয়াত দ্বিতীয় তাফসীরের সমর্থন করে যাতে বলা হয়েছে; সৎকর্মশীল ঈমানদারদের জন্য দ্বিগুণ পুরস্কার রয়েছে। দলীল–প্রমাণের দিক দিয়ে দু'টি তাফসীরই সমান গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পরবর্তী বিষয়বস্তু সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করলে বুঝা যায় যে, এখানে দ্বিতীয় তাফসীরটিই অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে এ সূরার বিষয়বস্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এ তাফসীরকেই সমর্থন করে। যারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাতকে স্বীকার করে ইসলাম গ্রহণ করেছিলো এ সূরার শুরু থেকে সেসব লোককেই সম্বোধন করা হয়েছে। গোটা সূরায় তাদেরকেই সম্বোধন করে এ আহবান জানানো হয়েছে যে, তারা যেন শুধু মৌখিকভাবে স্বীকৃতি দান করে ঈমানদার না হয়, বরং নিষ্ঠার সাথে সরল মনে ঈমান গ্রহণ করে।

৫৬. অর্থাৎ পৃথিবীতে জ্ঞান ও দূরদৃষ্টির এমন 'নূর' দান করবেন যার আলোতে তোমরা প্রতি পদক্ষেপে স্পষ্ট দেখতে পাবে জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জাহেলিয়াতের বাঁকা পথ–সমূহের মধ্যে ইসলামের সরল সোজা পথ কোন্‌টি। আর আখেরাতে এমন 'নূর' দান করবেন যার উল্লেখ ১২ আয়াতে পূর্বেই করা হয়েছে।

৫৭. অর্থাৎ ঈমানের দাবী পূরণের আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মানবিক দুর্বলতার কারণে তোমাদের দ্বারা যে ভুল ত্রুটিই সংঘটিত হোক না কেন তিনি তা ক্ষমা করে দেবেন। আর ঈমান গ্রহণের পূর্বে জাহেলিয়াতের সময় তোমাদের দ্বারা যেসব ভুল–ত্রুটি সংঘটিত হয়েছে তাও ক্ষমা করে দেবেন।

আল মুজাদালাহ

৫৮

নামকরণ

الـمـجـادلـة এবং المـجـادلـة উভয়টিই এ সূরার নাম। নামটি প্রথম আয়াতের تُجَادِلُكَ শব্দ থেকে গৃহীত হয়েছে। সূরার প্রারম্ভেই যেহেতু সে মহিলার কথা উল্লেখ আছে, যে তার স্বামীর 'যিহারে'র ঘটনা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে পেশ করে পীড়াপীড়ি করেছিল যে, তিনি যেন এমন কোন উপায় বলে দেন যাতে তার এবং তার সন্তানদের জীবন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। আল্লাহ তা'আলা তার এ পীড়াপীড়িকে مـجـادلـه শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করেছেন। তাই এ শব্দটিকে এ সূরার নাম হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। শব্দটিকে যদি مـجـادلـه পড়া হয় তাহলে তার অর্থ হবে "আলোচনা ও যুক্তি তর্ক" আর যদি مـجـادلـه পড়া হয় তাহলে অর্থ হবে "আলোচনা ও যুক্তিতর্ক উপস্থাপনকারিনী।"

নাযিল হওয়ার সময়-কাল

মুজাদালার এ ঘটনাটি কখন সংঘটিত হয়েছিল তা কোন রেওয়ায়াতেই স্পষ্ট করে বর্ণনা করা হয়নি। কিন্তু এ সূরার বিষয়বস্তুর মধ্যে এমন একটি ইংগিত আছে যার ভিত্তিতে নির্দিষ্ট করে বলা যায় যে, এ সূরা আহযাব যুদ্ধের (৫ম হিজরীর শাওয়াল মাস) পরে নাযিল হয়েছে। পালিত পুত্র যে প্রকৃতই পুত্র হয় না সে বিষয়ে বলতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা সূরা আহযাবে যিহার সম্পর্কে শুধু এতটুকু বলেছিলেন ঃ

وَمَا جَعَلَ اَزْوَاجَكُمُ الّٰـئِىْ تُظٰـهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمَّهٰتِكُمْ

"তোমরা যেসব স্ত্রীর সাথে যিহার করো আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের মা বানিয়ে দেননি।" (আল আহযাব ঃ ৪)

কিন্তু যিহার করা যে, একটি গোনাহ বা অপরাধ সেখানে তা বলা হয়নি। এ কাজের শরয়ী বিধান কি সেখানে তাও বলা হয়নি। পক্ষান্তরে এ সূরায় যিহারের সমস্ত বিধি-বিধান বলে দেয়া হয়েছে। এতে বুঝা যায় বিস্তারিত এ হুকুম আহকাম ঐ সংক্ষিপ্ত হিদায়াতের পরেই নাযিল হয়েছে।

বিষয়বস্তু ও মূল বক্তব্য

সেসময় মুসলমানগণ যেসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন এ সূরায় সেসব সমস্যা সম্পর্কে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সূরার শুরু থেকে ৬ নং আয়াত পর্যন্ত যিহারের শরয়ী

হুকুম আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে। সে সাথে মুসলমানদের কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে যে, ইসলাম গ্রহণ করার পরে জাহেলী রীতিনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমাসমূহ লংঘন করা অথবা তা মেনে চলতে অস্বীকার করা অথবা তার পরিবর্তে নিজের ইচ্ছা মাফিক অন্য নিয়ম নীতি ও আইন কানুন তৈরী করে নেয়া ঈমানের চরম পরিপন্থী কাজ ও আচরণ। এর শাস্তি হচ্ছে পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা। এ ব্যাপারে আখেরাতেও কঠোর জবাবদিহি করতে হবে।

৭ থেকে ১০ আয়াতে মুনাফিকদের আচরণের তীব্র সমালোচনা করা হয়েছে। তারা পরস্পর গোপন সলা পরামর্শ করে নানারূপ ক্ষতি সাধনের পরিকল্পনা করতো। তাদের মনে যে গোপন হিংসা বিদ্বেষ ছিল তার কারণে তারা রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইহুদীদের মত এমন কায়দায় সালাম দিতো যা দ্বারা দোয়ার পরিবর্তে বদ দোয়া প্রকাশ পেতো। এ ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে এই বলে সান্তনা দেয়া হয়েছে যে, মুনাফিকদের ঐ সলা পরামর্শ তোমাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা আল্লাহর ওপর ভরসা করে নিজেদের কাজ করতে থাক। সাথে সাথে তাদেরকে এই নৈতিক শিক্ষাও দেয়া হয়েছে যে, গোনাহ জুলুম বাড়াবাড়ি এবং নাফরমানির কাজে সলা পরামর্শ করা ঈমানদারদের কাজ নয়। তারা গোপনে বসে কোন কিছু করলে তা নেকী ও পরহেজগারীর কাজ হওয়া উচিত।

১১ থেকে ১৩ আয়াতে মুসলমানদের কিছু মজলিসী সভ্যতা ও বৈঠকী আদব-কায়দা শেখানো হয়েছে। তাছাড়া এমন কিছু সামাজিক দোষ-ত্রুটি দূর করার জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যা মানুষের মধ্যে আগেও ছিল এবং এখনো আছে। কোন মজলিসে যদি বহু সংখ্যক লোক বসে থাকে এমতাবস্থায় যদি বাইরে থেকে কিছু লোক আসে তাহলে মজলিসে পূর্ব থেকে বসে থাকা ব্যক্তিগণ নিজেরা কিছুটা গুটিয়ে বসে তাদের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়ার কষ্টটুকু স্বীকার করতেও রাজি হয় না। ফলে পরে আগমনকারীগণ দাঁড়িয়ে থাকেন, অথবা দহলিজে বসতে বাধ্য হয় অথবা ফিরে চলে যায় অথবা মজলিসে এখনো যথেষ্ট স্থান আছে দেখে উপস্থিত লোকজনকে ডিঙ্গিয়ে ভিতরে চলে আসেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মজলিসে প্রায়ই এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হতো। তাই আল্লাহ তা'আলা সবাইকে হিদায়াত বা নির্দেশনা দিয়েছেন যে, মজলিসে আত্মস্বার্থ এবং সংকীর্ণ মনের পরিচয় দিও না। বরং খোলা মনে পরবর্তী আগমনকারীদের জন্য স্থান করে দাও।

অনুরূপ আরো একটি ত্রুটি মানুষের মধ্যে দেখা যায়। কেউ করো কাছে গেলে বিশেষ করে কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির কাছে গেলে জেঁকে বসে থাকে এবং এদিকে মোটেই লক্ষ করে না যে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় নেয়া তার কষ্টের কারণ হবে। তিনি যদি বলেন, জনাব এখন যান তাহলে সে খারাপ মনে করবে। তাকে ছেড়ে উঠে গেলে অভদ্র আচরণের অভিযোগ করবে। ইশারা ইংগিতে যদি বুঝাতে চান যে, অন্য কিছু জরুরী কাজের জন্য তার এখন কিছু সময় পাওয়া দরকার তাহলে শুনেও শুনবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও মানুষের এ আচরণের সম্মুখীন হতেন আর তাঁর সাহচর্য থেকে উপকৃত হওয়ার আকাঙ্খায় আল্লাহর বান্দারা মোটেই খেয়াল করতেন না যে, তারা অতি মূল্যবান কাজের সময় নষ্ট করছেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলা এ কষ্টদায়ক বদঅভ্যাস

পরিত্যাগ করার জন্য নির্দেশ দিলেন যে, যখন বৈঠক শেষ করার জন্য উঠে যাওয়ার কথা বলা হবে তখন উঠে চলে যাবে।

মানুষের মধ্যে আরো একটি বদঅভ্যাস ছিল। তা হচ্ছে, কেউ হয়তো নবীর (সা) সাথে অযথা নির্জনে কথা বলতে চাইতো অথবা বড় মজলিসে তাঁর নিকটে গিয়ে গোপনীয় কথা বলার ঢংয়ে কথা বলতে চাইতো। এটি নবীর (সা) জন্য যেমন কষ্টদায়ক ছিল তেমনি মজলিসে উপস্থিত লোকজনের কাছে অপছন্দনীয় ছিল। তাই যে ব্যক্তিই নির্জনে একাকী তাঁর সাথে কথা বলতে চায় , আল্লাহ তা'আলা তার জন্য কথা বলার আগে সাদকা দেয়া বাধ্যতামূলক করে দিলেন। লোকজনকে তাদের এ বদঅভ্যাস সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়াই ছিল এর উদ্দেশ্য। যাতে তারা এ বদঅভ্যাস পরিত্যাগ করে।

সুতরাং এ বাধ্যবাধকতা মাত্র অল্প কিছু দিন কার্যকর রাখা হয়েছিল। মানুষ তাদের কার্যধারা ও অভ্যাস সংশোধন করে নিলে এ নির্দেশ বাতিল করে দেয়া হলো।

মুসলিম সমাজের মানুষের মধ্যে নিস্বার্থ ঈমানদার, মুনাফিক এবং দোদুল্যমান তথা সিদ্ধান্তহীনতার রোগে আক্রান্ত মানুষ সবাই মিলে মিশে একাকার হয়েছিল। তাই কারো সত্যিকার ও নিস্বার্থ ঈমানদার হওয়ার মানদণ্ড কি তা ১৪ আয়াত থেকে সূরার শেষ পর্যন্ত তা স্পষ্টভাষায় বলে দেয়া হয়েছে। এক শ্রেণীর মুসলমান ইসলামের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব রাখে, সে যে দীনের ওপর ঈমান আনার দাবী করে নিজের স্বার্থের খাতিরে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করতেও দ্বিধাবোধ করে না এবং ইসলামের বিরুদ্ধে নানারকম সন্দেহ-সংশয় এবং দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছড়িয়ে আল্লাহর বান্দাদের আল্লাহর পথে আসতে বাধা দেয়। তবে যেহেতু তারা মুসলমানদের দলে অন্তরভুক্ত তাই ঈমান গ্রহণের মিথ্যা স্বীকৃতি তাদের জন্য ঢালের কাজ করে। আরেক শ্রেণীর মুসলমান তাদের দীনের ব্যাপারে অন্য কারো পরোয়া করা তো দূরের কথা নিজের বাপ, ভাই, সন্তান-সন্ততি এবং গোষ্ঠীকে পর্যন্ত পরোয়া করে না। তাদের অবস্থা হলো, যে আল্লাহ, রসূল এবং তার দীনের শত্রু তার জন্য তার মনে কোন ভালবাসা নেই। এ আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা স্পষ্ট বলে দিয়েছেন, প্রথম শ্রেণীর এই মুসলমানরা যতই শপথ করে তাদের মুসলমান হওয়ার নিশ্চয়তা দিক না কেন প্রকৃতপক্ষে তারা শয়তানের দলের লোক। সুতরাং শুধু দ্বিতীয় প্রকার মুসলমানগণই আল্লাহর দলে অন্তরভুক্ত হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছে। তারাই খাঁটি মুসলমান। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই লাভ করবে সফলতা।

আল্লাহ অবশ্যই সে মহিলার কথা শুনেছেন[১] যে তার স্বামীর ব্যাপারে তোমার কাছে কাকুতি মিনতি করেছে এবং আল্লাহর কাছে অভিযোগ করছে। আল্লাহ তোমাদের দু'জনের কথা শুনছেন[২] তিনি সবকিছু শুনে ও দেখে থাকেন।

তোমাদের মধ্যে যারা নিজেদের স্ত্রীদের সাথে "যিহার" করে[৩] তাদের স্ত্রীরা তাদের মা নয়। তাদের মা কেবল তারাই যারা তাদেরকে প্রসব করেছে।[৪] এসব লোক একটা অতি অপছন্দনীয় ও মিথ্যা কথাই বলে থাকে।[৫] প্রকৃত ব্যাপার হলো, আল্লাহ মাফ করেন, তিনি অতীব ক্ষমাশীল।[৬]

১. এখানে শোনা অর্থ শুধুমাত্র শোনা নয়, বরং বিপদে সাহায্য করা। যেমন, আমরা সাধারণভাবে বলি, আল্লাহ দোয়া শুনেছেন। এর অর্থ আল্লাহ দোয়া কবুল করেছেন।

২. অনুবাদকগণ সাধারণভাবে এ স্থানে অনুবাদ করেছেন, মহিলা ঝগড়া করছিল, অভিযোগ করছিল। আর এ অনুবাদ পড়ে পাঠক এ অর্থ গ্রহণ করে যে, মহিলাটি তার অভিযোগ পেশ করে হয়তো চলে গিয়েছিল এবং পরে কোন এক সময় রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাযিল হয়েছিল। তাই আল্লাহ তাআলা বলেছেন, আমি সে মহিলার কথা শুনেছি, যে তোমার কাছে অনুনয় বিনয় ও ফরিয়াদ করছিল। সে সময় আমি তোমাদের উভয়ের কথাবার্তা শুনছিলাম। কিন্তু এ ঘটনা সম্পর্কে হাদীসসমূহে যেসব বর্ণনা আছে তার অধিকাংশ বর্ণনাতেই বলা হয়েছে, যে

সময় সেই মহিলা তার স্বামীর "যিহারের" ঘটনা শুনিয়ে নবীর (সা) কাছে বারবার এ বলে আবেদন করছিল যে, তাদের মধ্যে যদি বিচ্ছেদ হয়ে যায় তাহলে সে বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়বে এবং তার সন্তান–সন্ততি ধ্বংস হয়ে যাবে। ঠিক এ সময়েই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর অহী নাযিল হওয়ার লক্ষণ পরিস্ফুট হয়ে উঠলো এবং এ আয়াতগুলো নাযিল হলো। এ কারণে আমরা বর্তমান কাল বোধক শব্দ দিয়ে এর অনুবাদ করেছি।

যে মহিলা সম্পর্কে এ আয়াতগুলো নাযিল হয়েছিল তিনি ছিলেন খাযরাজ গোত্রের খাওলা বিনতে সা'লাবা। তাঁর স্বামী ছিলেন আওস গোত্রের নেতা আওস ইবনে সামেত আনসারীর ভাই। তাঁর যিহারের ঘটনা আমরা পরে সবিস্তারে বর্ণনা করবো। এখানে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার হলো, আল্লাহর দরবারে এ সাহাবিয়ার অভিযোগ গৃহীত হওয়া এবং আল্লাহর তরফ থেকে সংগে সংগে তাঁর অভিযোগের প্রতিকার করে নির্দেশ নাযিল হওয়া ছিল এমন একটি ঘটনা যার কারণে সাহাবা কিরামের মধ্যে তিনি বিশেষ একটি সম্মান ও মর্যাদার স্থান লাভ করেছিলেন। ইবনে আবী হাতেম ও বায়হাকী একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, একবার হযরত 'উমর (রা) কিছুসংখ্যক সংগী–সাথীর সাথে কোথাও যাচ্ছিলেন। পথে এক মহিলার সাথে দেখা হলে সে তাঁকে থামতে বললে তিনি সংগে সংগে থেমে গেলেন। মাথা নিচু করে দীর্ঘ সময় তার কথা শুনলেন এবং সে নিজে কথা শেষ না করা পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন। সংগীদের মধ্যে একজন জিজ্ঞেস করলো : হে আমীরুল মু'মিনীন, এ বুড়ীর জন্য আপনি কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে এত সময় থামিয়ে রেখেছেন কেন? তিনি বললেন : সে কে তা কি জান? এ যে, খাওলা বিনতে সা'লাবা। এ তো সে মহিলা, সাত আসমানের ওপরে যার অভিযোগ গৃহীত হয়েছে। আল্লাহর কসম, তিনি যদি আমাকে সারা রাত দাঁড় করিয়ে রাখতেন তাহলে আমি সারা রাতই দাঁড়িয়ে থাকতাম। শুধু নামাযের সময় ওজর পেশ করতাম। ইবনে আব্দুল বার তাঁর 'ইসতিয়াব' গ্রন্থে কাতাদার একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেছেন যে, রাস্তায় হযরত 'উমরের (রা) সাথে এ মহিলার সাক্ষাত হলে তিনি তাঁকে সালাম দিলেন। সালামের জবাব দেয়ার পর তিনি বলতে থাকলেন : "ওহ্ উমর এমন এক সময় ছিল যখন আমি তোমাকে "উকাযের" বাজারে দেখেছিলাম। তখন তোমাকে উমায়ের বলে ডাকা হতো। তখন তুমি লাঠি হাতে নিয়ে বকরী চরিয়ে বেড়াতে। এর অল্প দিন পর তোমাকে 'উমর' নামে ডাকা হতে থাকলো। অতপর এমন এক সময় আসলো যখন তোমাকে 'আমীরুল মু'মিনীন' বলে সম্বোধন করা শুরু হলো। প্রজাদের ব্যাপারে অন্তত কিছুটা আল্লাহকে ভয় করো। মনে রেখো, যে আল্লাহর আযাব সম্পর্কিত সাবধানবাণীকে ভয় পায় দূরের মানুষও তাঁর নিকটাত্মীয়ের মত হয়ে যায়। আর যে মৃত্যুকে ভয় পায় তার ব্যাপারে আশংকা হয় যে, সে এমন জিনিসও হারিয়ে ফেলবে যা সে রক্ষা করতে চায়।" হযরত উমরের (রা) সাথে ছিলেন জারুদ আবদী। একথা শুনে তিনি বললেন : হে নারী, তুমি আমীরুল মু'মিনের সাথে অনেক বে–আদবী করেছো। হযরত 'উমর বললেন : তাকে বলতে দাও। তুমি কি জান সে কে? তাঁর কথা তো সাত আসমানের ওপরে গৃহীত হয়েছিল। 'উমরকে (রা) তো তাঁর কথা শুনতেই হবে।' ইমাম বুখারীও (র) তাঁর লিখিত ইতিহাস গ্রন্থে সংক্ষেপে এ ঘটনার প্রায় অনুরূপ ঘটনা উদ্ধৃত করেছেন।

৩. আরবে অনেক সময় এমন ঘটনা ঘটতো যে, স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া বিবাদ হলে স্বামী ক্রোধান্বিত হয়ে বলতো أَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ أُمِّى এর আভিধানিক অর্থ হলো, "তুমি আমার জন্য ঠিক আমার মায়ের পিঠের মত" কিন্তু এর প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, আমার তোমার সাথে সহবাস ঠিক আমার মায়ের সাথে সহবাস করার মত। এযুগেও বহু নির্বোধ মানুষ স্ত্রীর সাথে ঝগড়া বিবাদ করে তাদের মা, বোন ও মেয়ের মত বলে ফেলে। এর স্পষ্ট অর্থ দাঁড়ায় স্বামী এখন আর তাকে স্ত্রী মনে করে না, বরং যেসব স্ত্রীলোক তার জন্য হারাম তাদের মত মনে করে। এরূপ করাকেই "যিহার" বলা হয়। ظهر আরবী ভাষায় রূপক অর্থে বাহনকে বলা হয়। উদাহরণ স্বরূপ সওয়ারী জন্তুকে ظهر বলা হয়। কেননা, মানুষ তার পিঠে আরোহণ করে। মানুষ যেহেতু স্ত্রীকে নিজের জন্য হারাম করে নেয়ার উদ্দেশ্যে বলতো যে, তোমাকে ظهر বানানো আমার জন্য আমার মাকে ظهر বানানোর মতই হারাম। সুতরাং তাদের মুখ থেকে এসব কথা উচ্চারণ করাকেই তাদের ভাষায় 'যিহার' বলা হতো। জাহেলী যুগে আরবদের কাছে এটা তালাক বা তার চেয়ে অত্যন্ত কঠোর প্রকৃতির সম্পর্কচ্ছেদের ঘোষণা বলে মনে করা হতো। কারণ, তাদের দৃষ্টিতে এর অর্থ ছিল এই যে, স্বামী তার স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্কই ছিন্ন করছে না বরং তাকে নিজের মায়ের মত হারাম করে নিচ্ছে। এ কারণে আরবদের মতে তালাক দেয়ার পর তা প্রত্যাহার করা যেতো। কিন্তু "যিহার" প্রত্যাহার করার কোন সম্ভাবনাই অবশিষ্ট থাকতো না।

৪. এটা যিহার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার প্রথম ফায়সালা। এর অর্থ হলো, কেউ যদি মুখ ফুটে স্ত্রীকে মায়ের মত বলে বসে তাহলে তার বলার কারণে স্ত্রী তার মা হতে পারে না। কোন মহিলার কারো মা হওয়া একটা সত্য ও বাস্তব ব্যাপার। কারণ, সে তাকে প্রসব করেছে। এ কারণে সে স্থায়ীভাবে হারাম হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছে। কিন্তু যে নারী তাকে প্রসব করেনি, শুধু মৌখিক কথাতেই সে কিভাবে তার মা হয়ে যাবে? বুদ্ধি-বিবেক, নৈতিকতা এবং আইন কানুন যে কোন বিচারেই হোক সে কিভাবে প্রকৃত প্রসবকারিনী মায়ের মত হারাম হবে? আল্লাহ তা'আলা এভাবে এ কথাটি ঘোষণা করে সেসব জাহেলী আইন-কানুনকে বাতিল করে দিয়েছেন যার ভিত্তিতে যিহারকারী স্বামীর সাথে তার স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যেতো এবং স্ত্রীকে স্বামীর জন্য মায়ের মত অলংঘনীয় হারাম মনে করা হতো।

৫. অর্থাৎ স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করা প্রথমত এমন একটি অর্থহীন ও লজ্জাজনক কথা যা মুখে উচ্চারণ করা তো দূরের কথা কোন শরীফ মানুষের যার কল্পনাও করা উচিত নয়। দ্বিতীয়ত, এটি একটি মিথ্যা কথাও বটে। কারণ, যে এরূপ কথা বলছে সে যদি এর দ্বারা বুঝিয়ে থাকে যে, তার স্ত্রী এখন তার মা হয়ে গিয়েছে তাহলে সে মিথ্যা বলছে। আর সে যদি এ একথাটি তার সিদ্ধান্ত হিসেবে শুনিয়ে থাকে যে, আজ থেকে সে তার স্ত্রীকে মায়ের মর্যাদা দান করেছে তাহলেও তার এ দাবী মিথ্যা। কারণ, আল্লাহ তাকে অধিকার দেননি যে, যতদিন ইচ্ছা সে একজন নারীকে স্ত্রী হিসেবে রাখবে এবং যখন ইচ্ছা তাকে মায়ের মর্যাদা দান করবে। সে নিজে আইন রচয়িতা নয় বরং আইন রচয়িতা হলেন আল্লাহ। আল্লাহ তা'আলা প্রসবকারিনী মায়ের সাথে দাদী, নানী, শাশুড়ী, দুধমা এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র স্ত্রীগণকেও মাতৃত্বের মর্যাদা দান করেছেন।

وَالَّذِينَ يُظٰهِرُونَ مِن نِّسَآئِهِمۡ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ فَتَحۡرِيرُ رَقَبَةٖ مِّن قَبۡلِ أَن يَتَمَآسَّاۚ ذٰلِكُمۡ تُوعَظُونَ بِهِۦۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٞ ۝

যারা[৭] নিজের স্ত্রীর সাথে "যিহার" করে বসে এবং তারপর নিজের বলা সে কথা প্রত্যাহার করে[৮] এমতাবস্থায় তারা পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বে একটি ক্রীতদাসকে মুক্ত করতে হবে। এর দ্বারা তোমাদের উপদেশ দেয়া হচ্ছে।[৯] তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত।[১০]

নিজের স্ত্রীকে তো দূরের কথা নিজের পক্ষ থেকে অন্য কোন নারীকেও এ মর্যাদার অন্তরভুক্ত করার অধিকার কারোই নেই। একথা থেকে আরো একটি আইনগত বিধান যা পাওয়া যায় তাহলো, 'যিহার' করা একটি গুরুতর গোনাহ এবং হারাম কাজ। যে এ কাজ করবে সে শাস্তির উপযুক্ত।

৬. অর্থাৎ এটি এমন একটি কাজ যে জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কঠিন শাস্তি পাওয়া উচিত। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার মেহেরবাণী যে, তিনি প্রথমত যিহারের ব্যাপারে জাহেলী আইন-কানুন বাতিল করে তোমাদের পারিবারিক জীবনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। দ্বিতীয়ত এ অপরাধে অপরাধী ব্যক্তির জন্য সর্বাধিক লঘু শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। তার সবচেয়ে বড় মেহেরবানী এই যে, জেল খাটা বা মারপিট অকারে এ অপরাধের শাস্তি বিধান করেননি। বরং এমন কিছু ইবাদাত ও নেকীর কাজকে এ অপরাধের শাস্তি নির্ধারিত করেছেন যা তোমাদের প্রবৃত্তির সংশোধন করে এবং সমাজে কল্যাণ ও সুকৃতির বিস্তার ঘটায়। এ ক্ষেত্রে এ বিষয়টিও বুঝা উচিত যে, কোন কোন অপরাধ ও গোনাহর জন্য যেসব ইবাদাতকে কাফ্ফারা নির্ধারণ করা হয়েছে তা ইবাদাতের চেতনাবিহীন নিরেট শাস্তি নয়। আবার নিছক এমন ইবাদাতও নয় যে, তার মধ্যে শাস্তির কষ্টকর কোন দিক আদৌ নেই। এর মধ্যে ইবাদাত ও শাস্তি উভয়টিই একত্রিত করা হয়েছে, যাতে ব্যক্তি যুগপত কষ্টও ভোগ করে এবং সাথে সাথে একটি ইবাদাত ও নেকীর কাজ করে তার কৃত গোনাহরও প্রতিকার করে।

৭. এখান থেকে যিহারের আইনগত আদেশ নিষেধ শুরু হয়েছে। এসব বিধি-বিধান সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র যুগে যিহারের যেসব ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল তা সামনে থাকা জরুরী। কেননা, যিহারের বিধি-বিধান সম্পর্কিত এসব আয়াত নাযিল হওয়ার পর সংঘটিত ঘটনাসমূহের ক্ষেত্রে নবী (সা) যেসব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তা থেকেই ইসলামে যিহার সম্পর্কিত বিস্তারিত বিধি-বিধান গৃহীত হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণনা অনুসারে আওস ইবনে সামেত আনসারীর ঘটনাই ইসলামে যিহার সম্পর্কিত সর্ব প্রথম ঘটনা। তাঁর স্ত্রী খাওলার ফরিয়াদের জওয়াবে

আল্লাহ তা'আলা এসব আয়াত নাযিল করেছেন। বিভিন্ন বর্ণনাকারীর নিকট থেকে মুহাদ্দিসগণ এ ঘটনার যে বিস্তারিত বিবরণ উদ্ধৃত করেছেন তাতে অনেক খুঁটি নাটি মতভেদ আছে। তবে আইনগত গুরুত্ব বহন করে এরূপ উপাদান সম্পর্কে সবাই প্রায় একমত। এসব বর্ণনার সার কথা হলো, বৃদ্ধাবস্থায় হযরত আওস ইবনে সামেত কিছুটা খিটমিটে মেজাজের হয়ে গিয়েছিলেন। কোন কোন বর্ণনা অনুসারে তার মধ্যে কতকটা পাগলামী ভাব সৃষ্টি হয়েছিল। এ বিষয়টা বুঝানোর জন্য বর্ণনাকারীগণ كان به لمم বাক্য ব্যবহার করেছেন। আরবী ভাষায় لمم শব্দ দ্বারা পাগলামী বুঝানো হয় না, বরং এমন একটি অবস্থাকে বুঝানো হয় যাকে আমরা বাংলায় "ক্রোধে পাগল হয়ে যাওয়া" কথাটি দ্বারা বুঝিয়ে থাকি। এ অবস্থায় তিনি পূর্বেও কয়েকবার স্ত্রীর সাথে যিহার করেছিলেন। কিন্তু স্ত্রীর সাথে ঝগড়া বিবাদ করে তার দ্বারা পুনরায় এ ঘটনা সংঘটিত হওয়া ছিল ইসলামে সর্ব প্রথম ঘটনা। এ ঘটনার পর তাঁর স্ত্রী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাহি ওয়া সাল্লামের কাছে হাজির হয় এবং পূরা ঘটনা বর্ণনা করার পর বলেন, হে আল্লাহর রসূল, আমার এবং আমার সন্তানাদির জীবনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করার কোন অবকাশ আছে কি? নবী (সা) এর যে জওয়াব দিয়েছিলেন বিভিন্ন বর্ণনাকারী তা বিভিন্ন বক্তব্যের মাধ্যমে উদ্ধৃত করেছেন। কোন কোন বর্ণনার ভাষা হলো, "এ বিষয়ে এখন পর্যন্ত আমাকে কোন নির্দেশ দেয়া হয়নি।" কোন কোন বর্ণনার ভাষা হলো, "আমার ধারণা, তুমি তার জন্য হারাম হয়ে গিয়েছো।" আবার কোন কোন বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন, "তুমি তার জন্য হারাম হয়ে গিয়েছো।" এ জবাব শুনে তিনি কাকুতি ও আহাজারি করতে শুরু করলেন। তিনি বারবার নবীকে (সা) বললেন ঃ সে তো তালাকের শব্দ বলেনি। আপনি এমন কোন পন্থা বলুন যার দ্বারা আমি আমার সন্তানাদি এবং বুড়ো স্বামীর জীবন ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা পায়। কিন্তু নবী (সা) প্রতিবার তাকে একই জবাব দিচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে নবীর (সা) ওপর অহী নাযিল হওয়ার অবস্থা দেখা দিল এবং এ আয়াতগুলো নাযিল হলো। এরপর তিনি তাকে বললেন, কোন কোন বর্ণনা অনুসারে তার স্বামীকে ডেকে বললেন ঃ একটি ক্রীতদাসকে মুক্ত করতে হবে। সে এতে তার অক্ষমতা প্রকাশ করলে বললেন ঃ লাগাতার দুই মাস রোযা রাখতে হবে। সে বললো তার অবস্থা এমন যে, দিনে তিনবার পানাহার না করলে তার দৃষ্টি শক্তি ক্ষীণতর হতে থাকে। তিনি বললেন ঃ তাহলে ৬০ জন মিসকীনকে খাদ্য খাওয়াতে হবে। সে বললো তার সে সামর্থ নেই। তবে আপনি যদি সাহায্য করেন তাহলে পারবো। তিনি তাকে ৬০ জন মিসকীনকে দু'বার খাওয়ানোর মত খাদ্য দিলেন। বিভিন্ন রেওয়ায়াতে প্রদত্ত এ খাদ্যের বিভিন্ন পরিমাণ বর্ণনা করা হয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় আছে, নবী (সা) যে পরিমাণ খাদ্য দিয়েছিলেন হযরত খাওলা নিজেও তার স্বামীকে সে পরিমাণ খাদ্য দিয়েছিলেন যাতে তিনি কাফ্ফারা আদায় করতে পারেন (ইবনে জারীর, মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, ইবনে আবী হাতেম)।

যিহারের দ্বিতীয় ঘটনা ছিল সালামা ইবনে সাখার বায়াদীর ঘটনা। তাঁর যৌন শক্তি ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে কিছু বেশী। রমযান মাস আসলে সে এই আশংকায় রমযানের শেষ অবধি সময়ের জন্য স্ত্রীর সাথে যিহার করলো যাতে রোযা অবস্থায় দিনের বেলায় অধৈর্যের কাজ করে না বসে। কিন্তু সে নিজের এ সংকল্প রক্ষা করতে পারেনি। এক রাতে সে স্ত্রীর কাছে চলে যায় এবং তারপর লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সব কিছু খুলে বলে। তিনি বললেন, একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করো। সে

বললো, আমার কাছে আমার স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নেই যাকে আমি মুক্ত করতে পারি। তিনি বললেন, একাধারে দুই মাস রোযা রাখো। সে বললো, রোযা অবস্থায় অধৈর্য হয়েই তো আমি এ মসিবতে জড়িয়ে পড়েছি। নবী (সা) বললেন, তাহলে ৬০ জন মিসকীনকে খেতে দাও। সে বললো, আমি এত দরিদ্র যে, উপোস করে রাত কাটিয়েছি। তখন নবী (সা) বনী যুরাইকের যাকাত আদায়কারীর নিকট থেকে তাকে এতটা খাদ্য দিলেন যাতে সে তা ৬০ জন মিসকীনকে বন্টন করে দিতে পারে এবং নিজের সন্তানাদির প্রয়োজন পূরণ করার জন্যও কিছু রাখতে পারে। (মুসনাদে আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

নাম উল্লেখ না করে তৃতীয় ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে এভাবে যে, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীর সাথে যিহার করলো এবং কাফ্‌ফারা আদায় করার পূর্বেই তার সাথে সহবাস করলো। পরে নবী (সা) এর কাছে এ বিষয়ের সমাধান জানতে চাইলে তিনি তাকে নির্দেশ দিলেন কাফ্‌ফারা আদায় না করা পর্যন্ত স্ত্রীর নিকট থেকে দূরে থাকো। আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ)।

চতুর্থ ঘটনাটি হলো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুনলেন এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বোন সম্বোধন করে ডাকছে। এতে তিনি রাগান্বিতভাবে বললেন ঃ সে কি তোমার বোন? তবে এটিকে তিনি যিহার হিসেবে গণ্য করলেন না। (আবু দাউদ)

এ চারটি ঘটনার নির্ভরযোগ্য বর্ণনা সূত্রে বর্ণিত হাদীসসমূহে পাওয়া যায়। পরবর্তী আয়াতসমূহে কুরআন মজীদের 'যিহার' সম্পর্কিত যে নির্দেশ আছে এসব হাদীসের সাহায্যে তা ভালভাবে বুঝা যেতে পারে।

৮. মূল আয়াতাংশ হচ্ছে, يَعُوْدُوْنَ لِمَا قَالُوْا । একথাটির শাব্দিক অনুবাদ হবে, "তারা যা বলেছে যদি সেদিকে ফিরে যায়" কিন্তু আরবী ভাষা ও বাকরীতি অনুসারে এর অর্থ নিরূপণে বড় রকমের মতভেদ হয়েছে।

এর একটি অর্থ হতে পারে, যিহারের শব্দাবলী একবার মুখ থেকে বের হওয়ার পর পুনরায় তা বলবে। জাহেরিয়া, বুকাইর ইবনুল আশাজ্জ এবং ইয়াহইয়া ইবনে যিহাদ আল ফাররা এ অর্থের সমর্থক। আতা ইবনে আবী রাবাহর একটি মতও এর সমর্থন করে বলে বর্ণিত হয়েছে। তাঁদের মতে একবার যিহার করলে তা ক্ষমার যোগ্য। তবে কেউ যদি বার বার তা করে তাহলে তাকে কাফ্‌ফারা দিতে হবে। তবে দু'টি কারণে এ ব্যাখ্যা স্পষ্ট ভুল। একটি কারণ হলো, আল্লাহ তা'আলা যিহার অর্থহীন ও মিথ্যা কথা ঘোষণা করে তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। এখন একথা কি কল্পনা করা যায় যে, কেউ একবার মিথ্যা এবং অর্থহীন কথা বললে তা মাফ হবে কিন্তু দ্বিতীয়বার বললে শাস্তির উপযুক্ত হবে? এটি ভুল হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হলো, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যিহারকারী কোন লোককেই একথা জিজ্ঞেস করেননি যে, সে একবার যিহার করেছে না দুইবার।

এ আয়াতাংশের দ্বিতীয় অর্থ হলো, জাহেলী যুগে যেসব লোক এ কাজ করতে অভ্যস্ত ছিল তারা যদি ইসলামী যুগেও তা করে তাহলে এটা হবে তাদের শাস্তি। এক্ষেত্রে এর অর্থ হবে, যিহার করা মূলত একটি শাস্তিযোগ্য কাজ। যে ব্যক্তিই তার স্ত্রীর উদ্দেশ্যে মুখ থেকে যিহারের শব্দাবলী উচ্চারণ করবে সে পরে তার স্ত্রীকে তালাক দিক বা তার স্ত্রী মারা

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ۖ فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ۚ ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ④

যে মুক্ত করার জন্য কোন ক্রীতদাস পাবে না সে বিরতিহীনভাবে দুই মাস রোযা রাখবে—উভয়ে পরস্পরকে স্পর্শ করার পূর্বেই। যে তাও পারবে না সে ষাট জন মিসকীনকে খাবার দেবে।[১১]

তোমাদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হচ্ছে এ জন্য যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ওপর ঈমান আনো।[১২] *এগুলো আল্লাহর নির্ধারিত 'হদ'। কাফেরদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি।*[১৩]

যাক কিংবা সে তার স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক রক্ষা না করার সংকল্প করুক তাতে কিছু আসে যায় না। সর্বাবস্থায় তাকে কাফ্ফারা দিতে হবে। ফকীহদের মধ্যে তাউস, মুজাহিদ, শা'বী, যুহরী, সুফিয়ান সাওরী এবং কাতাদা এমত পোষণ করেছেন। তাঁদের মতে, যিহার করার পর স্ত্রী যদি মারা যায় তাহলে কাফ্ফারা আদায় না করা পর্যন্ত স্বামী তার পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী হবে না।

এ আয়াতাংশের তৃতীয় অর্থ হচ্ছে, যিহারের শব্দাবলী মুখ থেকে উচ্চারণের পর ব্যক্তি যা বলেছে তা প্রত্যাহার করে এবং যদি তার প্রতিকার করতে চায়। অন্য কথায় عَادَ لِمَا قَالَ অর্থ সে যদি তার কথা থেকে ফিরে যায়।

এর চতুর্থ অর্থ হলো, যিহার করার মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি তার জন্য যে জিনিস হারাম করে নিয়েছিল তা যদি আবার নিজের জন্য হালাল করে নিতে চায়। অন্য কথায় عَادَ لِمَا قَالَ এর অর্থ হচ্ছে, যে ব্যক্তি হারাম করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল এখন সে পুনরায় তা হালাল করে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

অধিকাংশ ফিকাহবিদ শেষোক্ত দু'টি অর্থের মধ্যে যে কোন একটিকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন।

৯. অন্য কথায় তোমাদেরকে শিষ্ট ও ভদ্র আচরণ শিখানোর জন্য এ নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যাতে মুসলিম সমাজের মানুষ এ জাহেলী কু আচরণ পরিত্যাগ করে এবং তোমাদের মধ্য থেকে কেউই যেন এ অর্থহীন কাজ না করে। যদি স্ত্রীর সাথে বিবাদ না করে কোন উপায় না থাকে তাহলে সভ্য ও রুচিশীল মানুষের মত বিবাদ করো। যদি তালাকই দিতে হয় তাহলে সরাসরি তালাক দিয়ে দাও। স্ত্রীর সাথে বিবাদ হলে তাকে মা অথবা বোন বানিয়ে ছাড়তে হবে এটা কি ধরনের ভদ্রতা ?

১০. অর্থাৎ কেউ যদি বাড়িতে স্ত্রীর সাথে চুপে চুপে যিহার করে বসে এবং পরে কাফ্‌ফারা আদায় করা ছাড়াই স্বামী স্ত্রীর মধ্যে আগের মতই দাম্পত্য সম্পর্ক চলতে থাকে তাহলে সে সম্পর্কে দুনিয়াতে কেউ অবহিত থাক আর না থাক আল্লাহ সর্বাবস্থায়ই তা জানেন। তার জন্য আল্লাহর পাকড়াও থেকে রক্ষা পাওয়া কোনভাবেই সম্ভব নয়।

১১. এটি যিহার সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ। মুসলিম ফিকাহবিদগণ এ আয়াতের শব্দাবলী, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিদ্ধান্তসমূহ এবং ইসলামের সাধারণ নীতিমালা থেকে এ বিষয়ে যেসব আইন–কানুন রচনা করেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

এক ঃ আরব জাহেলিয়াতের যেসব রসম–রেওয়াজ অনুসারে যিহার বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করে দিত এবং স্ত্রী স্বামীর জন্য চিরতরে হারাম হয়ে যেতো যিহার সম্পর্কিত এসব ইসলামী আইন–কানুন তা বাতিল করে দেয়। অনুরূপভাবে যেসব আইনকানুন ও রসম–রেওয়াজ যিহারকে অর্থহীন ও প্রতিক্রিয়াহীন মনে করে এবং স্ত্রীকে মা কিংবা বিয়ে করা হারাম এমন মহিলাদের সাথে তুলনা করা সত্ত্বেও স্বামী তার সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখা বৈধ করে দেয় ইসলামী আইন–কানুন সে সবকেও বাতিল করে দেয়। কারণ ইসলামের দৃষ্টিতে মা এবং বিয়ে করা হারাম এমন অন্য সব মহিলার হারাম হওয়ার ব্যাপারটা মামুলি কোন বিষয় নয়। তাই স্ত্রী এবং তাদের মধ্যে তুলনা করার বিষয়টা মুখে উচ্চারণ করা তো দূরের কথা তা কল্পনাও করা যায় না। এ ব্যাপারে দু'টি চরম পন্থার মধ্যে ইসলামী আইন যে ভূমিকা গ্রহণ করেছে তা তিনটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। প্রথম ভিত্তি হলো, যিহার দ্বারা বিবাহ বন্ধন ছিন্ন হয় না। বরং মহিলা যথারীতি স্বামীর স্ত্রীই থাকে। দ্বিতীয় ভিত্তি হলো, যিহার দ্বারা স্ত্রী সাময়িকভাবে স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যায়। তৃতীয় ভিত্তি হলো, স্বামী কাফ্‌ফারা আদায় না করা পর্যন্ত এই 'হুরমত' অবশিষ্ট থাকে এবং শুধু কাফ্‌ফারাই এই 'হুরমত' রহিত করতে পারে।

দুই ঃ যিহারকারী স্বামী সম্পর্কে এ ব্যাপারে সবাই একমত যে, যে স্বামী সুস্থ বুদ্ধি ও প্রাপ্ত বয়স্ক এবং সুস্থ ও সজ্ঞানে যিহারের শব্দাবলী মুখ থেকে উচ্চারণ করবে কেবল তার যিহার গ্রহণযোগ্য হবে। শিশু ও বিকৃত মস্তিষ্ক ব্যক্তির যিহার গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া যিহারের শব্দাবলী উচ্চারণের সময় যার বিবেক–বুদ্ধি ও মস্তিষ্ক সুস্থ নাই তার যিহারও গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন, কেউ ঘুমন্ত অবস্থা অস্ফুট স্বরে কিছু বললো অথবা কোন প্রকার সংজ্ঞাহীনতায় আক্রান্ত হলো। এগুলো ছাড়া নিম্ন বর্ণিত বিষয়সমূহে ফিকাহবিদদের মতভেদ আছে ঃ

(ক) নেশাগ্রস্ত অবস্থায় যিহারকারী সম্পর্কে চার ইমামসহ ফিকাহবিদদের ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের মত হচ্ছে, কেউ যদি জেনে শুনে মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে তাহলে তালাকের মত তার যিহারও আইনত সঠিক বলে ধরে নেয়া হবে। কারণ সে নিজেই নিজের ওপর এ অবস্থা চাপিয়ে নিয়েছে। তবে কেউ যদি রোগের জন্য কোন ওষুধ ব্যবহার করে এবং তা দ্বারা নেশা ও মাদকতা সৃষ্টি হয়ে থাকে অথবা তীব্র পিপাসায় জীবন রক্ষার জন্য শরাব পান করতে বাধ্য হয়ে থাকে তবে এভাবে সৃষ্ট নেশায় তার যিহার ও তালাক কার্যকর করা হবে না। হানাফী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীগণ এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। সাধারণভাবে সাহাবা কিরামের মতও এটিই ছিল। পক্ষান্তরে হযরত

উসমানের (রা) মত হলো, নেশাগ্রস্ত অবস্থায় তালাক ও যিহার গ্রহণযোগ্য নয়। হানাফীদের মধ্য থেকে ইমাম তাহাবী (র) ও কারখী (র) এ মতটিকে অগ্রাধিকার দান করেন এবং ইমাম শাফেয়ীর (র) একটি মতও এর সমর্থন করে। মালেকীদের মতে ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণরূপে বিচার বুদ্ধি খুইয়ে না বসে বরং সংলগ্ন ও সাজানো গোছানো কথাবার্তা বলতে থাকে এবং কি বলছে সে উপলব্ধি থাকে তাহলে নেশাগ্রস্ত অবস্থার যিহারও গ্রহণযোগ্য হবে।

(খ) ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মালেকের (র) মতে কেবল মুসলমান স্বামীর যিহারই গ্রহণযোগ্য হবে। যিহার সম্পর্কিত এসব বিধি-নিষেধ যিম্মিদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। কারণ কুরআন মজীদে اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْكُمْ বলে মুসলমানদের সম্বোধন করা হয়েছে। তাছাড়া কুরআন মজীদে যিহারের যে তিন প্রকার কাফ্ফারার কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে রোযাও অন্তরভুক্ত আছে। একথা স্পষ্ট যে, রোযা যিম্মীদের জন্য প্রযোজ্য হতে পারে না। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদের মতে এসব আদেশ নিষেধ যিম্মী ও মুসলমান উভয়ের যিহারের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। তবে যিম্মীদের রোযা রাখতে হবে না। তারা শুধু একজন ক্রীতদাসকে মুক্ত করবে অথবা ৬০ জন মিসকীনকে খেতে দেবে।

(গ) পুরুষের মত নারীও কি যিহার করতে পারে? যেমন ঃ সে যদি স্বামীকে বলে, তুমি আমার জন্য আমার বাপের মত অথবা আমি তোমার জন্য তোমার মায়ের মত তাহলে কি তা 'যিহার' বলে গণ্য হবে? চার ইমামের মতে এটা যিহার হবে না এবং এক্ষেত্রে যিহারের আইনগত বিধি বিধান আদৌ প্রযোজ্য হবে না। কেননা, স্বামী যদি স্ত্রীর সাথে যিহার করে কেবল তখনই এই বিধি নিষেধ প্রযোজ্য হবে বলে কুরআন মজীদ স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করেছে (اَلَّذِيْنَ يُظٰهِرُوْنَ مِنْ نِّسَائِهِمْ) এবং যিহার করার ইখতিয়ার কেবল তারই থাকবে যার তালাক দেয়ার অধিকার আছে। ইসলামী শরীয়াত স্বামীকে তালাক দেয়ার ইখতিয়ার যেমন স্ত্রীকে দেয় নি ঠিক তেমনি নিজেকে স্বামীর জন্য হারাম করে নেয়ার ইখতিয়ারও দেয়নি। সুফিয়ান সাওরী, ইসহাক ইবনে রাহাবিয়া, আবু সাওর এবং লাইস ইবনে সা'দ এমতটিই পোষণ করেছেন। তাদের মতে, স্ত্রীর এরূপ কথা অযথা ও অর্থহীন। ইমাম আবু ইউসুফ বলেন, এতে যিহার হবে না। তবে এর দ্বারা স্ত্রীর ওপর কসমের কাফ্ফারা দেয়া অত্যাবশ্যকীয় হবে। কারণ স্ত্রীর একথা বলার অর্থ হচ্ছে সে তার স্বামীর সাথে সম্পর্ক না রাখার শপথ করেছে। ইবনে কুদামাহ উদ্ধৃত করেছেন যে, এটি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের (র)ও মত। ইমাম আওযায়ী (র) বলেন, স্ত্রী যদি বিয়ে হওয়ার আগে একথা বলে থাকে যে, তার যদি অমুক ব্যক্তির সাথে বিয়ে হয় তাহলে সে তার জন্য তার বাপের মত তবে তা যিহার বলে গণ্য হবে। আর যদি বিয়ের পরে বলে থাকে তাহলে কসম বলে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে শুধু কসমের কাফ্ফারা দিতে হবে। তবে কাফ্ফারা আদায়ের পূর্বে স্বামীকে কাছে আসতে বাধা দেয়ার কোন অধিকার নারীর থাকবে না। এর সমর্থনে ইবরাহীম নাখয়ী একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি হলো, তালহার (রা) কন্যা আয়েশাকে বিয়ে করার জন্য হযরত যুবায়েরের পুত্র মুসআব প্রস্তাব দিলে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে এবং বলে; আমি যদি তাকে বিয়ে করি তাহলে هو على كظهر ابى সে আমার জন্য আমার পিতার পিঠের মত। এর কিছুকাল পর সে

তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে সম্মত হয়। এ ব্যাপারে মদীনার উলামাদের নিকট থেকে ফতোয়া চাওয়া হলে বহু সংখ্যক ফকীহ ফতোয়া দিলেন যে, আয়েশাকে যিহারের কাফ্‌ফারা দিতে হবে। এসব ফকীহদের মধ্যে কয়েকজন সাহাবীও অন্তরভুক্ত ছিলেন। এ ঘটনা বর্ণনা করার পর হযরত ইবরাহীম নাখয়ী মত প্রকাশ করেছেন যে, আয়েশা যদি বিয়ের পর একথা বলতেন তাহলে কাফ্‌ফারা দিতে হতো না। কিন্তু তিনি এ কথা বলেছিলেন বিয়ের পূর্বে, যখন তাঁর বিয়ে করা বা না করার অধিকার ছিল তাই তার ওপর কাফ্‌ফারা দেয়া ওয়াজিব।

তিন ঃ সুস্থ বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ও প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তি যদি সজ্ঞানে সুস্থ শরীরে যিহারের শব্দাবলী মুখ থেকে উচ্চারণ করে এবং পরে যুক্তি দেখিয়ে বলে যে, সে ক্রুদ্ধ হয়ে হাসি তামাসা করে অথবা আদর সোহাগ করে এরূপ বলেছে কিংবা তার যিহারের নিয়ত ছিল না তাহলে এ ওজর গ্রহণযোগ্য হবে না। তবে যেসব শব্দ থেকে স্পষ্টভাবে যিহার বুঝায় না এবং যেসব শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থের অবকাশ আছে সেসব শব্দের ধরন ও প্রকৃতির ওপর তার সিদ্ধান্ত নির্ভর করে। যিহারের স্পষ্ট শব্দ কোন্‌গুলো এবং অস্পষ্ট শব্দ কোন্‌গুলো সে সম্পর্কে আমরা পরে আলোচনা করবো।

চার ঃ এটা সর্বসম্মত ব্যাপার যে, বিবাহিত স্ত্রীর সাথেই কেবল যিহার করা যায়। অতএব স্ত্রী ছাড়া অন্য কোন নারীর সাথে যিহার করা যায় কিনা সে বিষয়ে মতভেদ আছে। এ বিষয়ে বিভিন্ন মত নিম্নরূপ ঃ

হানাফীদের মতে কেউ যদি অপর কোন নারীকে বলে, "আমি যদি তোমাকে বিয়ে করি তাহলে তুমি আমার জন্য ঠিক আমার মায়ের পিঠের মত।" এক্ষেত্রে সে যখনই তাকে বিয়ে করুক না কেন কাফ্‌ফারা আদায় করা ছাড়া তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। এটি হযরত 'উমরের (রা)ও ফতোয়া। তাঁর খিলাফত যুগে এক ব্যক্তি এক মহিলাকে একথা বলেছিল এবং পরে তাকে বিয়ে করেছিল। হযরত উমর (রা) বললেন, তাকে যিহারের কাফ্‌ফারা দিতে হবে।

মালেকী এবং হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীগণও এ কথাই বলেন। এর সাথে তারা অতিরিক্ত এতটুকু সংযোজিত করেন যে, যদি নির্দিষ্ট করে কোন মহিলার কথা না বলে এভাবে বলে যে, সমস্ত নারীই আমার জন্য এরূপ, এমতাবস্থায় সে যে নারীকেই বিয়ে করুক না কেন তাকে স্পর্শ করার আগেই কাফ্‌ফারা দিতে হবে। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়েব, উরওয়া ইবনে যুবায়ের, আতা ইবনে আবী রাবাহ, হাসান বাসরী এবং ইসহাক ইবনে রাহাবিয়া এমতটিই পোষণ করেছেন।

শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহদের মতে, বিয়ের পূর্বে যিহার অর্থহীন। ইবনে আব্বাস এবং কাতাদাও এ মতটিই পোষণ করেন।

পাঁচ ঃ যিহার কি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত হতে পারে? হানাফী এবং শাফেয়ী মাযহাবের ফকীহদের মতে, কেউ যদি নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করে যিহার করে তাহলে সেই সময়ের মধ্যে স্ত্রীকে স্পর্শ করলে কাফ্‌ফারা দিতে হবে। তবে সেই সময় অতিক্রান্ত হলে যিহার অকার্যকর হয়ে পড়বে। এর প্রমাণ সালামা ইবনে সাখার বায়াদীর ঘটনা। তিনি তাঁর স্ত্রীর সাথে রমযান মাসের জন্য যিহার করেছিলেন কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম তাকে বলেননি যে, সময় নির্দিষ্ট করা অর্থহীন। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক এবং ইবনে আবী লায়লা বলেন ঃ যিহার যখনই করা হোক না কেন তা সব সময়ের জন্য হবে। এক্ষেত্রে সময় নির্দিষ্ট করার কোন কার্যকারিতা থাকবে না। কারণ, যে 'হুরমত' কার্যকর হয়েছে সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সাথে সাথে তা আপনা থেকেই শেষ হয়ে গিয়েছে।

ছয় ঃ শর্তযুক্ত যিহার করা হয়ে থাকলে যখনই শর্ত ভঙ্গ হবে কাফ্‌ফারা দিতে হবে। যেমন ঃ কেউ যদি স্ত্রীকে বলে, "আমি যদি ঘরে প্রবেশ করি তাহলে তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত" এমতাবস্থায় সে যখনই ঘরে প্রবেশ করবে কাফ্‌ফারা আদায় করা ছাড়া সে স্ত্রীকে স্পর্শ করতে পারবে না।

সাত ঃ একই স্ত্রীর উদ্দেশ্যে কয়েকবার যিহারের শব্দাবলী বলা হয়ে থাকলে তা একই বৈঠকে বলা হয়ে থাক বা ভিন্ন ভিন্ন বৈঠকে বলা হয়ে থাক, সর্বাবস্থায়ই তা যতবার বলা হয়েছে ততবার কাফ্‌ফারা দিতে হবে। তবে যিহারের শব্দাবলী ব্যবহারকারী যদি তা একবার ব্যবহার করার পর শুধু পূর্বের কথার ওপর জোর দেয়ার উদ্দেশ্যে তা বারবার বলে তাহলে ভিন্ন কথা। পক্ষান্তরে ইমাম মালেক ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল বলেন ঃ কথাটি বারবার বলার নিয়তে বলা হোক কিংবা জোর দেয়ার জন্য বলা হোক, যতবারই বলা হোক না কেন সেজন্য একবারই কাফ্‌ফারা দিতে হবে।। শা'বী, তাউস, আতা ইবনে আবী রাবাহ, হাসান বাসরী এবং আওযায়ী রাহিমাহুমুল্লাহ এ মতেরই অনুসারী। এ বিষয়ে হযরত আলীর ফতোয়া হলো, কথাটি যদি একই বৈঠকে বার বার বলা হয়ে থাকে তাহলে সেজন্য একবার মাত্র কাফ্‌ফারা দিতে হবে। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন বৈঠকে বলা হলে যত সংখ্যক বৈঠকে বলা হয়েছে ততবার কাফ্‌ফারা দিতে হবে। এটি কাতাদা এবং আ'মর ইবনে দীনারেরও মত।

আট ঃ দুই বা দু'য়ের অধিক সংখ্যক স্ত্রীর সাথে একসাথে যিহার করা হলে, যেমন ঃ স্বামী তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বললো যে, তোমরা আমার জন্য ঠিক আমার মায়ের পিঠের মত, তাহলে হানাফী ও শাফেয়ীদের মতে, প্রত্যেককে হালাল করার জন্য আলাদা আলাদা কাফ্‌ফারা দিতে হবে। এটি হযরত 'উমর (রা), হযরত আলী (রা), উরওয়া ইবনে যুবায়ের, তাউস, আতা, হাসান বাসরী, ইবরাহীম নাখয়ী, সুফিয়ান সাওরী এবং ইবনে শিহাব যুহরীর মত। ইমাম মালেক (র) এবং ইমাম আহমদ (র) বলেন, এক্ষেত্রে সবার জন্য একবারই কাফ্‌ফারা দিতে হবে। রাবীয়া, আওযায়ী, ইসহাক ইবনে রাহাবিয়া এবং আবু সাওরও এমতের অনুসারী।

নয় ঃ কেউ যদি এক যিহারের কাফ্‌ফারা দেয়ার পর পুনরায় যিহার করে বসে তাহলে পুনরায় কাফ্‌ফারা দেয়া ছাড়া স্ত্রী তার জন্য হালাল হবে না।

দশ ঃ কেউ যদি কাফ্‌ফারা দেয়ার আগেই স্ত্রীকে স্পর্শ করে বসে তাহলে চার ইমামের মতে, যদিও একাজ গোনাহ কিন্তু তাকে একটি কাফ্‌ফারাই দিতে হবে। তবে তার ক্ষমা প্রার্থনা করা উচিত এবং পুনরায় এ কাজ না করা উচিত। রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে যারা এরূপ করেছিল তিনি তাদের বলেছিলেন ক্ষমা প্রার্থনা করো এবং যতক্ষণ কাফ্‌ফারা না দিবে ততক্ষণ স্ত্রী থেকে আলাদা থাকো। কিন্তু এজন্য তিনি যিহারের কাফ্‌ফারা ছাড়া আর কোন কাফ্‌ফারা দিতে হবে বলে নির্দেশ দেননি।

হযরত আমর ইবনুল আস, কাবিসা ইবনে যুয়াইব, সাঈদ ইবনে জুবায়ের, যুহরী এবং কাতাদা বলেন, তাকে দুইটি কাফ্ফারা দিতে হবে। এবং হাসান বাসরী ও ইবরাহীম নাখয়ীর মতে তিনটি কাফ্ফারা দিতে হবে। এ বিষয়ে যেসব হাদীসে নবীর (সা) ফায়সালা বর্ণিত হয়েছে উক্ত মনিষীদের কাছে সম্ভবত সে সব হাদীস পৌছেনি।

এগার ঃ স্ত্রীকে কাদের সাথে তুলনা করলে যিহার হবে? এ বিষয়ে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে ঃ

আমের শা'বী বলেন, কেবলমাত্র মায়ের সাথে তুলনা করলেই যিহার হবে। জাহেরিয়াগণ বলেন ঃ মায়েরও শুধু পিঠের সাথে তুলনা করলে যিহার হবে। অন্য কোন কথার ওপর এ নির্দেশ প্রযোজ্য হবে না। কিন্তু এ বিষয়ে ফিকাহবিদদের কোন গোষ্ঠীই তাঁর সাথে ঐকমত্য পোষণ করেননি। কারণ, মায়ের সাথে স্ত্রীর তুলনা করাকে কুরআন কর্তৃক গোনাহর কাজ বলার কারণ হলো, এটা একটা চরম অর্থহীন ও মিথ্যা কথা। এখন একথা সুস্পষ্ট যে, যেসব নারী মায়ের মতই হারাম, তাদের সাথে স্ত্রীকে তুলনা করা অর্থহীনতা ও মিথ্যাবাদিতার দিক থেকে এর চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তাই মায়ের সাথে তুলনা করার ক্ষেত্রে যে বিধান প্রয়োজ্য এ ক্ষেত্রেও সেই একই বিধান প্রযোজ্য না হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না।

হানাফীদের মতে যেসব নারী বংশ, দুগ্ধদান অথবা দাম্পত্য সম্পর্কের কারণে কারো জন্য চিরস্থায়ী হারাম তারা সবাই এ বিধানের অন্তরভুক্ত। কিন্তু যেসব নারী অস্থায়ীভাবে হারাম এবং যে কোন সময় হালাল হতে পারে তারা এর অন্তরভুক্ত না। যেমন, স্ত্রীর বোন, খালা, ফুফু অন্যান্য নারী যারা তার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ নয়। চিরস্থায়ী হারাম মহিলাদের মধ্য থেকে কোন মহিলার যে অংগের প্রতি দৃষ্টিপাত করা কারো জন্য হালাল নয় তার সাথে তুলনা করাই যিহার বলে গণ্য হবে। তবে স্ত্রীর হাত, পা, মাথা, চুল, দাঁত ইত্যাদিকে চিরস্থায়ী হারাম নারীর পিঠের সাথে অথবা স্ত্রীকে তার মাথা, হাত ও পায়ের মত দৈহিক অংগ-প্রত্যাংগের সাথে তুলনা করা যিহার বলে গণ্য হবে না। কারণ, মা ও বোনের এসব অংগ প্রত্যাংগের প্রতি তাকানো হারাম নয়। অনুরূপভাবে তোমার হাত আমার মায়ের হাতের মত অথবা তোমার পা আমার মায়ের পায়ের মত বলায় যিহার হবে না।

শাফেয়ীদের মতে, কেবল সেসব নারীই এ নির্দেশের অন্তরভুক্ত হবে যারা চিরদিন হারাম ছিল এবং চিরদিন হারাম থাকবে। অর্থাৎ মা, বোন, মেয়ে ইত্যাদি। কিন্তু যেসব নারী কোন সময় হালাল ছিল যেমন, দুধ মা, দুধ বোন, শাশুড়ী এবং পুত্রবধু অথবা যে সব নারী কোন সময় হালাল হতে পারে যেমন শ্যালিকা। এসব বিশেষ কারণে হারাম বা সাময়িক ও অস্থায়ী হারাম নারী ছাড়া স্থায়ী হারাম নারীদের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা দেখানোর জন্য সাধারণত যে সব অংগের কথা উল্লেখ করা হয় না স্ত্রীকে যদি সেসব অংগের সাথে তুলনা করা হয় তাহলে সে ক্ষেত্রে তা যিহার বলে গণ্য হবে। তবে যেসব অংগ- প্রত্যাংগের উল্লেখ সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য করা হয় তার সাথে তুলনা করা কেবল তখনই যিহার হবে যখন তা যিহারের নিয়তে বলা হবে। যেমন, স্ত্রীকে একথা বলা তুমি আমার মায়ের চোখ অথবা জানের মত অথবা মার হাত অথবা পা অথবা পেটের মত, অথবা মায়ের পেট অথবা বক্ষস্থলের সাথে স্ত্রীর পেট অথবা বক্ষস্থলের সাথে তুলনা

করা, অথবা স্ত্রীর মাথা, পিঠ অথবা হাতকে নিজের জন্য মায়ের হাতের মত মনে করা, অথবা স্ত্রীকে একথা বলা যে, তুমি আমার জন্য আমার মায়ের মত। এসব কথা যদি যিহারের নিয়তে বলা হয়ে থাকে তাহলে যিহার হবে, আর যদি সম্মান দেখানোর নিয়তে বলা হয়ে থাকে তাহলে সম্মান প্রদর্শনই হবে।

মালেকীগণ বলেন, যেসব নারী পুরুষের জন্য হারাম তাদের সাথে স্ত্রীকে তুলনা করাই যিহার। এমন কি তাদের মতে, স্বামী যদি স্ত্রীকে বলে, তুমি আমার জন্য অমুক পরনারীর পিঠের মত তাহলে তাও যিহারের সংজ্ঞায় পড়ে। তারা আরো বলেন, মা এবং চিরস্থায়ী হারাম মহিলাদের কোন অংগের সাথে স্ত্রীকে কিংবা স্ত্রীর কোন অংগকে তুলনা করা যিহার। এক্ষেত্রে এমন কোন শর্ত নেই যে, সেসব অংগ এমন হতে হবে যার প্রতি দৃষ্টিপাত করা হালাল নয়। কারণ স্ত্রীর প্রতি যেভাবে দৃষ্টিপাত করা হয় সেভাবে মায়ের কোন অংগের প্রতিই দৃষ্টিপাত করা হালাল নয়।

হাম্বলী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ হারাম মহিলাদের সবাইকে এ নির্দেশের অন্তরভুক্ত বলে মনে করেন। তারা চাই স্থায়ী হারাম হোক অথবা ইতিপূর্বে কখনো হালাল ছিল এখন চিরদিনের জন্য হারাম হয়ে গিয়েছে। যেমন ঃ শাশুড়ী ও দুধমা। তবে যেসব মহিলা পরবর্তী কোন সময় হালাল হতে পারে যেমন ঃ শ্যালিকা। তাদের ব্যাপারে ইমাম আহমদের একটি মত হলো, তাদের সাথে তুলনা করাও যিহার হবে। দ্বিতীয় মতটি হলো, তাদের সাথে তুলনা করলে যিহার হবে না। তাছাড়াও হাম্বলী মাযহাবের অনুসারীদের মতে স্ত্রীর কোন অংগকে হারাম মেয়েদের কোন অংগের সাথে তুলনা করা যিহারের সংজ্ঞায় পড়ে। তবে চুল, নখ ও দাঁতের মত শরীরের অস্থায়ী অংগসমূহ এ নির্দেশের বহির্ভূত।

বার ঃ এ ব্যাপারে সমস্ত ফিকাহবিদগণ একমত যে, কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে, "তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত" তাহলে তা স্পষ্ট যিহার হবে। কারণ, আরবদের মধ্যে এটাই যিহারের নিয়ম হিসেবে প্রচলিত ছিল। আর এ বিষয়টি সম্পর্কেই কুরআনের নির্দেশ নাযিল হয়েছে। অন্য সব বাক্যের কোন্‌টি দ্বারা স্পষ্ট যিহার হবে আর কোন্‌টি দ্বারা যিহার হবে না, বরং সেক্ষেত্রে যিহার হওয়া না হওয়ার সিদ্ধান্ত বক্তার নিয়ত অনুসারে করা হবে। এ ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মধ্যে মতভেদ আছে।

হানাফীদের মতে, যেসব বাক্য দ্বারা হালাল নারীকে (স্ত্রী) স্পষ্টভাবে হারাম নারীর (স্থায়ী হারাম নারীদের কোন একজন) সাথে তুলনা করা হয়েছে, অথবা যে অংগের দিকে দৃষ্টিপাত করা হালাল নয় এমন অংগের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যেমন, কেউ তার স্ত্রীকে বললো ঃ তুমি আমার জন্য মা অথবা অমুক হারাম নারীর পেট অথবা উরুর মত। এছাড়া অন্য সব বাক্য সম্পর্কে মতভেদ করার অবকাশ আছে। কেউ যদি বলে ঃ "তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত হারাম। ইমাম আবু হানীফার মতে এটা স্পষ্ট যিহার। কিন্তু ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে এক্ষেত্রে যিহারের নিয়ত থাকলে যিহার হবে এবং তালাকের নিয়ত থাকলে তালাক হবে। যদি বলে, তুমি যেন আমার মা অথবা আমার মায়ের মত তাহলে এক্ষেত্রে সাধারণভাবে হানাফীদের ফতোয়া হলো, যিহারের নিয়তে একথা বলা হয়ে থাকলে যিহার হবে, এবং তালাকের নিয়তে বলা হয়ে থাকলে বায়েন তালাক হবে এবং উদ্দেশ্যহীনভাবে বলা হয়ে থাকলে অর্থহীন

বাক্য হবে। কিন্তু ইমাম মুহাম্মাদের মতে এটা অকাট্যভাবে যিহার। কেউ যদি স্ত্রীকে মা অথবা বোন অথবা কন্যা বলে সম্বোধন করে তাহলে এটা চরম অর্থহীন ও বাজে কথা। এরূপ কথায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ক্রোধ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু তাকে যিহার বলে গণ্য করেন নি। কেউ যদি বলে "তুমি আমার জন্য মায়ের মতই হারাম" যদি যিহারের নিয়তে বলে তাহলে যিহার হবে, তালাকের নিয়তে বললে তালাক হবে। আর কোন নিয়ত না থাকলে যিহার হবে। যদি বলে "তুমি আমার জন্য মায়ের অনুরূপ অথবা মায়ের মত" তাহলে উদ্দেশ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে। যদি সম্মান ও মর্যাদা বুঝানোর জন্য বলে থাকে তাহলে সম্মান মর্যাদা দেখানো বলে গণ্য করা হবে। যিহারের নিয়তে বলা হয়ে থাকলে যিহার হবে। তালাকের নিয়তে বলে থাকলে তালাক হবে। কোন নিয়ত না থাকলে এবং এমনি বলে থাকলে ইমাম আবু হানীফার মতে অর্থহীন কথা হবে, ইমাম আবু ইউসুফের মতে তাকে যিহারের কাফ্‌ফারা দিতে হবে না তবে কসমের কাফ্‌ফারা দিতে হবে এবং ইমাম মুহাম্মাদের মতে যিহার হবে।

শাফেয়ী ফিকাহবিদদের মতে যিহারের স্পষ্ট বাক্য হলো 'তুমি আমার কাছে অথবা আমার সংগে অথবা আমার জন্যে আমার মায়ের পিঠের মত, অথবা তুমি আমার মায়ের পিঠের মত। অথবা তোমার দেহ বা শরীর অথবা তোমার সত্তা আমার জন্য আমার মায়ের দেহ বা শরীর অথবা সত্তার মত। এছাড়া অবশিষ্ট সমস্ত বাক্যের ব্যাপারে বাক্য প্রয়োগকারীর নিয়ত অনুসারে সিদ্ধান্ত হবে।

হাম্বলী ফিকাহবিদদের মতে, কেউ যদি তার স্ত্রীকে অথবা তার স্বতন্ত্র কোন অংগকে বিয়ে করা হারাম এমন কোন মহিলার সাথে অথবা তার দেহের স্বতন্ত্র কোন অংগের সাথে স্পষ্ট ভাষায় তুলনা করে তাহলে তা যিহারের স্পষ্ট বাক্য বলে গণ্য করা হবে। মালেকী মাযহাবের অনুসৃত মতও প্রায় অনুরূপ। তবে বিস্তারিত খুটিনাটিতে গিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ হয়েছে। যেমন কেউ যদি তার স্ত্রীকে বলে। তুমি আমার জন্য আমার মায়ের তুল্য অথবা আমার মায়ের মত তাহলে মালেকীদের মতে যিহারের নিয়ত থাকলে যিহার হবে, তালাকের নিয়ত থাকলে তালাক হবে এবং কোন নিয়ত না থাকলে যিহার হবে। হাম্বলীদের মতে শুধু নিয়তের শর্তে যিহার বলে গণ্য করা যেতে পারে। কোন ব্যক্তি যদি তার স্ত্রীকে বলে তুমি আমার মা। মালেকীদের মতে তা যিহার হবে। হাম্বলীদের মতে ঝগড়া বিবাদ বা ক্রুদ্ধাবস্থায় বলা হয়ে থাকলে যিহার হবে এবং আদর সোহাগপূর্ণ পরিবেশে বলা হয়ে থাকলে তা খুবই খারাপ কথা। কিন্তু তা যিহার হিসেবে গণ্য হবে না। কেউ যদি স্ত্রীকে বলে ঃ তোমাকে তালাক, তুমি আমার মায়ের মত তাহলে হাম্বলীদের মতে এতে তালাক হবে যিহার নয়। তবে যদি বলে ঃ তুমি আমার মায়ের মত, তোমাকে তালাক তাহলে যিহার ও তালাক উভয়টিই হয়ে যাবে। আর যদি বলে ঃ তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত হারাম তাহলে মালেকী ও হাম্বলী উভয় মাযহাবের ফিকাহবিদদের মতে এ বাক্য তালাকের নিয়তে বলা হোক বা আদৌ কোন নিয়ত না থাক এতে যিহার হবে।

যিহারের বাক্য সম্পর্কিত এ আলোচনায় এ বিষয়টি ভালভাবে বুঝতে হবে যে, এ বিষয়ে ফিকাহবিদগণ যত আলোচনা করেছেন তা সবই আরবী ভাষার বাক্য ও বাকরীতি সম্পর্কে। একথা সবারই জানা যে, পৃথিবীর অন্য ভাষাভাষী লোকেরা যিহার করার সময়

আরবী ভাষা ব্যবহার করবে না কিংবা যিহার করার সময় আরবী বাক্য ও বাক্যাংশের হুবহু অনুবাদ উচ্চারণ করবে না। সুতরাং কোন শব্দ বা বাক্যাংশ যিহারের সংজ্ঞায় পড়ে কিনা সে বিষয়ে যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয় তাহলে তা ফিকাহবিদদের বর্ণিত বাক্য–সমূহের কোন্‌টির সঠিক অনুবাদ শুধু সেটিই বিচার বিবেচনা করা ঠিক হবে না বরং শুধু এ বিষয়টি বিবেচনা করতে হবে যে, বক্তা বা শব্দ ব্যবহারকারী ব্যক্তি স্ত্রীকে যৌন (Sexual) সম্পর্কের দিক দিয়ে হারাম নারীদের কারো সাথে সুস্পষ্টভাবে তুলনা করেছে নাকি ঐ সব বাক্যের অন্য কোন অর্থ হওয়ার অবকাশ আছে? আরবী ভাষার أَنْتِ عَلَىَّ كَظَهْرِ أُمِّى (তুমি আমার জন্য আমার মায়ের পিঠের মত) বাক্যটি এর সুস্পষ্ট উদাহরণ। ফিকাহবিদ এবং মুফাসসিরগণ এ বিষয়ে একমত যে, আরবে যিহার করার জন্য এ বাক্যটিই ব্যবহার করা হতো এবং এ বাক্যটি সম্পর্কেই কুরআন মজীদের নির্দেশ নাযিল হয়েছে। সম্ভবত দুনিয়ার কোন ভাষাতেই— উর্দু ভাষা সম্পর্কে তো আমরা অন্তত নিশ্চিতভাবেই বলতে পারি—যিহারকারী কোন ব্যক্তি এমন বাক্য ব্যবহার করতে পারে না যা এই আরবী বাক্যটির হুবহু শাব্দিক অনুবাদ হতে পারে। তবে তারা নিজের ভাষার এমন সব বাক্য অবশ্যই ব্যবহার করতে পারে যার অর্থ অবিকল তাই যা একজন আরব এইটি দ্বারা প্রকাশ করতো। একথাটি বলার অর্থ ছিল, তোমার সাথে সহবাস করা আমার জন্য আমার মায়ের সাথে সহবাস করার মত। অথবা কোন কোন মূর্খ ব্যক্তি তার স্ত্রীকে বলে বসে যে, "আমি যদি তোমার কাছে যাই তাহলে যেন আমার মায়ের কাছেই গেলাম।"

তের ঃ কুরআন মজীদের যে জিনিসকে কাফ্‌ফারা আবশ্যিক হওয়ার কারণ বলা হয়েছে তা শুধু যিহার করা নয়, বরং যিহারের পরবর্তী عود । অর্থাৎ ব্যক্তি যদি শুধু যিহার করে এবং "عود" না করে তাহলে তাকে কাফ্‌ফারা দিতে হবে না। এখন প্রশ্ন হলো عود কি যা কাফ্‌ফারা দেয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায়? এ ব্যাপারে ফিকাহবিদদের মতামত নিম্নরূপ ঃ হানাফীদের মতে عود অর্থ সহবাস করার ইচ্ছা। তবে তার অর্থ এই নয় যে, শুধু ইচ্ছা বা আকাংখা করলেই কাফ্‌ফারা দেয়া জরুরী হবে। এমন কি ব্যক্তি যদি শুধু ইচ্ছা করেই থেমে থাকে এবং কার্যত কোন পদক্ষেপ না নেয় তাহলেও তাকে কাফ্‌ফারা দিতে হবে, ব্যাপার এমন নয়। বরং এর সঠিক অর্থ হচ্ছে যে ব্যক্তি যিহার করার দ্বারা স্ত্রীর সাথে একান্ত দাম্পত্য সম্পর্কের ব্যাপারে যে 'হুরমত' বা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল প্রথমে কাফ্‌ফারা তা দূর করে। কারণ এই 'হুরমত' বা নিষেধাজ্ঞা কাফ্‌ফারা দেয়া ছাড়া দূরীভূত হতে পারে না।

এ বিষয়ে ইমাম মালেকের (র) তিনটি মত আছে। তবে এ ব্যাপারে ওপরে হানাফীদের যে মত বর্ণিত হয়েছে সেটিই মালেকীদের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ ও বিশুদ্ধতম মত। তাঁদের মতে যিহার দ্বারা স্বামী নিজের জন্য যে জিনিসটি হারাম করে নিয়েছিল তা হচ্ছে স্ত্রীর সাথে সহবাসের সম্পর্ক। এরপর عود করা অর্থ পুনরায় তার সাথে সেই সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ফিরে যাওয়া।

এ বিষয়ে ওপরে দুই ইমামের যে মতামত বর্ণনা করা হয়েছে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের (র) মতও প্রায় অনুরূপ বলে ইবনে কুদামা উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেনঃ যিহার করার পর সহবাস হালাল হওয়ার জন্য কাফ্‌ফারা দেয়া শর্ত। যিহারকারী যে ব্যক্তিই তা হালাল করতে চায় সে যেন হারাম করে নেয়া থেকে ফিরতে চায়। তাই তাকে নির্দেশ

দেয়া হয়েছে যে, হালাল করে নেয়ার পূর্বে সে যেন কাফ্ফারা আদায় করে। কোন ব্যক্তি কোন নারীকে নিজের জন্য হালাল করে নিতে চাইলে তাকে হালাল করার পূর্বে যেমন বিয়ে করতে বলা হবে এটা যেন ঠিক তাই।

ইমাম শাফেয়ীর (র) মত এ তিনটি মতামত থেকে ভিন্ন। তিনি বলেন ঃ কারো নিজের স্ত্রীর সাথে যিহার করার পর তাকে পূর্বের মত স্ত্রী হিসেবে রাখা, কিংবা অন্য কথায় তাকে স্ত্রী হিসেবে কাছে রাখাটাই عود । কারণ, সে যে সময় যিহার করেছে সে সময় থেকেই যেন তাকে স্ত্রী হিসেবে রাখা হারাম করে নিয়েছে। সুতরাং সে যদি যিহার করার সাথে সাথেই তালাক না দিয়ে থাকে এবং তালাকের শব্দগুলো উচ্চারণ করার মত সময়টুকু পর্যন্ত তাকে স্ত্রী হিসেবে রাখে তাহলে সে عود করলো এবং তার ওপর কাফ্ফারা দেয়া ওয়াজিব হয়ে গেল। এর অর্থ হচ্ছে, কেউ এক নিশ্বাসে যিহার করার পর পরবর্তী নিশ্বাসেই যদি তালাক না দেয় তাহলে কাফ্ফারা ওয়াজিব হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে পরে তাকে স্ত্রী হিসেবে না রাখার এবং দাম্পত্য সম্পর্ক রক্ষা না করার সিদ্ধান্ত না হলেও কিছু এসে যায় না। এমন কি এর পর সে কয়েক মিনিট চিন্তাভাবনা করে যদি সে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে ইমাম শাফেয়ীর (র) মতানুসারে তবুও তাকে কাফ্ফারা দিতে হবে।

চৌদ্দ ঃ কুরআনের নির্দেশ হচ্ছে, স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে "مسس" করার পূর্বেই যিহারকারীকে কাফ্ফারা দিতে হবে। এ আয়াতে উল্লেখিত "مسس" শব্দের অর্থ স্পর্শ করা এ বিষয়ে চার ইমামই একমত। সুতরাং কাফ্ফারা দেয়ার পূর্বে শুধু সহবাসই হারাম নয় বরং স্বামী কোনভাবেই স্ত্রীকে স্পর্শ করতে পারবে না। শাফেয়ী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ বলেনঃ যৌন ইচ্ছা সহ স্পর্শ করা হারাম। হাম্বলী মাযহাবের ফিকাহবিদগণ সব রকম উপভোগকেই হারাম বলেন। মালেকী ফিকাহবিদগণ স্ত্রীর দেহের প্রতি কামনার দৃষ্টিতে তাকানোও না জায়েজ বলেন। তাঁদের মতে এ অবস্থায় কেবল মুখমণ্ডল ও হাতের দিকে তাকানো যেতে পারে।

পনের ঃ যিহার করার পর স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দেয়, তাহলে 'রিজয়ী' তালাকের ক্ষেত্রে 'রুজু' করার পরও কাফ্ফারা দেয়া ছাড়া স্বামী স্ত্রীকে স্পর্শ করতে পারবে না। বায়েন তালাক হওয়ার ক্ষেত্রে সে যদি তাকে পুনরায় বিয়ে করে তখনও স্পর্শ করার পূর্বে কাফ্ফারা দিতে হবে। এমনকি যদি তিন তালাকও দিয়ে থাকে এবং স্ত্রী অন্য পুরুষের সাথে বিবাহিতা হওয়ার পর বিধবা অথবা তালাক প্রাপ্তা হয় এবং তারপর যিহারকারী স্বামী তাকে নতুন করে বিয়ে করে, তাহলেও কাফ্ফারা ছাড়া সে তার জন্য হালাল হবে না। কেননা, মা বা অন্যান্য চিরনিষিদ্ধ মহিলাদের সাথে স্ত্রীর সাদৃশ্য বর্ণনা করে সে ইতিপূর্বে একবার তাকে নিজের ওপর হারাম বা নিষিদ্ধ করে নিয়েছে। কাফ্ফারা ছাড়া সেই হারাম বা নিষিদ্ধাবস্থার অবসান ঘটা সম্ভব নয়। চার ইমামের সকলেই এ ব্যাপারে একমত।

ষোল ঃ যে স্বামী স্ত্রীর সাথে যিহার করেছে কাফ্ফারা না দেয়া পর্যন্ত তাকে তার শরীর স্পর্শ করতে না দেয়া স্ত্রীর কর্তব্য। যেহেতু দাম্পত্য সম্পর্ক চালু থাকা স্ত্রীর একটি অধিকার বিশেষ এবং তা থেকে স্বামী তাকে বঞ্চিত করেছে, তাই সে যদি কাফ্ফারা না দেয় তবে স্ত্রী আদালতের আশ্রয় নিতে পারে। আদালত তার স্বামীকে সে বাধা অপসারণে

বাধ্য করবে। যা সে নিজের ও তার স্ত্রীর মাঝখানে দাঁড় করিয়েছে। আর যদি সে তা না মানে, তবে আদালত তাকে প্রহার বা কারাদণ্ড বা উভয় প্রকারের দণ্ড দিতে পারে। চার মাযহাবেই এ ব্যাপারে পূর্ণ মতৈক্য রয়েছে। তবে পার্থক্য শুধু এই যে, হানাফী মাযহাবে স্ত্রীর জন্য আদালতের সরণাপন্ন হওয়া ছাড়া আর কোন পথ খোলা নেই। আদালত যদি স্ত্রীকে এ সংকট থেকে উদ্ধার না করে তবে সে আজীবন ঝুলন্ত অবস্থায়ই থেকে যাবে। কেননা, হানাফী মাযহাব অনুসারে যিহার দ্বারা বিয়ে বাতিল হয় না, কেবল স্বামীর সংগমের অধিকার রহিত হয়। মালেকী মাযহাবে স্বামী যদি স্ত্রীকে নির্যাতন করার জন্য যিহার করে ঝুলিয়ে রাখে। তাহলে সে ক্ষেত্রে "ইলার" বিধান বলবত হবে। অর্থাৎ সে চার মাসের বেশী স্ত্রীকে আটকে রাখতে পারে না। ("ইলা"র বিধান তাফহীমুল কুরআন, সূরা বাকারা ২৪৫ থেকে ২৪৭ টীকায় দ্রষ্টব্য।) আর শাফেয়ী মাযহাবে যদিও স্বামী কেবল নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য যিহার করলেই এবং সে মেয়াদ চার মাসের বেশী হলেই ইলার বিধান কার্যকর হবে। কিন্তু যেহেতু শাফেয়ী মাযহাবে স্বামী স্ত্রীর সাথে দাম্পত্য সম্পর্ক বজায় রাখলেই কাফ্ফারা দিতে হয়। তাই তার পক্ষে দীর্ঘদিন পর্যন্ত স্ত্রীকে ঝুলন্ত রাখা সম্ভব হয় না।

সতের ঃ কুরআন ও হাদীসে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়েছে যে, যিহারের প্রথম কাফ্ফারা হচ্ছে দাস মুক্ত করা। এটা করতে অসমর্থ হলেই দু'মাস ব্যাপী রোযা রাখা এবং তাতেও অসমর্থ হলে ৬০ জন দরিদ্র মানুষকে আহার করানো যেতে পারে। কিন্তু কেউ যদি এ তিন ধরনের কাফ্ফারার কোনটাই দিতে সমর্থ না হয় তাহলে শরীয়াতে কাফ্ফারার অন্য কোন ব্যবস্থা না থাকা হেতু সে যতক্ষণ পর্যন্ত এ তিন ধরনের কাফ্ফারার কোন একটি দেয়ার সামর্থ লাভ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে অপেক্ষা করতে হবে। তবে হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, এ ধরনের ব্যক্তি যাতে তৃতীয় কাফফারাটি দিতে পারে সে জন্য তাকে সাহায্য করা উচিত। যারা নিজেদের ভুলের কারণে এরূপ সমস্যার জালে আটকা পড়েছিল, এবং এ তিন প্রকারের কাফ্ফারার কোনটাই দিতে সমর্থ ছিল না, তাদেরকে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বাইতুল মাল থেকে সাহায্য করেছিলেন।

আঠার ঃ পবিত্র কুরআনে কাফ্ফারা হিসেবে যে কোন পরাধীন মানুষকে মুক্ত করার আদেশ দেয়া হয়েছে চাই সে দাস হোক অথবা দাসী হোক। এ ক্ষেত্রে দাস-দাসীর বয়সেরও কোন কড়াকড়ি নেই। দুধ খাওয়া শিশুও যদি গোলামীতে আবদ্ধ হয়ে থাকে তবে তার মুক্তির ব্যবস্থা করাও কাফ্ফারার জন্য যথেষ্ট। তবে মুসলিম ও অমুসলিম উভয় ধরনের দাস-দাসী মুক্ত করা চলবে, না শুধু মুসলিম দাস-দাসী মুক্ত করতে হবে, সে ব্যাপারে মুসলিম ফকীহগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। হানাফী ও যাহেরী মাযহাবের মতানুসারে দাস-দাসী মুসলিম কিংবা অমুসলিম যাই হোক না কেন, তাকে মুক্ত করা যিহারের কাফ্ফারার জন্য যথেষ্ট হবে। কেননা কুরআন শরীফে শর্তহীনভাবে কেবল পরাধীন মানুষকে মুক্ত করতে বলা হয়েছে। তাকে মুসলমানই হতে হবে, একথা বলা হয়নি। পক্ষান্তরে শাফেয়ী, মালেকী ও হাম্বলী মাযহাব এ দাস-দাসীর মুসলমান হওয়ার শর্ত আরোপ করে। অন্য যেসব কাফ্ফারায় কুরআন শরীফে শুধুমাত্র মুসলিম দাস-দাসীকে মুক্ত করতে বলা হয়েছে। আলোচ্য কাফ্ফারাকেও এ তিন মাযহাবে সেসব কাফ্ফারার সমপর্যায়ের বলে কিয়াস করা হয়েছে।

উনিশ ঃ দাস–দাসী মুক্ত করা সম্ভব না হলে কুরআনের বিধান হলো, স্বামী স্ত্রী কর্তৃক পরস্পরকে স্পর্শ করার আগেই যিহারকারীকে এক নাগাড়ে দু'মাস রোযা রাখতে হবে। আল্লাহর এ আদেশ বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিধিমালা বিভিন্ন মাযহাবে নিম্নরূপ ঃ

(ক) এ ব্যাপারে সকলে একমত যে, মাস বলতে এখানে চন্দ্র মাস বুঝানো হয়েছে। চাঁদ ওঠা থেকে যদি রোযা রাখা শুরু করা হয়, তবে দু'টি চন্দ্র মাস পূর্ণ করতে হবে। আর যদি মাসের মধ্যবর্তী কোন তারিখ থেকে শুরু করা হয়, তাহলে হানাফী ও হাম্বলী মাযহাব অনুসারে ষাটদিন রোযা রাখতে হবে। শাফেয়ী মাযহাবের মত এই যে, প্রথম এবং তৃতীয় মাসে সর্বমোট ৩০ দিন রোযা রাখতে হবে। আর মাঝখানের চন্দ্রমাসটি ২৯ দিনের হোক বা ৩০ দিনের হোক—সে মাস রোযা রাখলেই চলবে।

(খ) হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাব অনুসারে রোযা এমন সময় শুরু করতে হবে, যাতে মাঝখানে রমযান, ঈদ কিংবা আইয়ামে তাশরীক না পড়ে। কেননা কাফ্‌ফারার রোযা চলাকালে রমযানের রোযা রাখায় এবং ঈদ ও আইয়ামে তাশরীকে রোযার বিরতি দেয়ায় দু'মাস রোযা রাখার ধারাবাহিকতা ব্যাহত হবে এবং আবার নতুন করে রোযা রাখতে হবে। হাম্বলী মাযহাবের মত এই যে, রমযানের রোযা রাখা ও নিষিদ্ধ দিনের রোযায় বিরতি দেয়ায় ধারাবাহিকতা ব্যাহত হয় না

(গ) দু'মাস রোযা রাখার মাঝে যে কোন ওজরের কারণে অথবা বিনা ওজরে রোযা ভাংলেই হানাফী ও শাফেয়ী মাযহাব অনুসারে ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হবে এবং আবার গোড়া থেকে রোযা রাখা শুরু করতে হবে। ইমাম মুহাম্মাদ বাকের, ইবরাহীম নাখয়ী, সাঈদ বিন জুবায়ের এবং সুফিয়ান সাওরীর অভিমতও অনুরূপ। ইমাম মালেক এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বলের মতে রোগ বা সফরের কারণে মাঝখানে রোযায় বিরতি দেয়া চলে। এতে ধারাবাহিকতা নষ্ট হবে না। তবে বিনা ওজরে রোযায় বিরতি দিলে ধারাবাহিকতা বিনষ্ট হয়। শেষোক্ত ইমাম দ্বয়ের যুক্তি এই যে, কাফ্‌ফারার রোযার গুরুত্ব রমযানের ফরয রোযার গুরুত্বের চেয়ে বেশী নয়। রমযানের রোযা যদি ওজর বশত ছাড়া যায়। তাহলে কাফ্‌ফারার রোযায় বিরতি দেয়া যাবে না এমন কোন কারণ নেই। অন্য যারা এ অভিমত পোষণ করেন তাঁরা হচ্ছেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস, হাসান বাসরী, আতা বিন আবী রাবাহ, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, আমর বিন দীনার, শা'বী, তাউস, মুজাহিদ, ইসহাক বিন রাহওয়াই, আবু উবাইদ এবং আবু সাওর।

(ঘ) দু'মাস ব্যাপী রোযা চলতে থাকাকালে যিহারকারী যদি তার যিহারকৃত স্ত্রীর সাথে সংগম করে বসে, তা সকল ইমামের সর্বসম্মত মত এই যে, এ দ্বারা ধারাবাহিকতা নষ্ট হয়ে যাবে এবং নতুন করে রোযা রাখতে হবে। কেননা স্পর্শ করার আগেই দু'মাস রোযা রাখার আদেশ দেয়া হয়েছে।

বিশ ঃ কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে তৃতীয় কাফ্‌ফারাটি (৬০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে আহার করানো) শুধুমাত্র সে ব্যক্তিই দিতে পারে যার দ্বিতীয়টি দেয়ার সামর্থ নেই। (অর্থাৎ দু'মাস ব্যাপী রোযা রাখা) এ বিধিটি বাস্তবায়নের জন্য ফকীহগণ যে বিস্তারিত নিয়মপদ্ধতি রচনা করেছেন তা নিম্নরূপ ঃ

(ক) চার ইমামের মতে রোযা রাখতে অসমর্থ হওয়ার অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির হয় বার্ধক্যের কারণে, নচেত রোগব্যাধির কারণে অথবা এক নাগাড়ে দু'মাস যৌন সংগম থেকে সংযত থাকতে না পারা ও এ সময়ের মধ্যে ধৈর্য হারিয়ে বসার আশংকার কারণে অক্ষম হওয়া। এ তিনটি ওজরই যে সঠিক এবং শরীয়াতে গ্রহণযোগ্য, সে কথা হযরত আওস বিন সাবেত আনসারী এবং সালমা বিন সাখর বায়াজীর বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে প্রমাণিত। তবে রোগ সম্পর্কে ফকীহগণের মধ্যে সামান্য কিছু মতভেদ রয়েছে। হানাফী ফকীহগণের মতে, যে রোগে আরোগ্যলাভের আশা নেই অথবা রোযার কারণে রোগ বেড়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে কেবল সে রোগ ওজর হিসেবে গ্রহণযোগ্য। শাফেয়ী ফকীহগণ বলেন, রোযার কারণে যদি এত কঠিন শারীরিক পরিশ্রম হয় যে, দু'মাসের মাঝখানেই রোযার ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন হবার আশংকা থাকে, তাহলে সেটিও একটি সঠিক ওজর বলে বিবেচিত হতে পারে। মালেকী মাযহাবের ফকীহগণের মতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি যদি নিজের সম্পর্কে প্রবলভাবে আস্থাশীল হয় যে, ভবিষ্যতে রোযা রাখতে সক্ষম হবে তাহলে তার অপেক্ষা করা উচিত। আর যদি প্রবলতর ধারণা এটাই হয় যে, আর কখনো রোযা রাখার সামর্থ ফিরে পাবে না, তাহলে দরিদ্র লোকদেরকে আহার করিয়ে দেয়া উচিত। হাম্বলী মাযহাবের মতে রোযার কারণে রোগ বৃদ্ধির আশংকা ওজর হিসেবে যথেষ্ট।

(খ) শুধুমাত্র সেসব দরিদ্র ব্যক্তিকে আহার করানো যাবে, যাদের ভরণ-পোষণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির দায়ভুক্ত নয়।

(গ) হানাফী ফকীহগণের মত এই যে, মুসলিম ও অমুসলিম উভয় ধরনের নাগরিককেই আহার করানো চলবে। তবে যুদ্ধরত ও আশ্রয়প্রার্থী অমুসলিমদেরকে আহার করানো যাবে না। মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব অনুসারে শুধুমাত্র মুসলিম দরিদ্রদেরকেই আহার করানো যাবে।

(ঘ) আহার করানো দ্বারা যে দু'বার পেট ভরে খাওয়ানো বুঝায়, সে ব্যপারে কারো দ্বিমত নেই। তবে কিভাবে খাওয়াতে হবে তা নিয়ে মতভেদ আছে। হানাফী মতে দু'বার পেট পুরে খাওয়ার মত খাদ্য শস্য দিয়ে দেয়া অথবা রান্না বান্না করে দু'বেলা খাইয়ে দেয়া দু'টোই শুদ্ধ। কেননা কুরআন শরীফে "ইত্'য়া'ম" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে এবং এর অর্থ খাবার দেয়া এবং খাওয়ানো দু'টোই। তবে মালেকী, শাফেয়ী ও হাম্বলী মাযহাব রান্না করে খাওয়ানো শুদ্ধ মনে করে না বরং খাদ্য শস্য প্রদান করাই সঠিক মনে করে। খাদ্য শস্য দেয়ার ক্ষেত্রে এ বিষয়টি সর্বসম্মত যে, স্থানীয়ভাবে যেটি জনসাধারণের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত খাদ্য সেটিই দিতে হবে এবং সকল দরিদ্র ব্যক্তিকে সমপরিমাণ দিতে হবে।

(ঙ) হানাফী মতানুসারে একই দরিদ্র ব্যক্তিকে যদি ৬০ দিন ব্যাপী খাবার দেয়া হয় তবে তাও সঠিক হবে। তবে একই দিন তাকে ৬০ দিনের খোরাক দেয়া শুদ্ধ নয়। অন্য তিন মাযহাবে একই দরিদ্র ব্যক্তিকে খাবার দেয়া সঠিক মনে করা হয় না। তাদের মতে ৬০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকেই দিতে হবে। ৬০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে এক বেলার খাবার এবং অন্য ৬০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে আর এক বেলার খাবার দেয়া সকল মাযহাবেই অবৈধ।

(চ) এটাও সকল মাযহাবের মতে অশুদ্ধ যে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ৩০ দিনের রোযা রাখবে আর ৩০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে আহার করাবে। দু'রকমের কাফ্‌ফারার সমাবেশ ঘটানো যাবে না। রোযা রাখতে হলে পুরো দু'মাস এক নাগাড়ে রাখা চাই। খাবার দিতে হলেও ৬০ জন দরিদ্র ব্যক্তিকে দিতে হবে।

(ছ) কাফ্‌ফারা হিসেবে খাওয়ানোর ক্ষেত্রে যদিও কুরআনে এরূপ শব্দ ব্যবহৃত হয়নি যে, এ কাফ্‌ফারাও স্বামী স্ত্রীর পরস্পরকে স্পর্শ করার আগেই সমাধা হওয়া চাই, তথাপি বাক্যের অবস্থান ও প্রেক্ষাপট থেকে বুঝা যায় যে, এ কাফ্‌ফারার ক্ষেত্রেও ঐ শর্তটি বলবত রয়েছে। তাই কাফ্‌ফারার ভোজনপর্ব চলাকালে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির স্ত্রীর কাছে যাওয়া চার ইমামের কেউই বৈধ মনে করেন না। তবে এমন কাণ্ড কেউ যদি ঘটিয়েই বসে, তবে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। হাম্বলী মাযহাব মতে আবার খাওয়াতে হবে। কিন্তু হানাফী মাযহাবে তার প্রয়োজন নেই। কেননা, তাদের মতে এই তৃতীয় কাফ্‌ফারায় সুস্পষ্টভাবে "পরস্পরকে স্পর্শ করার আগে" বলা হয়নি এবং এ কারণে এ ক্ষেত্রে কিছুটা উদারতার অবকাশ রয়েছে।

উল্লিখিত বিধিসমূহ নিম্নোক্ত ফিকাহ শাস্ত্রীয় গ্রন্থাবলী থেকে গৃহীত হয়েছে ঃ

হানাফী ফিকাহ ঃ হিদায়া, ফাতহুল কাদীর, বাদায়িউস–সানায়ে' এবং আহকামুল কুরআন (জাসসাস)

শাফেয়ী ফিকাহ ঃ আল মিনহাজ (নবাবী) তৎসহ মুগনীল মুহতাজ শীর্ষক টীকা। তাফসীরে কাবীর।

মালেকী ফিকাহ ঃ শারহুল কাবীরের ওপর দাসুকীর টীকা, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, আহকামুল কুরআন (ইবনুল আরাবী)

হাম্বলী ফিকাহ ঃ আল্‌ মুগ্‌নী (ইবনে কুদামা)।

জাহেরী ফিকাহ ঃ আল্‌ মুহাল্লা (ইবনে হাযম)।

১২. এখানে "ঈমান আনা" দ্বারা খাঁটি ও একনিষ্ঠ মু'মিন সুলভ আচরণকে বুঝানো হয়েছে। এ আয়াতের সম্বোধন যে, কাফের ও মুশরিকদের প্রতি নয় বরং আগে থেকেই ঈমান আনা মুসলমানদের প্রতি করা হয়েছে, তা সুস্পষ্ট। তাদেরকে শরীয়াতের একটি নির্দেশ প্রদানের পর একথা বলা যে, "তোমরা যাতে আল্লাহ ও তার রসূলের প্রতি ঈমান আনো, সে জন্য তোমাদেরকে এ নির্দেশ দেয়া হচ্ছে" স্পষ্টতই এ তাৎপর্য বহন করে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহর এ আদেশ শ্রবণের পরও প্রাচীন জাহেলী রসম রেওয়াজ মেনে চলতে থাকে, তার এ আচরণ ঈমানের পরিপন্থী। এটা কোন মু'মিনের কাজ নয় যে, আল্লাহ ও তার রসূল যখন তার জন্য জীবনের কোন ব্যপারে কোন আইন নির্ধারণ করে দেন, তখন সে তা বাদ দিয়ে দুনিয়ার অন্য কোন আইন মেনে চলবে কিংবা নিজের প্রবৃত্তির ইচ্ছা ও খায়েশ মোতাবেক কাজ করবে।

১৩. এখানে কাফের অর্থ আল্লাহ ও রসূলকে অস্বীকারকারী নয়। এখানে কাফের শব্দটি দ্বারা সেই ব্যক্তিকে বুঝানো হয়েছে যে আল্লাহ ও রসূলকে মান্য করার স্বীকৃতি ও ঘোষণা দেয়ার পরও একজন কাফেরের উপযোগী আচরণ করতে থাকে। অন্য কথায় এ

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبِتُوا كَمَا كُبِتَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ وَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ ۚ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ۚ أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿٦﴾

যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের বিরোধীতা করে[১৪] তাদেরকে ঠিক সেইভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হবে যেভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের লাঞ্ছিত ও অপমানিত করা হয়েছে।[১৫] আমি পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে সব নির্দেশ নাযিল করেছি। কাফেরদের জন্য রয়েছে অপমানকর শাস্তি।[১৬] (এই অপমানকর শাস্তি হবে) সেই দিন যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে জীবিত করে উঠাবেন এবং তারা কি কাজ করে এসেছে তা জানিয়ে দেবেন। তারা ভুলে গিয়েছে কিন্তু আল্লাহ তাদের সব কৃতকর্ম সযত্নে সংরক্ষণ করেছেন।[১৭] আল্লাহ সব বিষয়ে সর্বাধিক অবহিত।

উক্তির মর্ম এই যে, আল্লাহ ও তার রসূলের আদেশ শোনার পরও নিজের খেয়াল খুশীমত চলা অথবা জাহেলী রীতি প্রথা ও রসম রেওয়াজের অনুসরণ করতে থাকা আসলে কাফেরদের কাজ। সাচ্চা দিলে ঈমান এনেছে এমন কোন ব্যক্তি এ ধরনের আচরণ করতে পারে না। সূরা আলে ইমরানে যেখানে হজ্জ ফরয করার বিধান ঘোষণা করা হয়েছে সেখানেও ঐ ঘোষণাটির অব্যবহিত পর বলা হয়েছে যে,

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

"আর যে ব্যক্তি কুফরি করবে (অর্থাৎ এ আদেশে অমান্য করবে) তার জেনে রাখা উচিত যে, আল্লাহ জগতবাসীর মোটেই মুখাপেক্ষী নন।"

এ উভয় জায়গায় "কুফর" শব্দটির অর্থ এটা নয় যে, যে ব্যক্তি যিহার করার পর কাফ্‌ফারা না দিয়ে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখে, অথবা এরূপ মনে করে যে, যিহার দ্বারাই স্ত্রীর ওপর তালাক কার্যকর হয়ে গেছে অথবা ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হজ্জ করে না, শরীয়াতের আদালত তাকে কাফের ও মুরতাদ ঘোষণা করবে এবং সকল মুসলমান তাকে ইসলাম বহির্ভূত মনে করবে। বরঞ্চ এর অর্থ এই যে, আল্লাহর নিকট এ ধরনের লোকেরা মু'মিন বলে গণ্য হয় না, যারা তার আদেশ নিষেধকে কথা বা কাজের মাধ্যমে প্রত্যাখান করে এবং আল্লাহ মানুষের জন্য কি কি সীমা নির্ধারণ করেছেন, কোন্ কোন্ কাজকে ফরয করেছেন, কোন্ কোন্ জিনিসকে হালাল এবং কোন্ কোন্ জিনিসকে হারাম করেছেন তার কোন ধার ধারে না।

১৪. বিরোধীতা করার অর্থ হলো আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা বা বিধিনিষেধ না মেনে তার পরিবর্তে অন্য কতকগুলো মনগড়া সীমারেখা ও বিধিনিষেধ নির্ধারণ করা।

ইবনে জারীর তাবারী এ আয়াতের তাফসীর করেছেন এভাবে ঃ

ای يخالفون فی حدوده وفرائضه فيجعلون حدودا غير حدوده

"তারা আল্লাহর সীমানা ও তার বিধানসমূহের ব্যাপারে তার বিরোধীতা করে এবং আল্লাহর নির্ধারিত সীমার পরিবর্তে অন্যান্য সীমা নির্ধারণ করে।"

আল্লামা বায়যাবী এর তাফসীর প্রসংগে বলেন ঃ

ای يعادونهما و يشاقونهما او يضعون او يختارون حدودا غير حدودهما -

"আল্লাহ ও তার রসূলের সাথে দুশমনী ও বিবাদে লিপ্ত হয়, অথবা আল্লাহ ও রসূলের নির্ধারিত সীমারেখার পরিবর্তে অন্যান্য সীমারেখা নির্ধারণ করে। অথবা অন্যদের নির্ধারিত সীমারেখাকে মেনে নেয়।"

আল্লামা আলূসী রুহুল মায়ানীতে বায়যাবীর উক্ত তাফসীরের সাথে মতৈক্য প্রকাশ করে শায়খুল ইসলাম সা'দুল্লা চালপীর এই বক্তব্য উদ্বৃত করেছেন যে, "এ আয়াতে সেসব রাজা বাদশাহ ও স্বেচ্ছাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারিত হয়েছে, যারা শরীয়াতের নির্ধারিত আইনবিধির পরপন্থী বহু আইনবিধি প্রবর্তন করেছে এবং তাকে আইন নামে আখ্যায়িত করেছে।" এ প্রসংগে আল্লামা আলূসী শরীয়াতী আইনের মোকাবিলায় মানব রচিত আইনের সাংবিধানিক অসারতা (অর্থাৎ ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সাংবিধানিক অসারতা) সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন ঃ

"সে ব্যক্তিতো নিসন্দেহে কাফের, যে মানব রচিত আইনকে উত্তম ও শরীয়াতের চেয়ে ভালো বলে আখ্যায়িত করে এবং বলে যে, এ আইন অপেক্ষাকৃত বিজ্ঞজনোচিত ও জাতির জন্য অধিকতর উপযোগী। অধিকন্তু তাকে যখন কোন ব্যাপারে বলা হয় যে, শরীয়াতের আদেশ এ ব্যাপারে এরূপ, তখন সে রাগে ফেটে পড়ে। এ ধরনের চরিত্র সম্পন্ন কিছু লোক আমরা দেখেছি, যাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ পড়েছে।"

১৫. মূল আয়াতে ব্যবহৃত শব্দটি হচ্ছে كبت এর অর্থ হচ্ছে লাঞ্ছিত করা, ধ্বংস করা। অভিসম্পাত দেয়া, দরবার থেকে বিতাড়িত করা, ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয়া, অপমানিত করা। আল্লাহর এ উক্তির মর্মার্থ এই যে, আল্লাহ ও তার রসূলের বিরোধীতা এবং তার আইন লংঘনের যে পরিণতি পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতেরা ভোগ করেছে, আজকের মুসলমানদের মধ্য থেকে যারা সে আচরণ করবে তারা সে পরিণতি থেকে কোনমতেই রক্ষা পাবে না। তারাও যখন আল্লাহর শরীয়াতের বিরুদ্ধে নিজেদের মনগড়া আইন অনুসরণ করেছে অথবা অন্যদের কাছ থেকে মানব রচিত আইন গ্রহণ করেছে, তখন তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও অনুকম্পা থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অধিকন্তু এর ফলে তাদের জীবন এমন সব বিভ্রান্তি, অনাচার এবং নৈতিক ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক অপকীর্তি ও

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ۖ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٧﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ ۚ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا ۖ فَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿٨﴾

২ রুকূ'

আল্লাহ যে আকাশ ও পৃথিবীর প্রতিটি জিনিস সম্পর্কে অবগত, সে ব্যাপারে তুমি কি সচেতন নও?[১৮] যখনই তিন ব্যক্তির মধ্যে কোন গোপন কানাঘুষা হয়, তখন সেখানে আল্লাহ অবশ্যই চতুর্থজন হিসেবে উপস্থিত থাকেন। যখনই পাঁচজনের মধ্যে গোপন সলাপরামর্শ হয় তখন সেখানে ষষ্ঠ জন হিসেবে আল্লাহ অবশ্যই বিদ্যমান থাকেন।[১৯] গোপন সলাপরামর্শকারীরা সংখ্যায় এর চেয়ে কম হোক বা বেশী হোক, এবং তারা যেখানেই থাকুক, আল্লাহ তাদের সাথে থাকেন।[২০] তারপর কিয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে জানিয়ে দেবেন তারা কে কি করেছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যাদেরকে কানাঘুষা করতে নিষেধ করা হয়েছিল, তথাপি তারা সে নিষিদ্ধ কাজ করে চলেছে?[২১] তারা লুকিয়ে লুকিয়ে পরস্পরে গোনাহ, বাড়াবাড়ি এবং রসূলের অবাধ্যতার কথাবার্তা বলাবলি করে, আর যখন তোমার কাছে আসে, তখন তোমাকে এমনভাবে সালাম করে যেভাবে আল্লাহ তোমাকে ছালাম করে নি।[২২] আর মনে মনে বলে যে, আমাদের এসব কথাবার্তার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে শাস্তি দেয় না কেন?[২৩] তাদের জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। তারা তাতেই দগ্ধ হবে। তাদের পরিণাম অত্যন্ত শোচনীয়।

পাপাচারে ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছে যে, দুনিয়ার জীবনেই তারা চরম লাঞ্ছনা গঞ্জনার শিকার হয়েছে। উম্মাতে মুহাম্মাদী যদি আজ এই একই ভ্রান্তিতে লিপ্ত হয়, তাহলেও তারা আল্লাহর প্রিয়ই থাকবে এবং আল্লাহ তাদেরকে লাঞ্ছনা গঞ্জনার গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হওয়া থেকে রক্ষা করতেই থাকবেন— এর কোনই কারণ নেই। পূর্তবর্তী রসূলগণের উম্মাতদের সাথেও আল্লাহর কোন শত্রুতা ছিল না, আর শেষ নবীর উম্মতের সাথেও আল্লাহর কোন বিশেষ আত্মীয়তা নেই।

১৬. বাক্যের প্রেক্ষিত নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে বুঝা যায় যে, এখানে এ আচরণের দু'টো শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে। একটি হস্থে অবমাননা ও লাঞ্ছনা—যার শিকার এ দুনিয়াতেই হতে হয়েছে এবং হতে হবে। অপরটি হচ্ছে অপমানজনক আযাব-যা আখেরাতে ভোগ করতে হবে।

১৭. অর্থাৎ তারা ভুলে গেছে বলেই ব্যাপারটা মিটে যায়নি। আল্লাহর অবাধ্যতা ও তাঁর বিধানের বিরুদ্ধাচরণ তাদের কাছে এমন মামুলী বিষয় বিবেচিত হতে পারে যা করে তারা মনেও রাখেনা, এমনকি তাকে আদৌ কোন আপত্তিকর জিনিসই মনে করে না যে, তারা তার কিছুমাত্র পরোয়া করবে। কিন্তু আল্লাহর কাছে তা মোটেই মামুলী জিনিস নয়। তার কাছে তাদের প্রতিটি তৎপরতা নিবন্ধিত হয়ে গেছে। কোন্ ব্যক্তি কখন, কোথায়, কি কাজ করেছে তা করার পর তার নিজের প্রতিক্রিয়া কি ছিল, আর অন্যত্র কোথায় কোথায় তার কি কি ফলাফল কি কি আকারে দেখা দিয়েছে, এ সবই সবিস্তারে তার রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

১৮. এখান থেকে ১০ নং আয়াত পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে মুসলিম সমাজে মুনাফিকরা যে কর্মধারা চালিয়ে যাচ্ছিল তার সমালোচনা করা হয়েছে। বাহ্যত তারা মুসলমানদের সমাজে বসবাস করলেও ভেতরে ভেতরে তারা মু'মিনদের থেকে স্বতন্ত্র নিজেদের একটা জোট বানিয়ে রেখেছিল। মুসলমানরা যখনই তাদেরকে দেখতো, এটাই দেখতো যে, তারা পরস্পরে কানে কানে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছে। এসব গোপন সলাপরামর্শের মধ্য দিয়ে তারা মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি এবং রকমারি ফিতনা-বিভ্রান্তি ও ভয়ভীতি ছড়ানোর জন্য নানা ধরনের চক্রান্ত আঁটতো এবং গুজব রটাতো।

১৯. এখানে প্রশ্ন জাগে যে, এ আয়াতে দুই ও তিনের বদলে তিন ও পাঁচের উল্লেখের রহস্য কি? প্রথমে দুই এবং তার পরে চার বাদ দেয়া হলো কেন? তাফসীরকারগণ এর অনেকগুলো জবাব দিয়েছেন। তবে আমার মতে সঠিক জবাব এই যে, আসলে পবিত্র কুরআনের সাহিত্যিক সৌন্দর্য ও ভাষাগত মাধুর্য বজায় রাখার জন্যই এই বর্ণনাভংগী অবলম্বন করা হয়েছে। এটা না করা হলে বর্ণনা ভংগীটা এ রকম দাঁড়াতো ঃ

مَا يَكُوْنُ مِنْ نَجْوى اِثْنَيْنِ اِلاَّ هُوَ ثَالِثُهُمْ وَلاَ ثَلَثَةٍ اِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ

এতে نجوى اثنين কথাটার শব্দ বিন্যাস যেমন সুন্দর হতো না, তেমনি ثالث ও ثلثة শব্দ দু'টির পর পর আসাও শ্রুতিমধুর হতো না الا هو رابعهم এরপর ولا اربعة বলাটাও একই রকমের শ্রুতিকটু লাগতো। এজন্য প্রথমে তিন ও পাঁচজন ফিসফিসকারীর উল্লেখ করার পর পরবর্তী বাক্যে এই বলে শূন্যতা পুরণ করা হয়েছে যে,

وَلاَ اَدْنى مِنْ ذلِكَ وَلاَ اَكْثَرَ اِلاَّ هُوَ مَعَهُمْ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُوْلِ وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِيْٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ۞ اِنَّمَا النَّجْوٰى مِنَ الشَّيْطٰنِ لِيَحْزُنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَيْسَ بِضَآرِّهِمْ شَيْـًٔا اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ؕ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ ۞

হে ঈমানদারগণ ! তোমরা যখন পরস্পরে গোপন অলাপ–আলোচনায় লিপ্ত হও তখন পাপ, জুলুম ও রসূলের অবাধ্যতার কথা বলাবলি করো না, বরং সততা ও আল্লাহভীতির কথাবার্তা বল এবং যে আল্লাহর কাছে হাশরের দিন তোমাদের উপস্থিত হতে হবে, তাঁকে ভয় কর।[২৪] *কানাঘুষা একটা শয়তানী কাজ এবং ঈমানদার লোকদের মনে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যেই তা করা হয়। অবশ্য আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া তারা তাদের কোন ক্ষতি করতে সক্ষম নয়। আর মু'মিনদের কর্তব্য হচ্ছে শুধুমাত্র আল্লাহর ওপর ভরসা করা।*[২৫]

"ফিসফিসকারীরা চাই তিনের চেয়ে কম বা পাঁচের চেয়ে বেশী হোক, সর্বাবস্থায় আল্লাহ তাদের সংগে থাকেন।"

২০. বান্দার সংগে আল্লাহর এই অবস্থান বা সাহচর্য মূলত আল্লাহর সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা এবং সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হওয়াকেই বুঝায়। এরূপ নয় যে, (নাউজুবিল্লাহ) তিনি কোন ভৌতিক বা জৈবিক ব্যক্তি এবং পাঁচ ব্যক্তির বৈঠকে ষষ্ঠ ব্যক্তি হিসেবে কোথাও আত্মগোপন করে অবস্থান করেন। আসলে একথা দ্বারা মানুষকে এ মর্মে সচেতন করাই আল্লাহ তা'আলার উদ্দেশ্য যে, সে যতই সুরক্ষিত স্থানে বসে গোপন সলাপরামর্শ করুক না কেন, তাদের কথাবার্তা দুনিয়ার আর কারো কর্ণগোচর না হোক আল্লাহর গোচরীভূত না হয়ে পারে না। পৃথিবীর আর কোন শক্তি তাদেরকে পাকড়াও করতে না পারুক আল্লাহর পাকড়াও থেকে তারা কিছুতেই বাঁচতে পারবে না।

২১. এ বক্তব্য থেকে বুঝা যায় যে, এ আয়াত নাযিল হবার আগে রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করেছিলেন। তা সত্ত্বেও যখন তারা এ থেকে নিবৃত্ত হয়নি, তখন সরাসরি আল্লাহর কাছথেকে এ ভর্ৎসনাপূর্ণ বাণী নাযিল হয়।

২২. ইহুদী ও মুনাফিক–উভয় গোষ্ঠী এ ধরনের আচরণে লিপ্ত ছিল। একাধিক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, কিছু সংখ্যক ইহুদী রসূল (সা) এর দরবারে উপনীত হয়ে বললো ঃ اَلسَّامُ عَلَيْكَ يَا اَبَا الْقَاسِمِ অর্থাৎ "আসসামু আলাইকা ইয়া আবাল কাসেম" কথাটা এমনভাবে উচ্চারণ করলো যে, শ্রোতা মনে করতে পারে যে, তারা তাকে সালাম দিয়েছে। অথচ আসলে তারা বলেছে আস্‌সামু আলাইকা অর্থাৎ তোমার মৃত্যু হোক। রসূল (সা) জবাবে বললেন ঃ وعليكم অর্থাৎ "তোমাদের ওপরও"। হযরত আয়েশা (রা)

আত্মসম্বরণ করতে পারলেন না। তিনি বললেন, "তোমাদের মৃত্যু হোক এবং আল্লাহর গযব ও অভিশাপ পড়ুক।" রসূল (সা) বললেন ঃ হে আয়েশা, আল্লাহ তা'আলা কটু বাক্য পসন্দ করেন না। হযরত আয়েশা (রা) বললেন ঃ হে রসূল, ওরা কি বলেছে তা কি আপনি শোনেননি? রসূল (সা) বললেন ঃ আর আমি কি জবাব দিয়েছি তা তুমি শোনোনি? আমি তাদেরকে বলে দিয়েছি "তোমাদের ওপরও।" (বুখারী, মুসলিম, ইবনে জারীর, ইবনে আবী হাতেম) হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বলেন যে, মুনাফিক ও ইহুদী উভয় গোষ্ঠী এভাবেই সালাম দিতো। (ইবনে জারীর)

২৩. অর্থাৎ তারা এ জিনিসটাকে রসূল (সা) এর রসূল হওয়ার প্রমাণ মনে করতো। তারা ভাবতো যে, তিনি যদি রসূল হতেন, তাহলে যে মুহূর্তে আমরা "আসসালামু আলাইকা"র পরিবর্তে "আস্সামু আলাইকা" বলেছি, সে মুহূর্তে আমাদের ওপর আযাব এসে যেতো, আমরা দিনরাত এরূপ আচরণ করা সত্ত্বেও যখন কোন আযাব আসেনি, তখন ইনি রসূল নন।

২৪. এ বক্তব্য থেকে বুঝা গেল যে, পরস্পরে গোপন আলাপ–আলোচনা করা মূলত কোন নিষিদ্ধ কাজ নয়। যারা এ ধরনের আলাপ আলোচনা করে তারা কেমন চরিত্রের লোক, যে পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে এরূপ আলোচনা করা হয় তা কি ধরনের পরিবেশ ও পরিস্থিতি এবং যে কথাবার্তা এভাবে গোপনে অনুষ্ঠিত হয় তা কি ধরনের কথাবার্তা, তার ওপরই এর বৈধতা বা অবৈধতা নির্ভরশীল। সমাজে যাদের সততা, ন্যায়নিষ্ঠতা ও নির্মল চরিত্রের সর্বব্যাপী–খ্যাতি ও পরিচিতি বিরাজমান, তারা কোথাও গোপন পরামর্শে লিপ্ত দেখলে কারো মনে এরূপ সন্দেহ জন্মে না যে, তারা কোন দুরভিসন্ধিতে বা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে সমাজে যারা অনাচার ও অপকর্মের হোতা এবং দুশ্চরিত্র রূপে খ্যাত, তাদের গোপন সলাপরামর্শ যে কোন মানুষের মনে এরূপ খট্‌কা ও শংকার জন্ম দেয় যে, একটা কিছু গোলযোগ পাকানোর প্রস্তুতি নিশ্চয়ই চলছে। ঘটনাচক্রে কখনো দু'চার ব্যক্তি কোন ব্যাপারে চুপিসারে কিছু আলোচনা সেরে নিলে সেটা কোন আপত্তিকর ব্যাপার হয় না। কিন্তু কিছু লোক যদি নিজেদের একটা আলাদা স্থায়ী দল বানিয়ে নেয় এবং সাধারণ মুসলমানদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে হরহামেশা গোপন সলাপরামর্শ চালাতে থাকে, তাহলে সেটা অবশ্যই একটা দুর্যোগের পূর্বলক্ষণ। আর না হোক, এ দ্বারা অন্তত এতটুকু ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী যে, এতে মুসলমানদের মধ্যে দলাদলির ব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে। সর্বোপরি, যে জিনিসের ওপর এসব গোপন সলাপরামর্শের বৈধ বা অবৈধ হওয়া নির্ভর করে। তা হচ্ছে এ গোপন সলাপরামর্শের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু। দুই ব্যক্তি যদি কোন ঝগড়া বিবাদের মীমাংসা করিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে, কারো কোন ন্যায্য প্রাপ্য আদায় করিয়ে দেয়ার মানসে, অথবা কোন ভালো কাজে অংশ গ্রহণের লক্ষে গোপন আলাপ আলোচনা করে, তবে তা কোন অন্যায় কাজ নয়, বরং তা সওয়াবের কাজ। পক্ষান্তরে একাধিক ব্যক্তির সলাপরামর্শের উদ্দেশ্য যদি হয় কোন গোলযোগ ও নাশকতা সংঘটিত করার চক্রান্ত করা, কারো অধিকার নষ্ট করা কিংবা কোন পাপকাজ সংঘটিত করার ফন্দি আঁটা—তাহলে এরূপ অসদুদ্দেশ্য পোষণ করাটাই যে এক দুষ্কৃতি, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এই অসদুদ্দেশ্য নিয়ে গোপন সলাপরামর্শ করা দ্বিগুণ পাপ ও দুষ্কৃতি।

এ ব্যাপারে যে মজলিসী রীতিনীতি রসূল (সা) শিক্ষা দিয়েছেন তা এই যে,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا قِيْلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوْا فِى الْمَجٰلِسِ فَافْسَحُوْا يَفْسَحِ اللّٰهُ لَكُمْ ۚ وَ اِذَا قِيْلَ انْشُزُوْا فَانْشُزُوْا يَرْفَعِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ ۙ وَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجٰتٍ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١١﴾ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُوْلَ فَقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقَةً ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاَطْهَرُ ۗ فَاِنْ لَّمْ تَجِدُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿١٢﴾

হে ঈমানদারগণ! মজলিসে জায়গা করে দিতে বলা হলে জায়গা করে দিও, আল্লাহ তোমাদেরকে প্রশস্ততা দান করবেন।[২৬] আর যখন চলে যেতে বলা হবে, তখন চলে যেও।[২৭] তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার ও যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, তাদের মর্যাদা আল্লাহ উন্নীত করবেন।[২৮] বস্তুত আল্লাহ তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে অবগত।

হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন রসূলের সাথে গোপন আলাপ কর তখন আলাপ করার আগে কিছু সদকা দিয়ে নাও।[২৯] এটা তোমাদের জন্য অপেক্ষাকৃত ভালো ও পবিত্র। তবে যদি সদকা দিতে কিছু না পাও তবে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াময়।

اذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبهما فان ذالك يحزنه

"যখন তিন ব্যক্তি এক জায়গায় বসা থাকবে, তখন তাদের মধ্য থেকে দু'জনের তৃতীয় জনকে বাদ দিয়ে গোপন সলাপরামর্শ করা উচিত নয়। কেননা, এটা তৃতীয় ব্যক্তির মনোকষ্টের কারণ হবে। "(বুখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ, তিরমিযী, আবু দাউদ)

অপর হাদীসে রসূল (সা) বলেন ঃ

فلا يتناجى اثنان دون الثالث الا باذنه فان ذلك يحزنه

"তৃতীয় ব্যক্তির অনুমতি না নিয়ে তাকে বাদ দিয়ে দু'জনে গোপন আলোচনা করা চাই না। কারণ সেটা তার জন্য মনোপীড়াদায়ক হবে।" (মুসলিম)

দুই ব্যক্তি যদি তৃতীয় ব্যক্তির উপাস্থিতিতেই সে বুঝতে পারে না এমন ভাষায় কথা বলে, তবে সেটাও এ অবৈধ গোপন সংলাপের আওতায় আসে। এরচেয়েও জঘন্য অবৈধ কাজ–হলো গোপন সংলাপের সময় কারো দিকে এমনভাবে তাকানো বা ইশারা করা, যাতে বুঝা যায় যে, তাকে নিয়েই তাদের কথাবার্তা চলছে।

২৫. একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, কতিপয় ব্যক্তির গোপন সলাপরামর্শ দেখে কোন মুসলমানের মনে যদি এরূপ সন্দেহ জন্মেও যায় যে, এসব সলাপরামর্শ তার বিরুদ্ধেই

চলছে, তা হলেও তার এতটা দুঃখ পাওয়া ও ঘাবড়ে যাওয়া উচিত নয় যে, নিছক সন্দেহের বশেই কোন পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণের চিন্তা তাকে পেয়ে বসে, অথবা তার মনে কোন দুশ্চিন্তা, বিদ্বেষ অথবা অস্বাভাবিক উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার সঞ্চার হতে থাকে। তার বুঝা উচিত যে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ তার কোন ক্ষতি করতে পারে না। এ আস্থা ও প্রত্যয় তার মনে এমন দুর্জয় শক্তির জন্ম দেবে যে, অনেক ভিত্তিহীন শংকা এবং কাল্পনিক ভয়ভীতি ও উৎকণ্ঠা থেকে সে মুক্তি পেয়ে যাবে। দুষ্কৃতিকারীদের চিন্তা মাথা থেকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সে সম্পূর্ণ নিরুদ্বিগ্ন ও নিশ্চিন্ত মনে আপন কাজে নিয়োজিত থাকবে। আল্লাহর ওপর নির্ভরশীল মু'মিন ব্যক্তি এমন অস্থিরচিত্ত হয় না যে, যে কোন ভীতি ও আশংকা তার মনকে বিচলিত ও অশান্ত করে তুলবে। সে এতটা হীনমনাও হয় না যে, দুষ্কৃতিকারীদের উস্কানিতে উত্তেজিত ও ধৈর্যহারা হয়ে নিজেও ইনসাফ বিরোধী কার্যকলাপ করতে আরম্ভ করবে।

২৬. সূরার ভূমিকায় এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কতক মুফাস্‌সির এ আদেশকে শুধুমাত্র রসূল (সা) এর মজলিসের মধ্যে সীমিত মনে করেছেন। তবে ইমাম মালেক প্রমূখের এ মতটিই সঠিক যে, মুসলমানদের সকল বৈঠকাদির জন্য এটি একটি স্থায়ী বিধি। আল্লাহ ও তার রসূল মুসলিম জাতিকে যে সামাজিক রীতিনীতি, আদব আখলাক ও আচার ব্যবহার শিখিয়েছেন। এটি তার অন্যতম। আগে থেকে কিছু লোক বসে আছে এমন একটি মজলিসে যখন আরো কিছু লোক যোগ দেবে, তখন আগের সমবেত লোকদের মধ্যে এ সৌজন্য বোধ থাকা বাঞ্ছনীয় যে, স্বতপ্রবৃত্ত হয়ে নবাগতদের জন্য জায়গা করে দেবে এবং নিজেরা যথাসম্ভব চেপে বসে তাদের বসার সুযোগ করে দেবে। আবার নবাগতদের মধ্যেও এতটা ভদ্রতা থাকা উচিত যে, তারা যেন জোর জবরদস্তির সাথে ভেতরে না ঢোকে এবং একজনকে উঠিয়ে দিয়ে তার জায়গায় বসার চেষ্টা না করে। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌নে ওমর ও হযরত আবু হুরায়রা থেকে বর্ণিত হাদীসে রসূল (সা) বলেছেন ঃ

لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه فيجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا –

"কেউ যেন কাউকে উঠিয়ে তার জায়গায় না বসে। তোমরা বরং স্বেচ্ছায় অন্যদের জন্য জায়গা করে দাও।" (মুসনাদে আহমাদ, বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস বর্ণনা করেন যে, রসূল (সা) বলেছেন ঃ

لا يحل لرجل ان يفرق بين اثنين الا باذنهما

"দু'জনের মাঝখানে তাদের অনুমতি ছাড়া জোর পূর্বক চেপে বসা বৈধ নয়।"
(মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

২৭. আবদুর রহমান বিন যায়েদ বিন আসলাম জানান যে, লোকেরা রসূল (সা) এর মজলিসে দীর্ঘ সময় বসে থাকতো এবং শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বসে থাকার চেষ্টা করতো। এতে অনেক সময় রসূল (সা) এর কষ্ট হতো। তাঁর বিশ্রামের যেমন বিঘ্ন ঘটতো, তেমনি কাজকর্মেও অসুবিধার সৃষ্টি হতো। এজন্য এ আদেশ নাযিল হয় যে, যখন চলে যেতে বলা হয় তখন চলে যাও। (ইবনে জারীর ও ইবনে কাসীর)

ءَاَشْفَقْتُمْ اَنْ تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوٰىكُمْ صَدَقٰتٍ ۚ فَاِذْ لَمْ تَفْعَلُوْا وَتَابَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ۚ وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

গোপন আলাপ–আলোচনা করার আগে সদকা দিতে হবে ভেবে তোমরা ঘাবড়ে গেলে না কি? ঠিক আছে, সেটা যদি না করতে চাও,—বস্তুত আল্লাহ তোমাদেরকে তা থেকে অব্যাহতি দিয়ে দিয়েছেন।—তাহলে নামায কায়েম করতে ও যাকাত দিতে থাকো এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ নিষেধ মেনে চলতে থাকো। মনে রেখো তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে আল্লাহ ওয়াকিফহাল।[৩০]

২৮. অর্থাৎ এরূপ ভেবো না যে, রসূল (সা) এর মজলিসে অন্যদেরকে জায়গা করে দিতে গিয়ে যদি তোমাদের তার কাছ থেকে একটু দূরে গিয়ে বসতে হয় তাহলে তোমাদের সম্মান হানি ঘটবে, কিংবা তোমাদেরকে চলে যেতে বলা হলে তোমাদের অবমাননা হবে। মর্যাদা বৃদ্ধির আসল উৎস হলো ঈমান ও ইসলামী জ্ঞান। রসূল (সা) এর মজলিসে কে তার কতটা নিকটে বসলো, এবং কে কত বেশী সময় বসে কাটালো, তা দ্বারা কারো সম্মান নিরূপিত হয় না। কেউ যদি রসূল (সা) এর খুব কাছাকাছি বসতে পারে। তাহলেই যে তার মর্যাদা বেড়ে যাবে তা নয়। মর্যাদা বাড়বে তারই যার ঈমান ও ইসলামী জ্ঞান বেশী হবে। অনুরূপভাবে কেউ যদি বেশী সময় বসে থেকে আল্লাহর রসূলকে বিব্রত করে তাহলে সে বরঞ্চ মূর্খতার কাজই করে। শুধুমাত্র রসূলের (সা) কাছে বেশী সময় বসে থাকার করণে কারো মর্যাদা বেশী হবে না। আল্লাহর কাছে অধিকতর মর্যাদা হবে সে ব্যক্তির যে রসূল (সা) এর সাহচর্য দ্বারা ঈমান ও ইসলামী জ্ঞানের মত অমূল্য সম্পদ আহরণ করেছে এবং মু'মিন সুলভ স্বভাব ও চরিত্র অর্জন করেছে।

২৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের বর্ণনা অনুসারে এ আদেশের কারণ এই যে, মুসলমানরা রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে (নিভৃতে কথা বলার আবেদন জানিয়ে) এত বেশী জিজ্ঞাসাবাদ করতো যে, তিনি বিরক্ত হয়ে ওঠেন। অবশেষে আল্লাহ তাঁর ওপর থেকে এ বোঝা হালকা করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন। (ইবনে জারীর) যায়েদ বিন আসলাম বলেন যে, যে কেউ রসূল (সা) এর সাথে নিভৃতে কথা বলতে চাইতো, তিনি তাতে অসম্মতি জ্ঞাপন করতেন না। যার ইচ্ছা হতো, এসে বলতো, আমি একটু নিভৃতে কথা বলতে চাই। আর রসূল (সা) তাতে সম্মতি দিতেন। এতে পরিস্থিতি এত দূর গড়ালো যে, নিভৃতে বলার আদৌ প্রয়োজন হয় না এমন ব্যাপারেও অনেকে রসূল (সা)–কে কষ্ট দিতে লাগলো। এ সময়টা ছিল এমন যে, সমগ্র আরব মদীনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। কখনো কখনো এমনও হতো যে, কোন ব্যক্তি এভাবে রসূল (সা)–এর সাথে গোপনে কথা বলার পর শয়তান মানুষের কানে কানে রটিয়ে দিত যে, এ লোকটি অমুক গোত্র কবে মদীনায় আক্রমণ চালাবে সে খবর দিয়ে গেল। এভাবে মদীনায় গুজবের

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ۖ مَّا هُم مِّنكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿١٤﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا ۖ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١٥﴾ اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٦﴾ لَّن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا ۚ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٧﴾

৩ রুকূ'

তুমি কি তাদের দেখনি যারা এমন এক গোষ্ঠীকে বন্ধু বানিয়ে নিয়েছে যারা আল্লাহর গযবে নিপতিত।[৩১] *তারা তোমাদেরও নয়, তাদেরও নয়।*[৩২] *তারা জেনে ও বুঝে মিথ্যা বিষয়ে কসম করে।*[৩৩] *আল্লাহ তাদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। তারা যা করছে তা অত্যন্ত মন্দ কাজ। তারা নিজেদের কসমকে ঢাল বানিয়ে রেখেছে। এর আড়ালে থেকে তারা মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বাধা দেয়।*[৩৪] *এ কারণে তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর আযাব। আল্লাহর হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাদের অর্থ-সম্পদ যেমন কাজে আসবে না, তেমনি সন্তান-সন্ততিও কোন কাজে আসবে না। তারা দোযখের উপযুক্ত, সেখানেই তারা চিরদিন থাকবে।*

ছড়াছড়ি হতো। অপর দিকে মুসলমানদের এরূপ আচরণের দরুন মুনাফিকরা একথা বলার সুযোগ পেয়ে যেতো যে, মুহাম্মাদ (সা) যে যা বলে তাই শোনেন, সত্য মিথ্যার বাছবিচার করেন না। এসব কারণে আল্লাহ এ বিধিনিষেধ আরোপ করলেন যে, যে ব্যক্তি রসূল (সা) এর সাথে গোপনে কথা বলতে চাইবে, তার আগে সাদকা দিতে হবে। (আহকামুল কুরআন ইবনুল আরাবী) কাতাদাহ বলেন যে, অন্যদের ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার উদ্দেশ্যে কেউ কেউ রসূল (সা) এর সাথে নিভৃতে কথা বলতো।

হযরত আলী (রা) বলেন ঃ এ আদেশ নাযিল হবার পর রসূল (সা) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, সাদকা কত ধার্য করা উচিত? এক দীনার? আমি বললাম, এটা মানুষের সাধ্যের বাইরে হবে। তিনি বললেন ঃ আধা দীনার? আমি বললাম, এটাও তাদের ক্ষমতার আওতাবহির্ভূত। তিনি বললেন, তাহলে কত? আমি বললাম, একটি জবের দানা পরিমাণ স্বর্ণ। তিনি বললেন, انك لزهيد অর্থাৎ তুমি খুবই কম পরিমাণের পরামর্শ দিলে। (ইবনে

يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ
أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ ۚ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٨﴾ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ
فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ
الْخَاسِرُونَ ﴿١٩﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿٢٠﴾
كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي ۚ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾

যেদিন আল্লাহ তাদের সবাইকে জীবিত করে উঠাবেন সেদিন তাঁর সামনেও তারা ঠিক সেভাবে কসম করবে যেমন তোমাদের সামনে কসম করে থাকে[৩৫] এবং মনে করবে এভাবে তাদের কিছু কাজ অন্তত হবে। ভাল করে জেনে রাখো, তারা যারপর নাই মিথ্যাবাদী। শয়তান তাদের ওপর চেপে বসেছে এবং তাদের অন্তর থেকে আল্লাহর স্মরণ মুছে দিয়েছে। তারা শয়তানের দলভুক্ত লোক। সাবধান! শয়তানের দলভুক্ত লোকেরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যারা আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের মোকাবিলা করে নিসন্দেহে তারা নিকৃষ্টতর সৃষ্টি। আল্লাহ লিখে দিয়েছেন যে, তিনি এবং তাঁর রসূল অবশ্যই বিজয়ী হবেন।[৩৬] প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ মহা শক্তিমান ও পরাক্রমশালী।

জারীর, তিরমিযী, মুসনাদে আবু ইয়া'লা) অপর এক বর্ণনা মতে হযরত আলী (রা) বলেন ঃ এটি কুরআনের এমন এক আয়াত যা আমি ছাড়া আর কেউ বাস্তবায়িত করেনি। এ আদেশ আসা মাত্রই আমি একটি সাদকা দিয়ে রসূল (সা) এর কাছ থেকে একটি মাসয়ালা গোপনে জেনে নেই। (ইবনে জারীর, হাকেম, ইবনুল মুনযির, আবদ বিন হুমাইদ)

৩০. উপরোক্ত নির্দেশের অল্প দিন পরে এ দ্বিতীয় নির্দেশটি নাযিল হয়। এর দ্বারা সাদকার বাধ্যবাধকতা রহিত হয়। সাদকার বাধ্যবাধকতা কতদিন ছিল, সে বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। কাতাদাহ বলেন, একদিনের চেয়েও কম সময় চালু ছিল, তারপর রহিত হয়ে যায়। মুকাতেল বিন হাইয়ান বলেন, দশদিন ছিল। এটাই এ আদেশ বহাল থাকার সর্বোচ্চ বর্ণিত মেয়াদ।

৩১. এখানে মদীনার ইহুদীদের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, মুনাফিকরা এসব ইহুদীদেরকেই বন্ধু বানিয়ে রেখেছিল।

৩২. অর্থাৎ মুসলমান বা ইহুদী কারো সাথেই তাদের আন্তরিক সম্পর্ক ছিল না। নিজেদের স্বার্থের কারণেই তারা উভয়ের সাথে সম্পর্ক পাতিয়ে রেখেছিল।

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ
أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ
رَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٢٢﴾

তোমরা কখনো এমন দেখতে পাবে না যে, যারা আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণ করে তারা এমন লোকদের ভাল বাসছে যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধীতা করেছে। তারা তাদের পিতা, অথবা পুত্র অথবা ভাই অথবা গোষ্ঠীভুক্ত[৩৭] হলেও তাতে কিছু এসে যায় না। আল্লাহ এসব লোকদের হৃদয়–মনে ঈমান বদ্ধমূল করে দিয়েছেন এবং নিজের পক্ষ থেকে একটি 'রূহ' দান করে তাদের শক্তি যুগিয়েছেন। তিনি তাদেরকে এমন জান্নাতসমূহে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নহরসমূহ প্রবাহিত হতে থাকবে। তারা সেখানে চিরদিন অবস্থান করবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। তারা আল্লাহর দলের লোক। জেনে রেখো আল্লাহর দলের লোকেরাই সফলকাম।

৩৩. অর্থাৎ তারা এই বলে মিথ্যামিথ্যি কসম খায় যে, তারা ঈমান এনেছে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের নেতা ও পথ প্রদর্শনকারী হিসেবে মেনে নিয়েছে এবং ইসলাম ও ইসলামের অনুসারীদের প্রতি বিশ্বস্ত আছে।

৩৪. এর অর্থ একদিকে তারা নিজেদের ঈমান ও বিশ্বস্ততা সম্পর্কে কসম খেয়ে মুসলমানদের আক্রোশ থেকে নিজেদের রক্ষা করে, অপরদিকে মানুষের মধ্যে ইসলাম, ইসলামের অনুসারী এবং ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে নানা রকম সন্দেহ ও সংশয় সৃষ্টি করে যাতে মানুষ এ কথা চিন্তা করে ইসলাম গ্রহণ থেকে বিরত থাকে যে, ইসলামের ঘরের লোকেরাই যখন একথা বলছে তখন এর মধ্যে ব্যাপার কিছু একটা অবশ্যই আছে।

৩৫. অর্থাৎ তারা শুধু দুনিয়াতেই এবং শুধু মানুষের সামনেই মিথ্যা মিথ্যা শপথ করে না। আখরাতে আল্লাহ তা'আলার সামনেও তারা মিথ্যা শপথ করা থেকে বিরত হবে না। মিথ্যা এবং প্রতারণা তাদের মনের এত গভীরে স্থান করে নিয়েছে যে, মৃত্যুর পরও এরা তা থেকে মুক্ত হতে পারবে না।

৩৬. ব্যাখ্যার জন্য দেখুন, তাফহীমুল কুরআন, আস্ সাফফাত, টীকা–৯৩।

৩৭. এ আয়াতে দুইটি কথা বলা হয়েছে। একটি নীতি কথা। অন্যটি প্রকৃত ঘটনার বর্ণনা। নীতি কথায় বলা হয়েছে যে, সত্য দীনের প্রতি ঈমান এবং দীনের শত্রুদের সাথে বন্ধুত্ব ও ভালবাসা দু'টি সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী জিনিস। এ দু'টি জিনিসের একত্র সমাবেশ বা অবস্থান কোনভাবে কল্পনাও করা যায় না। ঈমান এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের শত্রুদের সাথে ভালবাসা ও বন্ধুত্ব একই হৃদয়ে একত্রিত হওয়া একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। কোন মানুষের হৃদয়ে যখন একই সাথে নিজের প্রতি ভালবাসা এবং শত্রুর প্রতি ভালবাসা একত্রিত হতে পারে না তখন এটাও ঠিক অনুরূপ ব্যাপার। অতএব তোমরা যদি কাউকে দেখো, সে ঈমানের দাবীও করে এবং সাথে সাথে ইসলাম বিরোধী লোকদের সাথে ভালোবাসা ও বন্ধুত্বের সম্পর্কও রাখে তাহলে তোমাদের মনে কখনো যেন এ ভুল ধারণা না জন্মে যে, এ আচরণ সত্ত্বেও সে তার ঈমানের দাবীতে সত্যবাদী। অনুরূপ যেসব লোক একই সাথে ইসলাম ও ইসলাম বিরোধীদের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলছে সে নিজেও যেন তার এ অবস্থান ভালভাবে চিন্তা ভাবনা করে দেখে যে, প্রকৃতপক্ষে সে কি, মু'মিন না মুনাফিক? সে প্রকৃতপক্ষে কি হতে চায়, মু'মিন হয়ে থাকতে চায়, না মুনাফিক হয়ে? তার মধ্যে যদি সততার লেশমাত্রও থেকে থাকে এবং মুনাফিকীর আচরণ যে নৈতিক দিক দিয়ে মানুষের জন্য নিকৃষ্টতম আচরণ এ বিষয়ে তার মধ্যে সামান্যতম অনুভূতিও থাকে তা হলে তার উচিত একই সাথে দুই নৌকায় আরোহণের চেষ্টা পরিত্যাগ করা। ঈমান এ ব্যাপারে তার কাছে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত দাবী করে। সে যদি মু'মিন থাকতে চায় তা হলে যেসব সম্পর্ক ও বন্ধন ইসলামের সংগে তার সম্পর্ক ও বন্ধনের সাথে সাংঘর্ষিক তার সবই তাকে বর্জন করতে হবে। ইসলামের সাথে সম্পর্কের চাইতে অন্য কোন সম্পর্ক প্রিয়তর হয়ে থাকলে ঈমানের মিথ্যা দাবী ছেড়ে দেয়াই উত্তম।

এটি ছিল নীতিগত কথা। কিন্তু এখানে আল্লাহ তা'আলা শুধু নীতি বর্ণনা করাই যথেষ্ট মনে করেননি। বরং ঈমানের দাবীদারদের সামনে নমুনা স্বরূপ এ বাস্তব ঘটনাও পেশ করেছেন যে, সত্যিকার ঈমানদারগণ বাস্তবে সবার চোখের সামনে সে সম্পর্ক ও বন্ধন ছিন্ন করেছিল যা আল্লাহর দীনের সাথে তাদের সম্পর্কের পথে প্রতিবন্ধক ছিল। এটা ছিল এমন একটা ঘটনা যা বদর ও উহুদ যুদ্ধের সময় সমগ্র আরব জাতি প্রত্যক্ষ করেছিল। যেসব সাহাবায়ে কিরাম মক্কা থেকে হিজরত করে এসেছিলেন তারা শুধু আল্লাহ এবং তাঁর দীনের খাতিরে নিজেদের গোত্র এবং ঘনিষ্টতর নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন। হযরত আবু উবাইদাহ তাঁর নিজের পিতা আবদুল্লাহ ইবনে জাররাহকে হত্যা করেছিলেন। হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের আপন ভাই উবাইদ ইবনে উমায়েরকে হত্যা করেছিলেন। হযরত উমর (রা) তাঁর মামা আস ইবনে হিশাম ইবনে মুগীরাহকে হত্যা করেন। হযরত আবু বকর (রা) তাঁর পুত্র আবদুর রহমানের বিরুদ্ধে লড়তে প্রস্তুত হয়েছিলেন। হযরত আলী, হযরত হামযা এবং হযরত উবাইদা ইবনুল হারেস তাঁদের নিকটাত্মীয় উতবা, শায়বা এবং ওয়ালীদ ইবনে উতবাকে হত্যা করেছিলেন। বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে হযরত উমর (রা) রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে তাদের সবাইকে হত্যা করার আবেদন করে বলেছিলেন, আমাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিকটাত্মীয়কে হত্যা করবে। এ বদর যুদ্ধেই এক আনসারী হযরত মুসআব ইবনে উমায়েরের আপন ভাই আবু আযীয ইবনে উমায়েরকে পাকড়াও করে বাঁধছিলেন। তা

দেখে হযরত মুসআব চিৎকার করে বললেন ঃ বেশ শক্ত করে বাঁধো। এর মা অনেক সম্পদশালিনী। এর মুক্তির জন্য সে তোমাদেরকে অনেক মুক্তিপণ দিবে। একথা শুনে আবু আযীয বললোঃ তুমি ভাই হয়ে একথা বলছো? জবাবে হযরত মুসআব ইবনে উমায়ের বললেন ঃ এ মুহূর্তে তুমি আমার ভাই নও, বরং যে আনসারী তোমাকে পাকড়াও করছে সে আমার ভাই। বদর যুদ্ধেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামাতা আবুল আস বন্দী হয়ে আসলে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জামাতা হওয়ার কারণে তার সাথে অন্য সব কয়েদী থেকে ভিন্ন বিশেষ কোন সৌজন্যমূলক আচরণ করা হয়নি। খাঁটি ও নিষ্ঠাবান মুসলমান কাকে বলে এবং আল্লাহ ও তাঁর দীনের সাথে তাদের সম্পর্ক কি এভাবে বাস্তবে তা দুনিয়াকে দেখানো হয়েছে।

দায়লামী হযরত মুয়ায থেকে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ দোয়াটি উদ্ধৃত করেছেন ঃ

اللهم لا تجعل لفاجر (وفى رواية لفاسق) على يدا ولا نعمة فيوده قلبى فانى وجدت فيما او حيت الى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله -

"হে আল্লাহ আমাকে কোন পাপী লোকের দ্বারা (অপর একটি বর্ণনায় আছে ফাসেক) উপকৃত হতে দিও না। তাহলে আমার মনে তার প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি হবে। কারণ, তোমার নাযিলকৃত অহীর মধ্যে আমি একথাও পেয়েছি যে, আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান পোষণকারী লোকদেরকে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবে না।"